গোবিন্দ দেবের নব্য নৈতিকতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক : মালেকা আক্তার বানু
রেজিঃ নং - ২৩৪
সেশন - ২০০৩-২০০৪
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক : ড. প্রদীপ কুমার রায়
অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২০১১

465966

উৎসর্গ

ঢাকা

শ্রদ্ধেয় বাবা-মা

এবং

আমার স্বামী-কে

Dhaka University Institutional Repository

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA–1000, BANGLADESH

প্রত্যয়ন পত্র

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, মালেকা আক্তার বানু, সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, সরকারি তিতুমীর কলেজ, ঢাকা আমার তত্ত্বাবধানে "গোবিন্দ দেবের নব্য নৈতিকতা" শিরোনামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. প্রোগ্রামের আওতায় তাঁর এই এম.ফিল. গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন করেছেন। তাঁর প্রণীত এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি নিঃসন্দেহে ড. গোবিন্দচন্দ্র দেবের উপর আমাদের প্রচলিত জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে এবং আমি যতদূর জানি এ জাতীয় গবেষণা অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ দ্বারা সম্পাদিত হয়নি। আমি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে তাঁর পুরো গবেষণার খসড়া ও অধ্যায়গুলো চূড়ান্তভাবে নিরীক্ষণ করেছি এবং তাঁর এম.ফিল. ডিগ্রী অর্জনের অংশ হিসেবে অভিসন্দর্ভটি জমা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত মনে করছি।

(ড. প্রদীপ কুমার রায়)
অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Phone : PABX 9661920-73/6240, 6241, Fax : 880-2-8615583, E-mail : phil@bangla.net

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, অত্র অভিসন্দর্ভে যে সব পত্র পত্রিকা ও গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছি তা অধ্যায় শেষে তথ্য নির্দেশিকায় উল্লেখ করেছি। নির্দেশিত অংশ ব্যতীত বাকী অংশ গবেষকের নিজের। এ অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের এম.ফিল. বা পি.এইচ.ডি বা উচ্চতর ডিগ্রীর জন্য জমা দেয়া হয় নি ।

দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মালেকা আক্তারি বানু
এম.ফিল. গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
	উৎসর্গ	II
	প্রত্যয়ন পত্র	III
	ঘোষণাপত্র	IV
	ভূমিকা	VII
প্রথম অধ্যায়:	**জীবন ও কর্ম**	১-১০
১.১	গোবিন্দ দেবের পারিবারিক পরিচয়	৩
১.২	গোবিন্দ দেবের শিক্ষাজীবন	৫
১.৩	গোবিন্দ দেবের কর্মস্থল ও কর্মজীবন	৭
১.৪	গোবিন্দ দেবের আন্তর্জাতিক খ্যাতি	৮
	তথ্যসূচি	১০
দ্বিতীয় অধ্যায়:	**গোবিন্দ দেবের দার্শনিক পটভূমি**	১১-৫২
২.১	ধর্ম	১৩
২.২	বিজ্ঞান	২৬
২.৩	দর্শন	৩৫
	তথ্যসূচি	৪৯
তৃতীয় অধ্যায়:	দেবের দার্শনিক তত্ত্ব	৫৩-৭৬
৩.১	**অধিবিদ্যা**	৫৬
৩.২	জ্ঞানবিদ্যা	৬১
৩.৩	**দেবের শিক্ষাদর্শন**	৬৯
	তথ্যসূচি	৭৬
চতুর্থ অধ্যায়:	গোবিন্দ দেবের নব্য নৈতিকতা	৭৭-১১৪
	তথ্যসূচি	১১২
পঞ্চম অধ্যায়:	গোবিন্দ দেবের দর্শনে নব্য নৈতিকতার প্রভাব	১১৫-১৪৪
	তথ্যসূচি	১৪৩
	উপসংহার	১৪৫-১৫২
	গ্রন্থপঞ্জি	১৫৩-১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মানবজাতির নিরাপদ আবাসভূমি হিসেবে স্বীকৃত এ পৃথিবী নানান রহস্য এবং জটিলতায় পরিপূর্ণ। মানুষ অনাদিকাল থেকেই এসব রহস্য উদ্‌ঘাটনে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে। স্থান কালের ব্যবধান-বির্বতনে আর্বিভূত হয়েছেন কত না মুনি-ঋষি, পীর-দরবেশ, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক এবং দার্শনিকগণ। জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রথম ছোঁয়া দিয়েছিলেন দার্শনিকেরাই। গ্রিক মনীষী সক্রেটিস ছিলেন জ্ঞানরাজ্যের প্রথম পথিকৃৎ। জগৎ জীবন সম্পর্কিত জটিল বিষয়াবলী কৌতূহলপ্রবণ মানুষের মনকে প্রতিনিয়ত আন্দোলিত করেছে। কৌতূহলী মনকে পরিতৃপ্ত করতেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে দর্শনের শুভ সূচনা। কালের পরিক্রমায় দর্শনের এসব শাখা-প্রশাখা বিন্যস্ত হয়েছে কখনো ধর্মীয় বাতাবরণে, কখনো জড়বাদীয় আকারে আবার কখনো বা বৈজ্ঞানিক-বিশ্লেষণী পর্যায়ে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ এবং বিচারবাদের যেমন প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় তেমনি আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় স্বজ্ঞা, মরমীবাদ এবং দৈবশক্তির সাথে মানবমনের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এসব ধারার সম্মিলিত গতিপ্রকৃতি মূলত দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। এদের একটি জড়বাদীয় বা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্যটি ভাববাদীয় দৃষ্টিভঙ্গি। জ্ঞানের ইতিহাস তথা দর্শনের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বস্তুবাদ এবং ভাববাদের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। চিরায়ত এই দুই মতবাদের মধ্যে সমন্বয়সাধনের মহৎ প্রচেষ্টাই ব্যক্ত হয়েছে আলোচ্য এ অভিসন্দর্ভে। ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাঙালির দর্শনচর্চার ইতিহাস যার অকৃপণ দানে উদ্ভাসিত হয়েছে তিনি হচ্ছেন ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব। দর্শনের ইতিহাসের কালপুরুষ, এক শ্রেষ্ঠ বাঙালি দার্শনিক। যিনি দর্শনকে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সাথে সম্পৃক্ত করতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। দেবের পরিশুদ্ধ ভাবাবেগ এবং মনন ঋদ্ধ দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণ মানবজাতিকে আলোকিত জীবনের পথ প্রদর্শন করেছে। জগৎ ও জীবনের স্বরূপ আবিষ্কার করে আদর্শ মানবোচিত জীবনের অনুসন্ধান ও দার্শনিক তাৎপর্য সম্বলিত দৃষ্টিভঙ্গির উন্মোচন করাই ছিলো তাঁর দর্শনচিন্তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। দর্শনকে দেব

Dhaka University Institutional Repository

কোনো আপতিক বিষয় হিসেবে দেখেন নি। দর্শন ছিলো তাঁর কাছে প্রাত্যহিক জীবনের মতোই অত্যন্ত সাদামাটা। যাপিত জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তিনি দার্শনিকসুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। জীবনকে দেব দর্শনের আদলেই গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এজন্যই তার দর্শন হয়ে উঠেছিলো জীবনদর্শনেরই এক সার্থক প্রতিচ্ছবি। দর্শনের প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্যের দিকেও দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, দর্শনের সাথে জীবন কতো গভীর ও নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। সনাতন ধর্মে জন্মগ্রহণ করেও সকল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে গৌতম বুদ্ধের মতোই অহিংসা এবং প্রেমের বাণী দ্বারা নিজেকে এবং বিশ্বসমাজকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। তিনি যুক্তিকে আশ্রয় করেই অহিংসা এবং প্রেমের বাণীকে মানবসমাজের আদর্শ করতে ব্রতী হয়েছিলেন। দেব প্রেমের বাণীকে 'মমত্ববোধ' এবং 'সেবার নীতিতে' প্রতিস্থাপিত করে গিয়েছেন। যার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণকামী এক বিশ্বরাষ্ট্রের প্রত্যাশার মধ্যে দিয়ে। সমন্বয়ের সাধনাই ছিল দেবের দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। দেব এ মহাসমন্বয় ঘটিয়েছেন জীবনের সঙ্গে দর্শনের, কঠিন যুক্তিবাদীতার সাথে বিশ্বাসভিত্তিক ধর্মের, বিজ্ঞানের সাথে দর্শনের, বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার সাথে অতীন্দ্রিয় স্বজ্ঞার, ধর্মের সাথে ধর্মের, জাতির সাথে জাতির এবং সর্বোপরি বস্তুবাদের সাথে জড়বাদের। সমন্বয়ের এ যুগান্তকারী প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলো মানবভাবনা। দেবের মানবভাবনার যথার্থ স্বরূপ অন্বেষা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে 'এক বিশ্বজগৎ' গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞার মধ্যে দিয়ে। তিনি মনে করেন, যথার্থ দর্শনচর্চা এবং অনুশীলনের মনোভাবই মানুষকে দার্শনিকসুলভ মনোবৃত্তির অধিকারী করে তার কর্মময় জীবনকে অর্থপূর্ণ এবং সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবে।

দেবের সমন্বয়ী দর্শনের পটভূমিতে ছিলো জীবনদর্শনের এক সার্থক নির্যাস যা প্রজ্ঞা-স্বজ্ঞা, ধর্ম-দর্শন এবং বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে সফল সমন্বয়সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। জীবনের নানা প্রতিকূলতা, ব্যক্তিগত সমস্যা-সংকট, পারিবারিক সংকটের সেই অভিঘাতের মধ্যেও দেব দর্শনচর্চাকে অব্যাহত রেখেছিলেন। সাধনা করেছিলেন সুমহান মধ্যপথের। মধ্যপথের সাধনাই পরিলক্ষিত হয় দেবের সমগ্র জীবনাচরণে। যে শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন, গৌতম বুদ্ধ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং ইসলাম ধর্মের বাণী থেকে। দেব তাঁর রচিত *আমার জীবন দর্শন* গ্রন্থে মধ্যপথের ভূমিকা সম্পর্কে বলেন, মধ্যপথই হচ্ছে সকল ধর্ম এবং দর্শনের নির্যাস। কোন একদেশদর্শী

Dhaka University Institutional Repository

মতবাদে মানবকল্যাণ সম্ভব নয়, আগামী দিনের আদর্শ ও সভ্যতায় কার্যকর ভূমিকা রেখে মধ্যপথই রচনা করতে পারে সার্থক সোনালি ভবিষ্যৎ। দেবের দর্শনে বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, ত্রিপিটক বাইবেল এবং কোরানের আলোচনা-পর্যালোচনাই শুধু নয় এসবের ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে তার ব্যক্তিগত জীবনাচরণে। ভারতীয় ঐতিহ্যপন্থী দার্শনিকগণের প্রভাব যেমন রয়েছে তেমনি পাশ্চাত্য ঐতিহ্যপন্থী দার্শনিকদের প্রভাবও বাদ পড়েনি তাঁর দর্শনে। এক্ষেত্রেও সমন্বয়ের সেই সুমহান ধারাটিকে দেব রক্ষা করে চলেছেন। দেব যথার্থ অর্থেই একজন মানববাদী দার্শনিক। মানবমুক্তির বিষয়টিকে তিনি সার্বিকভাবেই বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করেছেন। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, সম্প্রীতি-সহাবস্থান, ভ্রাতৃত্ববন্ধন, সাম্যবোধ এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে এক ভারসাম্যমূলক, কল্যাণময় বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। আলোচ্য এই অভিসন্দর্ভে তাই দেবের ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্ঞানবিদ্যা, অধিবিদ্যা, শিক্ষা এবং নব্য নৈতিকতাসহ যাবতীয় সংস্কারধর্মী কর্মপ্রয়াসকে যথাসম্ভব তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভে মোট পাঁচটি অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে 'জীবন ও কর্ম' শিরোনামে দেবের পারিবারিক পরিচয়, শিক্ষাজীবন, কর্মস্থল ও কর্মজীবনসহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাঁর অবাধ-বিচরণ ও সুনাম-সুখ্যাতি তুলে ধরার যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে দেবের ব্যক্তিক সংকট, পারিবারিক সীমাবদ্ধতা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নানান পটপরিবর্তনের মাধ্যমে কিভাবে সমাজের প্রগতিশীল ধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন এ সম্পর্কিত আলোচনা আলোচ্য অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'দেবের দার্শনিক পটভূমি' শিরোনামে তাঁর ধর্ম, বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে দেব ধর্ম কী এবং জীবন ও সমাজের সাথে ধর্মের সম্পৃক্ততা মানবজীবনকে কিভাবে পূর্ণাবয়বে গড়ে তুলবে তাই সর্বতোভাবে আলোচনা করা হয়েছে। দেব চিরায়ত ধর্মকে আলোকবর্তিকারূপে চিত্রিত করে একে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ধারাবাহিকতা উপলব্ধি ও অনুসরণপূর্বক জ্ঞান এবং প্রেমের সমন্বয় ঘটিয়ে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করণের মাধ্যমে মানবকল্যাণকে উৎসাহিত করে গিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

'দেবের দার্শনিক তত্ত্ব' শিরোনামে তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনাকে এগিয়ে নেয়া হয়েছে। এ অধ্যায়ে অধিবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা এবং দেবের শিক্ষানীতির আলোকে তাঁর বক্তব্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশ্বমানবতার ঐক্য-সম্প্রীতির ভিত্তিমূলে দেব একক পরমসত্তার স্বীকৃতিকেই চিত্রিত করে গিয়েছেন। এই একত্বের আদর্শ যে কোনো নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বী বা জাতিগোষ্ঠীর মনগড়া তত্ত্ব নয় বরং যুগে যুগে ঐতিহাসিক ধর্ম ও দর্শনগুলিতে তা বিধৃত হয়েছে এটিই দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। একক সত্তাই 'বহু'র মাঝে পরিব্যাপ্ত হয়ে জগতে এবং জগতের বাইরে অভিব্যক্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বহুর এই অন্তরতম ঐক্যই জগৎ-জীবনকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। দেবের দর্শনে এ সত্যটিকেই নানাভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। দেবের শিক্ষানীতি আধুনিক উন্নত সমাজব্যবস্থায় আদর্শিক এবং প্রগতিপন্থী এক অনবদ্য প্রয়াস। সমন্বয়ী দর্শন তথা পরমসত্তার আলোচনা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে তাঁর শিক্ষানীতির নতুন দিক নির্দেশনার সাথে পুরনো আধ্যাত্মদর্শনের গভীর মূল্যমানগুলোকে সচল ও জীবন্তকরণের প্রত্যাশার মধ্যে দিয়ে। একটি ন্যায়পর ও কল্যাণমূলক আধুনিক বিশ্ব সমাজব্যবস্থার উন্মেষ ঘটাতে দেবের সমন্বয়ী ভাবনার কার্যকারিতা তাৎপর্যপূর্ণ এবং ভাব-ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ আদর্শিক-বৈশ্বিক সময়োপযোগী এক কর্মপ্রয়াস।

আলোচ্য অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে 'দেবের নব্য নৈতিকতা' শিরোনামে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। সত্য, সুন্দর ও শুভের সাধনা মানবমনের অলংকার। মানুষ সহজাতভাবেই হৃদয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকে এবং কল্যাণমূলক কর্মে ব্রতী হয়। মানব হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলির পরিচর্যা, পরিস্ফুটন ঘটিয়ে নৈতিক-মানবিক এবং মূল্যবোধসম্পন্ন আদর্শ মানুষ গড়ে তোলার প্রয়াস ব্যক্ত হয়েছে দেবের 'নব্য নৈতিকতা' অধ্যায়ে। মানুষের জীবন ও অস্তিত্বের চিরন্তন দাবিকে অগ্রাধিকার প্রদান করে দেব জড়বাদ ও বস্তুবাদের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। দেবের সমন্বয়ধর্মীতা জীবনের প্রয়োজনেই গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান। সমন্বয়ের ধারণাকে মহিমান্বিত ও পরিপুষ্ট করা হয়েছে মধ্যপথের সাধনা দ্বারা। মধ্যপথের সাধনা কিভাবে ব্যক্তিকে উদার, সহনশীল, নৈতিক, মানবিক দিকের উন্মোচন ঘটিয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ- নির্বিশেষে এক বিশ্ববোধে উজ্জীবিত করার মন্ত্রে দীক্ষিত করে তুলতে পারে সেটি এ অধ্যায়ে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দেবের, 'নব্য নৈতিকতার' ধারণায় 'প্রগতি' প্রত্যয়টি এক বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। 'প্রগতি' বলতে দেব কী বুঝিয়েছেন এবং সময় ও সৃষ্টির ভাব-ব্যঞ্জনায় কিভাবে এই আলোচনার বিন্যাস ও বিস্তার ঘটেছে আলোচ্য অধ্যায়ে সেটি দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। দেব ভাববাদকে নতুনভাবে সংস্কার সাধনের মাধ্যমে বস্তুর সাথে সুসমন্বয় ঘটিয়ে জীবনের জন্য প্রেরণাদায়ী এবং প্রগতির নির্দেশনারূপে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। ধর্মীয় বিশ্বাসভিত্তিক অধ্যাত্মবাদ মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলবে প্রেম আর বিজ্ঞান প্রযুক্তির শক্তিকে একাত্ম করে মানুষ রচনা করবে স্বর্গীয় সোনালি ভবিষ্যৎ। দেবের এমন প্রত্যাশাই এ অধ্যায়ের আলোচনাতে গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর রচনাশৈলীর গভীরতায় ধ্বনিত হয়েছে মানবমুক্তির অলঙ্ঘনীয় সার্বজনীন এক বার্তা যা এ অধ্যায়ে পর্যায়-পরম্পরায় ব্যক্ত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে 'গোবিন্দ দেবের দর্শনে নব্য নৈতিকতার প্রভাব' শিরোনামে আলোচনাকে পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আলোচ্য অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক নির্যাস এ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরারও প্রয়াস রয়েছে। দেবের দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নের প্রচেষ্টা আলোচনাকে আরো সমৃদ্ধ এবং প্রাণবন্ত করেছে। এ অধ্যায়ে দেবের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং শিক্ষানীতির আলোকেই তাঁর চিন্তা-চেতনা, বিষয়-বিন্যাস, প্রসঙ্গ-প্রকরণ সবকিছুকেই বহুমাত্রিক দিকে থেকে বিবেচনা করা হয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে ঋদ্ধ দেবের চিন্তা-চেতনা, প্রায়োগিক পর্যায়ে শোষণ-বঞ্চনাহীন, নিপীড়ন-নির্যাতনবিহীন এক সুমহান আদর্শ বিশ্বরাষ্ট্রের চেতনাকে সর্বতোভাবে স্বাগত জানিয়েছেন। জ্ঞানে, প্রেমে, কল্যাণে ভরপুর অর্থনৈতিক মুক্তির আবহে পরিচালিত ভারসাম্যমূলক সমাজব্যবস্থা এবং 'একজগৎ' গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করার চিরন্তন আহ্বানই এ অধ্যায়ের পরিপূর্ণতা প্রদান করেছে।

সর্বশেষে উপসংহারে আমি বলতে চেষ্টা করেছি যে, গোবিন্দ দেবের নব্য নৈতিকতা বর্তমান অস্থিতিশীল ও অস্থিরময় বিশ্বে একটি নতুন আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে। এতে দেশ-জাতি, সমাজ-সভ্যতা এককথায় বিশ্বব্যবস্থা উপকৃত হবে এবং মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত হবে। বিজ্ঞান প্রভাবিত ও বস্তুবাদী চিন্তাধারায় মানুষ আজ যে স্তরে উপনীত হয়েছে তাতে তার বিপর্যয় আসন্ন। এই আশু বিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্তির লক্ষ্যে দেবের বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদের সমন্বয়ে

Dhaka University Institutional Repository

গঠিত নব্য নৈতিকতা মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে। তাই আমি গোবিন্দ দেবের নব্য নৈতিকতার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অধিক গুরুত্ব না দিয়ে তাঁর দর্শনের ব্যবহারিক দিকের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছি এবং দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, গোবিন্দ দেবের এই ব্যবহারিক দর্শনই ধর্ম, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তাত্ত্বিক দিক থেকে গোবিন্দ দেবের সমন্বয় কতটুকু সম্ভব সে আলোচনার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তাঁর এই সমন্বয়ী ভাবনা মানবজীবনের জন্য কতখানি কার্যকরী। তাই, আমি বলতে চেষ্টা করেছি গোবিন্দ দেবের নব্য নৈতিকতার প্রভাব মানবজীবনে তথা বিশ্বব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের পেছনে যার অবদান অপরিসীম তিনি হলেন আমার তত্ত্বাবধায়ক ও পরমশ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. প্রদীপ কুমার রায়। তাঁর উৎসাহ, অনুপ্রেরণায় আমি আমার গবেষণা কর্মটি এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি। তাঁর সাহায্য,সহযোগিতা এবং আন্তরিক যত্নশীল প্রচেষ্টার জন্যই পূর্বাপর উৎসাহ এবং উদ্দীপনা নিয়ে এ কাজটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি বলে আমি বিশ্বাস করি। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

এই অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে আমার তত্ত্বাবধায়ক ছাড়াও বিভাগীয় সকল শিক্ষকবৃন্দ বিশেষ করে বিভাগীয় প্রধান এবং আমার পরমশ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক লতিফা বেগম, অধ্যাপক ড. রওশন আরা, অধ্যাপক ড. এম. মতিউর রহমান, বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম, অধ্যাপক ড. নাঈমা হক, অধ্যাপক ড. এ,কে,এম, সালাহউদ্দিন, অধ্যাপক ড. জসীম উদ্দিন, অধ্যাপক আবু জাফর মো: সালেহ এবং জনাব গোলাম আজম নানাভাবে আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের হুইপ এবং সংসদ সদস্য জনাব মির্জা আজম ভাইকে। যিনি ঢাকায় অবস্থানকালে আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা এবং উৎসাহ যুগিয়ে গিয়েছেন। তাঁর কাছেও আমি ঋণী হয়ে রইলাম।

Dhaka University Institutional Repository

ধন্যবাদ জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক হিসাব পরিচালক জনাব রুহুল আমিন আকন্দকে যিনি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরু থেকেই আমাকে আন্তরিকভাবে সাহস এবং উৎসাহ প্রদান করেছেন। আমি স্বকৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁর কাছে আমার ঋণ স্বীকার করছি।

জনাব নুরুল আমীন এবং জনাব শাহ্ সুফী জাহাঙ্গীর আলম এই দু'জন ব্যক্তিত্ব আমার অভিসন্দর্ভ রচনার কাজে সংশ্লিষ্ট কিছু অফিসিয়াল কর্ম সম্পাদন করে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। উভয়ের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

পড়ালেখা এবং পেশাগত জীবনের ব্যস্ততার মাঝে নিজের পরিবারের প্রতি বরাবরই আমাকে উদাসীন থাকতে হয়েছে। সন্তানদের প্রতিও বিশেষ যত্নবান হতে পারিনি। আমার এ অভাব পূরণ করেছেন যে দু'জন মহীয়সী রমণী তারা হলেন একজন আমার মা মিসেস আয়েশা বেগম এবং অন্যজন মিসেস সাহিদা খাতুন। আমার মায়ের কাছে আমার ঋণ যেমন অপরিশোধ্য তেমনি সাহিদা আপার কাছেও আমার ঋণ শোধরাবার নয়। তাদের ত্যাগ, পরিশ্রম, সহানুভূতি-সহমর্মিতা আমাকে অভিসন্দর্ভ রচনার কাজে নিরন্তর প্রেরণা যুগিয়ে গিয়েছে। তাদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

আমার এই সাফল্যে যিনি সবচেয়ে বেশি খুশী হতেন তিনি হলেন আমার পরমশ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম মহিউদ্দিন আহমেদ। আমার সারাজীবনের কর্মপ্রেরণার উৎস তিনি। অত্যন্ত মেধাবী এবং শিক্ষানুরাগী আমার বাবা 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রাপ্তির বিরল সম্মান অর্জন করেছিলেন। আমি বিনম্র চিত্তে তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এ মহৎ কাজের অবিচ্ছিন্ন সারথী হিসেবে আমার চার সন্তানের নাম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। হ্যাপি, অনিক, অর্নব, অনন্যা ওদেরকে আমি যেমন বঞ্চিত করেছি আমার আদর-স্নেহ থেকে তেমনি ওরাও বিভিন্ন সময়ে আমাকে পাশে না পেয়ে যথেষ্ট মনঃক্ষুন্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের ঋণ অপরিসীম। তাঁদের এই ত্যাগকে মহিমান্বিত করে রাখতেই এ অভিসন্দর্ভ রচনার কাজে শেষ পর্যন্ত সমাপ্তিরেখা টানতে সক্ষম হয়েছি। অ্যাঞ্জেল আপির কাছেও আমি পরোক্ষভাবে ঋণী হয়ে রইলাম। এ পৃথিবীতে তার শুভাগমণ আমাকে নতুনভাবে অভিসন্দর্ভ রচনায় প্রেরণা যুগিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আমার স্বামী জনাব হাসমত আলী চৌধুরী, যিনি বরাবরই একজন বিদ্বৎসাহী ব্যক্তিত্ব বলেই পরিচিত। আমার বিবাহিত জীবনের শুরু থেকে তাঁরই একনিষ্ঠ প্রেরণা এবং উৎসাহে আমি আজকের অবস্থানে আসতে সক্ষম হয়েছি। শিক্ষাক্ষেত্রে তার অকৃপণ উদার মনোবৃত্তি আমাকে সত্যি মুগ্ধ করেছে। সাংসারিক দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করে তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন এ অভিসন্দর্ভ রচনায়। তাঁর কাছেও আমি চিরঋণী হয়ে রইলাম। তাঁর আন্তরিকতা, সহযোগিতা, সাহস, উৎসাহ না পেলে এ দুরূহ কাজ সম্পাদন করা আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব হতো না। তাঁর ধৈর্য্য, সহনশীলতা, একাগ্রতা আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে। তাঁর এ অবদানকে চির অম্লান করে রাখতেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

ধন্যবাদ জানাচ্ছি সরকারি তিতুমীর কলেজের দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর নূরে জান্নাত, সহযোগী অধ্যাপক সালমা জাহানসহ বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দকে। যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এ কাজে আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা এবং উৎসাহ প্রদান করেছেন।

স্থান সংকুলান না হওয়ায় অনেকের নাম সংযোজন করতে পারলাম না বিধায় আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। তবে, যে বিষয়টি উল্লেখ না করলেই নয় সেটি হলো, সর্বোপরি, আমার ভাই, বোন, বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কাজে আমাকে সহায়তা প্রদান করে অভিসন্দর্ভ রচনায় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছেন।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দকে। যাঁরা আমাকে শিক্ষা ছুটির বিষয়ে অফিসিয়াল প্রক্রিয়াসম্পন্ন করে এ কাজে সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

পরিশেষে মঞ্জুরী কমিশনের অর্থানূকুল্যে এবং ছুটিভোগ করে গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে পেরেছি বিধায় সাবেক এবং বর্তমান চেয়ারম্যানসহ কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা অভিসন্দর্ভে সন্নিবেশিত তথ্য-উপাত্ত যতদূর সম্ভব মূল উৎস থেকে আহরণ করেছি। অভিসন্দর্ভের সাথে সংশ্লিষ্ট দার্শনিক এবং চিন্তাবিদদের আলোচনা ও গ্রন্থাবলী দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। এছাড়া, এ অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থের উৎস হিসেবে যেসব গ্রন্থাগারের সাহায্য নিয়েছি সেগুলি হলো: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, গণগ্রন্থাগার, ঢাকা, রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগার, ঢাকা, দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা , সেমিনার, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। ভারতীয় হাই কমিশন গ্রন্থাগার, গুলশান-১, ঢাকা উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতার জন্য তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা।

এছাড়া, দর্শন বিভাগের এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার জনাব পানু গোপাল পাল, সিনিয়র গ্রন্থাগার সহকারী জনাব শিবেন্দ্র কুমার দে, গ্রন্থাগার সহকারী মিসেস জয়া সিংহ রায়, অফিস সহকারী মিসেস ফাতেমা আক্তার, ম্যাসেঞ্জার গ্রেড-১ মো. সেলিম, অফিস এটেনডেন্ট গ্রেড-১ মো. মুমিনুল ইসলাম ও পিয়ন মো. বাবলু মিয়াকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারাও বিভিন্নভাবে তথ্য-উপাত্তের সন্ধান দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

মালেকা আক্তার বানু
এম. ফিল. গবেষক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

জীবন ও কর্ম

১.১ গোবিন্দ দেবের পারিবারিক পরিচয়

১.২ গোবিন্দ দেবের শিক্ষাজীবন

১.৩ গোবিন্দ দেবের কর্মস্থল ও কর্মজীবন

১.৪ গোবিন্দ দেবের আন্তর্জাতিক খ্যাতি

Dhaka University Institutional Repository

জীবন ও কর্ম

বর্তমান বিশ্ব অতিক্রম করছে এক মহাসংকটময় মুহূর্ত। মুহুর্মুহু অকল্যাণের ধ্বনি আজ আকাশে-বাতাসে জলে স্থলে সর্বত্র বিরাজিত। দিগ্বিদিগজ্ঞানশুন্য অসহায় মানবকুল আজ শংকিত, ভীত হরিণীর ন্যায় বাকশুন্য। পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সন্ত্রাস, ক্ষুধা-দারিদ্র্য সর্বোপরি বৈশ্বিক উষ্ণতার মতো নানামুখী সমস্যার ভারে মাটির পৃথিবী প্রকম্পিত। চারদিকে হাহাকার আর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ যেন এক নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায়-পরিণত হয়েছে। সাংঘর্ষিক মনোবৃত্তি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে সমাজ-সংসার-অর্থনীতি তথা বৈশ্বিক রাজনীতিতে। মূল্যবোধের অবক্ষয় দিনে দিনে প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। অবহেলিত হচ্ছে মানবতা তথা মানবকল্যাণ। লাঞ্ছনা-বঞ্চনার শিকার হচ্ছে সমগ্র মানবতা। মানুষ রেসের ঘোড়ার মতো ছুটছে বিত্ত, বৈভব আর প্রাচুর্য্যের চোরাবালির হাতছানিতে। কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছে স্থির লক্ষ্যে পৌছুঁতে। গন্তব্যের পরিসমাপ্তি তার জানা নেই। তারুণ্যের উদ্দীপনাকে বিপথে পরিচালিত করে আজকের তরুণ সম্প্রদায় মেতে উঠেছে রক্তের হোলিখেলায়। সেখানে মনুষ্যত্ব তথা মানবতা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সুন্দর-জীবনের স্বপ্নগুলি থেকে যাচ্ছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। জীবনবোধ থেকে আজ আমরা সরে এসেছি দূরে-বহুদূরে। জীবনের নির্যাসটুকু ভুলে তার কঙ্কালটাকে আঁকড়ে ধরে জীবন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে শুধু অশান্তি আর অকল্যাণের পথটিকেই সুগম করা হচ্ছে। যথার্থ ধর্মীয় মনোবৃত্তি আজ নির্বাসিত। ধর্মের ছদ্মাবরণে একদল লোভী অন্ধ মানব জগৎ-সংসারে মুনাফা লাভের চেষ্টায় স্বাভাবিক জীবনাচরণকে করে তুলেছে দুর্বিষহ। চলমান এই ক্ষুদ্রস্বার্থ ও দ্বন্দ্বের বেড়াজাল থেকে মুক্তির জন্য আজ বড় প্রয়োজন নৈতিক মূল্যবোধ তথা জীবনবোধের সেই অমোঘ সম্মোহনী-শক্তির। জীবনের আস্বাদ-গ্রহণ করে সুন্দর-সুস্থভাবে বেঁচে থেকে দেশ ও জাতিকে পুর্ণগঠন তথা স্বস্তির সুধা পানের জন্য যা আজ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে তা হলো–নৈতিকতার যথার্থ চর্চা আর এই "নৈতিকতার" সংজ্ঞা কোনো সনাতনী সংজ্ঞা নয়। এ হলো এক নতুন নৈতিকতা যা গোবিন্দ দেবের ভাষায়-'নব্য নৈতিকতা'।

গোবিন্দ দেব এমনই একজন সরল-প্রাণ শিশুসুলভ আচরণ সমৃদ্ধ উদার মনের মানুষ ছিলেন, যিনি জাত-পাত, ধর্ম-বর্ণ, উঁচু-নিচু এমনকি আভিজাত্যের মাপকাঠিতে সাধারণ মানুষকে বিচার করেননি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গৌতম বুদ্ধের মত অহিংস, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের মত মানবদরদী। তাঁর প্রণীত

Dhaka University Institutional Repository

'নব্য নৈতিকতা' আজকের বিশ্বে একটি অত্যুত্তম পন্থা হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। তাঁর এই সর্বজনীন নৈতিকতায় না আছে বস্তুবাদীদের চরম উগ্রতা, না আছে অধ্যাত্মবাদের প্রগাঢ় ধ্যাননিষ্ঠা। উভয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্মিলনই তাঁর 'নব্য নৈতিকতা'। নিষ্ঠা আর আচারপ্রবণ ব্যক্তিমাত্রই তা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন।। একবিংশ শতাব্দীর তথ্য-প্রযুক্তির আর্শীবাদপুষ্ট বিশ্বে ধর্মীয় রীতির যথার্থ লালন-প্রতিপালন কোথাও নেই বললেই চলে। আমরা যারা নিজেদের সভ্য মানুষ বলে দাবি করি তাদের উচিত অন্তত সুবিবেচনাপ্রসূত পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের লালন করা তথা বাস্তবজীবনে এর প্রতিফলন ঘটানো। পুরনো পৃথিবী পাপে-তাপে হিংস্রতায় আজ জর্জরিত। প্রয়োজন সংস্কারের। প্রজন্মের ধারাকে অব্যাহত রাখতে হলে মানুষকে তার পুরনো সংস্কার-আচার বদলে দিয়ে নতুন প্রাণে, নতুনরূপে নৈতিকতার চেতনায় উজ্জীবিত হতে হবে। আর এই উজ্জীবনী শক্তিই হতে পারে– 'একবিশ্ব' তথা 'বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধনের' মূল শেকড়। দেবের 'এই বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধন' তথা 'একজগৎ' গঠনের প্রেরণা আসবে 'জ্ঞান' এবং 'প্রেমের' সফল সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে। যা বিশ্ব মানবতার স্থায়ী এবং সর্বজনীন কল্যাণবিধান করে মানুষকে মুক্তির অনাবিল সুখের অবারিত দ্বার উন্মোচনে সহায়তা করবে।

১.১ গোবিন্দ দেবের পারিবারিক পরিচয়

এই বিশ্বচরাচরে জন্ম-মৃত্যু এক সহজ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। মানুষ জন্ম নেয় আবার মৃত্যুতে কালের গর্ভে বিলীনও হয়ে যায়। রয়ে যায় কিছু স্মৃতি, কিছু কর্ম। মহাকালের কোনো এক শুভক্ষণে মহামনীষী গোবিন্দচন্দ্র দেব জন্মেছিলেন বর্তমান সিলেট বিভাগেরই সিলেট জেলার বিয়ানীবাজারের পঞ্চখণ্ড পরগনার লাউতা গ্রামে। সময়ের নিরিখে সেটি ছিল ১৯০৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শুরুতেই। ধীরে ধীরে ঘটতে থাকে এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপ্রবাহ। ১৯১১ সালে ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গ রদ থেকে শুরু করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারত বিভক্তি, আলোচিত লাহোর প্রস্তাবসহ পূর্ববাংলার গণমানুষের প্রাণের দাবি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে এদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি,সামাজিক–সাংস্কৃতিক অঙ্গন তখন মুখরিত ছিল। দেবের জীবনকাল আবর্তিত হয়েছিল উল্লিখিত এসব ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়েই।

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানতাপস প্রাচ্যের এই সক্রেটিস যে গ্রামে জন্মলাভ করেছিলেন তা কোনো নামী-দামী অভিজাত এলাকা ছিল না। ছিল সবুজ-ছায়াঘেরা শান্ত-নিভৃত এক পল্লি। দেবের জন্ম না হলে হয়তো এই নিভৃত পল্লি সবার আড়ালেই রয়ে যেত। তাঁর বাল্যজীবন, কৈশোর, পরিবারিক জীবন ছিল খুবই সাদা-মাটা এবং বলা চলে অত্যন্ত দুঃখক্লিষ্ট। হিন্দু পারিবারিক আবহে লালিত-পালিত দেব ছোটবেলা থেকে বেড়ে উঠেন বেদ- বেদান্ত-উপনিষদ চর্চার মধ্য দিয়ে। দেবের পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত। ধারণা করা হয়, পঞ্চম শতাব্দীতে তাঁর পূর্বপুরুষেরা কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্মা কর্তৃক ব্রহ্মোত্তর সম্পদ লাভ করে পঞ্চখণ্ডে আগমন করেন। ভাস্কর বর্মার অনুগ্রহলাভ করে সিলেটে যারা বসবাস করছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিল গুজরাটি ব্রাহ্মণ। ডা: ভাণ্ডারকারের মতে, "এসব ব্রাহ্মণদের উপাধি ছিল পাল, পালিত, দেব, সিংহ ইত্যাদি। তবে, গুজরাটি ব্রাহ্মণগণ সিলেটে এসে ব্রাহ্মণ্য রক্ষা করতে না পেরে কায়স্থ হন। ধারণা করা হয়, হয়তো গোবিন্দ দেবের পরিবার এভাবেই 'দেব পুরকায়স্থ' উপাধি ধারণ করেন"।[১] তাঁর পিতা ঈশ্বরচন্দ্র দেব পুরকায়স্থ ছিলেন অত্যন্ত সহজ সরল-উদার প্রকৃতির মানুষ। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও তিনি নিজ মেধা আর পরিশ্রমের গুণে তাঁর পরিবারকে এক সম্মানজনক ও সমৃদ্ধশালী অবস্থানে দাঁড় করাতে পেরেছিলেন। আর এসব বিত্ত-বৈভবের সুবাদেই দেবের পরিবারে গতানুগতিকভাবে পূজা-অর্চনা, দোল-দুর্গোৎসবসহ সবরকম সামাজিক, ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রায় লেগেই থাকতো। একই সাথে চলতো বিষয়-সম্পত্তি রক্ষার হাতিয়ার মামলা-মোকদ্দমার দীর্ঘসূত্রিতা। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে দেবের বাবা সেই সুদৃঢ় অবস্থান থেকে সহসাই ছিটকে পড়েন। ব্যবসায়িক সহকর্মীদের প্রতারণার ফাঁদে পড়ে তিনি অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। চরম অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে দারিদ্র্যের কষাঘাতে শোকে-দুঃখে, বেদনা-ব্যর্থতায় শেষ পর্যন্ত ১৯২৫ সালে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। পিতার অকালপ্রয়াণের পর দেব হয়ে পড়েন দিশেহারা-গৃহহারা। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে জীবনের বাস্তবতাকে দেব মেনে নিয়েছিলেন বাস্তবতার নিরিখেই।। তাই ভাগ্যবিপর্যয়ের এহেন পরিস্থিতিতেও নিজের পড়াশুনা চালিয়ে যান অত্যন্ত কষ্টের মধ্য দিয়ে। অসাধারণ মেধা আর প্রতিভাধর দেব তাঁর শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ক্ষণকাল-স্থায়ী সুখকে যেমন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে তেমনি আকস্মিকভাবে দুঃখের সাগরে নিপতিত হয়ে বিত্ত-বৈভব আর বিষয়সম্বলহীনতার পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করেছেন অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে। ফলশ্রুতিতে, পরবর্তীকালে তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

লিখনির মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে পরস্পর বিরোধী দুটো মতের সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়া। এই দুই মতবাদের একটি হচ্ছে 'ভাব' অপরটি 'বস্তু'।

১.২ গোবিন্দ দেবের শিক্ষা জীবন

দেব পড়ালেখা শুরু করেন আবাল্য লালিত সবুজ-ছায়াঘেরা নিজ গ্রামে অবস্থিত 'লাউতা বালক বিদ্যালয়' থেকে। বিদ্যালয়টি দেবের বাড়ির কাছেই অবস্থিত ছিল। জানা যায়, গোবিন্দ দেব ছোটবেলায় দুর্দান্ত প্রকৃতির ছিলেন। বিদ্যালয় পালানোতেও তাঁর জুড়ি ছিল না। বিদ্যালয়ে যাবার নাম করে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাশের ঝোপ-জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতেন। পরবর্তীতে এই দুর্দান্ত -দামাল বালকটি হয়ে উঠেছিলেন স্বভাবে শান্ত, আচরণে সংযত মেধা-মননের এক মূর্ত প্রতীক। গোবিন্দ দেবের শিক্ষক রাজেন্দ্র ভট্টাচার্য স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, তাঁর জীবনে তিনি দু'জন মানুষের যুগান্তকারী পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। তাদের একজন 'গোবিন্দ দেব', অন্যজন হচ্ছেন 'শ্যামাকান্ত'– যিনি পরবর্তীকালে আসামের এম.এল.এ. হয়েছিলেন।[২] শিক্ষাজীবনের প্রাথমিক স্তর বলা যায় দেবের পারিবারিক আবহের মধ্যেই কেটেছে। লাউতা বালক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে গোবিন্দ দেব তাঁর বাড়ি থেকে সামান্য দূরে 'মধ্য ইংরেজি স্কুল'-এ ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। "গোবিন্দ দেব 'মধ্য ইংরেজি স্কুল' থেকে পড়াশুনা শেষ করে 'পঞ্চখণ্ড হরগোবিন্দ উচ্চ বিদ্যালয়'–এ ১৯২১ সালে ভর্তি হন এবং ১৯২৫ সালে উক্ত স্কুল থেকে সংস্কৃত ও অংকে লেটারসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সরকারি বৃত্তি লাভ করেন।"[৩] ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর দেব তাঁর বড় ভাই বীরেন্দ্রচন্দ্র দেব পুরকায়স্থের নিকট চলে যান। সেখান থেকেই ১৯২৫ সালে কোলকাতার রিপন কলেজে (যা বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ নামে খ্যাত) আই.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। মেধা এবং প্রতিভার স্বাক্ষর দিয়ে ১৯২৭ সালে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায়ও যুক্তিবিদ্যায় লেটারসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি ঐ বছরই কোলকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন এবং তীক্ষ্মমেধা এবং অধ্যবসায়ের ফলে ১৯২৯ সালে বি.এ. (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন। "তাঁর অসাধারণ মেধা, প্রবল আগ্রহ, চিন্তাশক্তির প্রসারতা এবং সর্বোপরি সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় পেয়ে উক্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ভারতীয় দর্শন বিশেষজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে বিশেষ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেন।"[৪] ড. সুরেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় দেব ভারতীয় দর্শন তথা

Dhaka University Institutional Repository

দর্শনশাস্ত্রে যেমন অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন তেমনি পড়াশুনার প্রতিও সৃষ্টি হয়েছিল গভীর আগ্রহ আর মনোযোগ। বি.এ. (সম্মান) শ্রেণীতে দেব দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলেও তাঁর পরবর্তী উচ্চশিক্ষার ধাপগুলি ছিল অত্যন্ত কৃতিত্বের এবং সাফল্যের। শিক্ষার এ পর্যায়ে ১৯২৯ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে দর্শন শাস্ত্রে বি.এ. (সম্মান) পাস করার পর তিনি ঐ বছরই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. শ্রেণীতে ভর্তি হন। গবেষণা, চিন্তা, মেধা-মনন এবং গভীর জ্ঞানানুশীলনের স্বাক্ষর রেখেছিলেন তিনি এম.এ. ক্লাসেও। তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩১ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে 'বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণপদক' ও 'হেমচন্দ্র মুখার্জি' রৌপ্য পদক লাভ করে এক দুর্লভ সম্মান অর্জনের দাবিদার হন। এসময় যেসব গুণী ব্যক্তিত্বদের সাহচর্য তিনি লাভ করেছিলেন এবং যাদের সাহচর্য লাভ করে গভীরভাবে দর্শন অধ্যয়ন ও জীবনবোধের এক অপূর্ব সমন্বয়ের পথ খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত দার্শনিক ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, হীরালাল হালদার, ড. মহেন্দ্রনাথ সরকার, কে.সি. ভট্টাচার্য প্রমুখ। এই কে.সি. ভট্টাচার্য (কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য) ভারতের 'Greatest Dialectian' বলে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

পরবর্তীকালে দেব উচ্চশিক্ষা তথা গবেষণা করার জন্য ভারতের মহারাষ্ট্র প্রদেশের জালগাঁও জেলার অন্তর্গত আমলনারের বিখ্যাত দর্শন গবেষণা কেন্দ্র 'Pratap Centre of Philosophy'-তে ১৯৩৪ সালে বৃত্তি নিয়ে গমন করেন। সে সময় এই গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন উক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য।[৫] গোবিন্দ দেব কে. সি. ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় দর্শন বিশেষ করে বেদান্ত দর্শনে গবেষণা শুরু করেন। প্রায় দেড় বছরকাল সেখানে অবস্থান করে ১৯৩৭ সালে তিনি কোলকাতায় ফিরে আসেন। আমলনার থেকে ফিরে এসে দেব অধ্যাপনা শুরু করেন কোলকাতার রিপন কলেজে। তবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৩৯ সালে কলেজটির নিরাপত্তাজনিত কারণে স্থানান্তরিত হয় বর্তমান বাংলাদেশের দিনাজপুরে। সেই সুবাদে দেবও দিনাজপুরে চলে আসেন। দিনাজপুরে অবস্থানকালে দীর্ঘ গবেষণা ও পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে গোবিন্দ দেব 'Reason, Intuition and Reality' শিরোনামে একটি অভিসন্দর্ভ রচনা করেন। "১৯৪৪ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত অভিসন্দর্ভের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে Ph. D. ডিগ্রি প্রদান করে । উল্লেখ্য, গোবিন্দ দেবের উক্ত অভিসন্দর্ভের পরীক্ষক ছিলেন ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নের কৃতী

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষক ও ভাববাদী দার্শনিক হরিদাস ভট্টাচার্য।"[৬] পরবর্তীতে 'Reason, Intuition and Reality' শিরোনামের অভিসন্দর্ভটি প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও পরিবর্ধন সহকারে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় *Idealism and Progress* শিরোনামে।

১.৩ গোবিন্দ দেবের কর্মস্থল ও কর্মজীবন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা কেটে গেলে ১৯৪৫ সালে উক্ত রিপন কলেজটিকে কর্তৃপক্ষ পুনরায় স্থানান্তর করে কোলকাতায় নিয়ে যান। কিন্তু দেব অকৃত্রিম প্রাণের টানে দিনাজপুরবাসীকে ভালোবেসে থেকে যান দিনাজপুরেই। দিনাজপুরে স্বল্পকাল স্থায়ী কলেজটিকে পূর্ণরূপ দেয়ার মানসে অক্লান্ত পরিশ্রম আর সকলের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা করেন 'সুরেন্দ্রনাথ কলেজ'। তিনি ছিলেন সেই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। শুধু অধ্যক্ষই নন তিনিই ছিলেন কলেজটির মধ্যমণি। দেবের স্বপ্ন ছিল দিনাজপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজটি হবে দর্শনচর্চার এক তীর্থস্থান, সে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য দেব অক্লান্ত পরিশ্রম আর মেধার অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে তাঁর সুদক্ষ পরিচালনার দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যেই কলেজটিকে একটি সম্মানজনক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দেবের অসামান্য অবদান প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. অজয় রায় বলেন–

> "জন্মসূত্রে তিনি দিনাজপুরের অধিবাসী নন–অথচ দিনাজপুরকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন নিজের বলে; দিনাজপুরবাসীকে ভালবেসেছেন, হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন। দিনাজপুরবাসীরাও তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন ভালবাসা দিয়ে। মনে পড়ে পিছনে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। দিনাজপুরের একমাত্র কলেজের তখন সংকটাপন্ন অবস্থা– বিশেষ করে কলেজের আর্থিক প্রেক্ষিতে। মাঝে মাঝে দেখতাম বাবা [ড. অজয় রায়ের পিতা] বাড়ি থেকে চলে যেতেন বেশ কয়েকদিনের জন্য। মার [ড. অজয় রায়ের মা] কাছে শুনতাম অধ্যাপক দেব বাবাকে নিয়ে গ্রাম–গ্রামান্তরে ঘুরছেন কলেজের জন্য টাকা তুলতে। বাবার কাছে শুনেছি–ডক্টর দেব গ্রামে, গঞ্জে, হাটে ভিক্ষা পাত্র নিয়ে কলেজের জন্য 'তহবিল' গড়ে তুলতে সভা সমিতি করেছেন। শুধু টাকা পয়সা তুলেই ক্ষান্ত হননি, দিনাজপুরবাসীদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবার জন্য দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছেন, উৎসাহ জুগিয়েছেন। দিনাজপুরের 'সুরেন্দ্রনাথ কলেজ' তাঁরই অবদান। তিনি এর শুধু আনুষ্ঠানিক অধ্যক্ষ ছিলেন না, ছিলেন কলেজের প্রাণ, কলেজের হৃদয়। তিনি ঐ কলেজকে কেন্দ্র করে অনেক স্বপ্ন দেখতেন — স্বপ্ন দেখতেন কলেজকে একদিন উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠতম বিদ্যাপীঠ হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

> গড়ে তুলতে, বিশ্ববিদ্যালয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে। স্বপ্ন দেখতেন দর্শন শাস্ত্রের, বিশেষ করে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের তীর্থভূমি হবে দিনাজপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজ।"[৭]

দেব প্রায় আট বছরকাল অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের ১ জুলাই থেকে ১৯৫৩ সালের ২১ জুলাই পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির প্রেক্ষাপটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট দেখা দেয়। সে সময় সরকারের উর্ধ্বতন মহলের অনুপ্রেরণা ও আমন্ত্রণে দেব ১৯৫৩ সালের ২২ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে যোগদান করেন।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর যোগদান এক নবদিগন্তের সূচনা করে। দর্শনচর্চার ক্ষেত্রে তিনি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে গঠনমূলক এবং সৃজনশীল দর্শনচর্চার পথ উন্মুক্ত করেন। ঐ সময়ে দর্শন বিভাগে কৃতী অধ্যাপক হিসেবে যারা যোগদান করেছিলেন তারা হলেন– জি.এইচ. ল্যাংলি, হরিদাস ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জিলানি প্রমুখ। দেবের সূচিত এই ধারা আজও তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি, স্নেহভাজন ছাত্র ও সহকর্মীবৃন্দ অব্যাহত রেখেছেন। দেবের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও অসংখ্য প্রবন্ধ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে রক্তপিপাসু পাকিস্তানী বর্বর বাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে শহীদ হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। গোবিন্দ দেব ছিলেন সত্যিকার অর্থেই একজন দার্শনিক। তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম। যে ইন্দ্রিয়ের গুণে তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন অতিমানব, মানবিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার মূর্ত প্রতীক। পারস্পরিক সম্প্রীতির আদর্শে বলীয়ান একজন অসাধারণ জীবন্ত কিংবদন্তী। ১৯৮৬ সালে দেব বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত সম্মানসূচক একুশে পদকে ভূষিত হন। অন্যদিকে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্য ২০০৮ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁকে স্বাধীনতা দিবস পুরষ্কারেও ভূষিত করেন।

১.৪ গোবিন্দ দেবের আন্তর্জাতিক খ্যাতি

দেব শুধু দেশেই নয় দেশের বাইরে অর্থাৎ আর্ন্তজাতিক পরিমণ্ডলেও তাঁর বিচরণ ছিল অবাধ এবং প্রাণবন্ত। তার প্রমাণ মেলে, দেবের জীবিত অবস্থায় এবং মৃত্যুর পর দেশ বিদেশের বহু পত্র-

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর দর্শনের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে। তিনি 'Pakistan Philosophical Congress' এবং 'Indian Philosophical' Congress' এর সভাপতি ও শাখা সভাপতি হিসেবে একাধিক বার করাচি, লাহোর, পেশোয়ার প্রভৃতি জায়গায় ভ্রমণ করেছেন। তিনি Pakistan Philosophical Congress এর পূর্ব পাকিস্তান শাখার সম্পাদক ছিলেন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। তাঁর দার্শনিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ যুক্তরাজ্যের 'The Union of the Study of General Religions' এবং যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Philosophy of Science Association' এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। দেবের গভীর পাণ্ডিত্য, মানবমুক্তি ও কল্যাণের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার প্রাণপ্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, অগণিত-অনুরাগী ও ভক্তবৃন্দ মানবতাবাদী দর্শন প্রচার ও প্রসারের জন্য ১৯৬৭ সালের ২৬ শে মে *The Govinda Dev Foundation for World Brotherhood* প্রতিষ্ঠা করেন।

> "বিদেশে ভ্রমণকালে তিনি মূলত প্রাচ্য দর্শনের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা, দর্শনের ব্যবহারিক মূল্য, বিভিন্ন ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতির প্রচেষ্টায় দর্শনের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সারগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন।"[৮]

এছাড়া, বিদেশে বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে দর্শনের বিভিন্ন দিকের প্রতি বক্তব্য প্রদান করে অজস্র সুনাম কুড়িয়েছেন। চিন্তা চেতনার মৌলিকত্বের দিক থেকে এবং বিশ্ব ঐক্যের ধারক ও বাহক হিসেবে দেব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। অসংখ্য কাজ অসমাপ্ত রেখেই তাঁকে চলে যেতে হয়েছে এক ভিন্ন জগতে একান্ত বাধ্য হয়েই। দেবের স্মৃতি ধরে রেখেছেন তাঁর লাউতা গ্রামবাসী পরম মমতায় ও শ্রদ্ধায়। স্মৃতিফলক স্থাপন করা হয়েছে দেবের বসতবাড়িতে। যুগ যুগ ধরে তা স্মৃতির মণিকোঠায়-লালিত হবে শ্রদ্ধার সাথে, বিনয়ের সাথে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূচি

১. ড. প্রদীপ রায় সম্পাদিত, '*গোবিন্দচন্দ্র দেব, জীবন ও দর্শন*', মির্নাভা প্রেস, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ.০১

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

৩. ড. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস সম্পাদিত, '*জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি: গোবিন্দচন্দ্র দেব: জীবন ও দর্শন*', অবসর প্রকাশনা, জুলাই ২০০৮, পৃ.১৭

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

৫. ড. প্রদীপ রায় সম্পাদিত, '*গোবিন্দচন্দ্র দেব, জীবন ও দর্শন*', মির্নাভা প্রেস, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ.৫

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫-৬

৭. ড. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস সম্পাদিত, '*জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি: গোবিন্দচন্দ্র দেব: জীবন ও দর্শন*', অবসর প্রকাশনা, জুলাই ২০০৮, পৃ.১৮-১৯

৮. ড. প্রদীপ রায় সম্পাদিত, '*গোবিন্দচন্দ্র দেব, জীবন ও দর্শন*', মির্নাভা প্রেস, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ.৩৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

গোবিন্দ দেবের দার্শনিক পটভূমি

২.১ ধর্ম

২.২ বিজ্ঞান

২.৩ দর্শন

Dhaka University Institutional Repository

গোবিন্দ দেবের দার্শনিক পটভূমি

সময় ইতিহাসের এক বিস্ময়কর শক্তি, বহতা নদীর মতোই সময় এসে আবার চলেও যায় সবার অজান্তে। কালের সাক্ষী হয়ে থাকে পিছনে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা। ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম মেনে যুগে যুগে পৃথিবীতে এসেছেন নানান মুনী-ঋষী, সাধু- সন্ন্যাসী, ফকির-দরবেশ, পীর-পয়গাম্বর, নবী-রাসুল, ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, শিল্পী-দার্শনিক এমন আরও অনেক প্রতিনিধি। বস্তুত মানব জীবনের সাথে প্রকৃতির এক দারুণ সাযুজ্য রয়েছে। এ কারণেই হয়তো বা মানুষ কখনো এসবের সহাবস্থান থেকে কখনো সহাবস্থানের বৈপরীত্যের মধ্যেই তার চিরচেনা সমাজকে দেখেছে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে। গড়ে ওঠেছে নানা মত, নানা পথ। পরিবর্তন এসেছে এসব মতের বা পথের আঙ্গিকে-অবয়বে, মৌলিকত্বে। মানবমনের চিন্তা-চেতনা-বিশ্বাস পরিবেশ ভেদে ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু এর মাঝেই থেকে যায় এক সর্বাত্মক আত্মিক যোগসূত্র। আর এ যোগসূত্র থেকেই জন্ম নেয় নির্ভেজাল মানবকল্যাণের প্রয়াস। প্রতিটি সমাজব্যবস্থার থাকে তাঁর নিজস্ব একটি আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো যাতে প্রতিফলিত হয় যুগের আহ্বান। এর প্রভাব পড়ে ঐ সময়কার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের লেখনিতে বা জীবনাচরণে। সেদিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সক্রেটিস থেকে শুরু করে প্লেটো, এরিস্টটল, রাসেল যেমন তাদের নিজস্ব আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে এড়িয়ে যেতে পারেন নি, তেমনি পারেন নি কান্ট, হেগেল, শোপেনহাওয়ার, নিটশে, মার্কস এবং সর্বোপরি অস্তিত্ববাদী দার্শনিক সার্তও। যুগের আদর্শ প্রতিফলিত হয় সে যুগের শিক্ষা-সংস্কৃতি, স্থাপত্য-কলা, দর্শনে-নন্দনতত্ত্বে। তাইতো দর্শন মানেই জীবনদর্শন। জীবনের আসল নির্যাস আবিষ্কার করাই এর লক্ষ্য। দর্শনের আছে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে দার্শনিক শুধু নন, ব্যক্তিমাত্রই স্বাধীন, চেতনার শাণিত প্রজ্ঞা আর অনুভবের অন্তরতম আবহে এর অবগাহন।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি দেবের জীবনে পারিবারিক অস্বচ্ছলতা, দুঃখ-দারিদ্র্যের কষাঘাত, অন্যদিকে নির্যাতন- নিপীড়নে জর্জরিত সাধারণ মানুষ, শোষিত-বেদনার্ত মুখের প্রতিচ্ছবি, সর্বোপরি মুক্তিকামী জনতার তীব্র আর্তনাদ দেবকে দিশেহারা করে তোলে। তিনি রক্তেভেজা বুক আর হৃদয়ে গভীর প্রত্যয় নিয়ে মুক্তির মঞ্চ রচনা করেন তাঁর ধারালো লেখনির দ্বারা। তাই তো তিনি অতি সাবলীল ভাষায় রচনা করতে পেরেছিলেন দু'টি পরস্পর বিরোধী ধারার আদর্শকে একসূত্রে গ্রথিত

Dhaka University Institutional Repository

করার মূলমন্ত্র। সমন্বয়ের মূলমন্ত্রে তিনি উজ্জীবিত ছিলেন। বস্তুত মানুষের কর্মকাণ্ডও ধাবিত হয় নিঃশর্তভাবে সমন্বয়ের দিকেই। দেব তার মানবতা ও সমন্বয়ের ভিত্তি খুঁজে পেয়েছিলেন এক সর্বব্যাপী বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে। তাঁর দার্শনিক আদর্শ তাই বিশ্বমানবতার একত্বে। তাঁর এই একত্বের ধারণা হেগেল থেকে ভিন্ন। হেগেল বলেছিলেন, বহুর ভেতরে একের দর্শন। কিন্তু দেব একের ভেতরেই বহুর দর্শনকে আদর্শায়িত করে গেছেন। তিনি বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কথা বলে গেছেন। তিনি এও মনে করেন যে, আধ্যাত্মিকতা বর্জিত বস্তুবাদ যেমন মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের অন্তরায় তেমনি বস্তুতান্ত্রিকতাকে পরিহার করে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশও সার্বিক কল্যাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে না। তাই তাঁর ধর্মীয় মানবতাবাদে রয়েছে এমন এক সামগ্রিকতার ধারণা যাতে জগতের যা কিছু উত্তম তার সমন্বয় ঘটেছে। তিনি ব্যক্তিচেতনার এমন এক রূপ দেখতে চান যাতে প্রত্যেকটা বিষয় একটা সমগ্রের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। আর এক্ষেত্রে দেবের ধর্মীয় নৈতিকতা সম্বলিত চেতনার উন্মেষ দর্শনের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখবো দেব তাঁর দার্শনিক পটভূমি তৈরিতে কীভাবে বিভিন্ন বিষয় বিশেষ করে ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে নিজস্ব মতামত তুলে ধরেছেন।

২.১ ধর্ম

ধর্ম উৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে সঠিক কোনো তথ্য জানা না গেলেও মানবজাতির উৎপত্তির ইতিহাসের মতোই এর প্রাচীনতা। মানবমনের অনুভূতি, কল্পনা, ভাবাবেগ, বিশ্বাসপ্রবণতা এগুলো ধর্মীয় চেতনার প্রধান উপাদান। মানুষ আবেগতাড়িত জীব। মানুষ যখন ভাবাবেগতাড়িত হয়ে সাফল্যলাভের চেষ্টায় পূজা-অর্চনা, প্রার্থনা, উপাসনা প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করে থাকে তখন তার এরকম কার্যকলাপকেই ধর্মচেতনার বহিঃপ্রকাশ বলা যেতে পারে। "অর্থাৎ ধর্ম চেতনার উৎস আমাদের হৃদয় (অর্থাৎ ভাবাবেগ) এবং দর্শন চিন্তার উৎস হল আমাদের মস্তিস্ক (অর্থাৎ বুদ্ধি)"[১]। হৃদয়বৃত্তির আহ্বানে সাড়া দিয়েই মনুষ্যজাতি সেই প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন ধর্ম গড়ে তুলেছে। ধর্ম প্রচার-প্রচারণার তাগিদে একই সম্প্রদায়ভুক্ত জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, উদ্ভব ঘটেছে সমমনা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর। অর্থাৎ, ধর্ম মানব প্রজাতির ইতিহাসে নবদিগন্তের সূচনা করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

মানবমনের হতাশা ব্যর্থতার নিরতিশয় বেদনাক্লিষ্ট চিত্তে ধর্ম শান্তির পরশ বুলিয়েছে। মনের গহীনে অস্ফুট অনুভূতির কেন্দ্রস্থলটি ধর্মই দখল করে রয়েছে। তবে ধর্ম বিশ্বাসের সাথে বিচারবুদ্ধি প্রসূত সিদ্ধান্তের বিরোধ প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়।। সাধারণত এটা মনে করা হয় যে, ধর্ম ও দর্শনের বিষয়গুলি পুরোপুরি ভিন্ন মাত্রার বিষয় এবং এর ধর্মীয় ধারণাগুলি এক শ্রেণীর অপরিপক্ব সাধারণ লোকের নিম্নস্তরের দর্শনমাত্র। এ প্রসঙ্গে দেব বলেন, "এটা প্রায় স্বীকৃত সত্য যে, নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা কম বেশী আবেগমিশ্রিত এবং এসব অভিজ্ঞতার মধ্যে সজ্ঞান বা নির্জ্ঞান ইচ্ছা পরিপূরণের একটি উপাদান বিদ্যমান"[২]। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্মীয় বিষয়গুলিকে অবশ্যই দর্শনচিন্তার অন্তর্ভুক্ত করা যায়, কেননা জগতে এমন কোনো বিষয় নেই যা দর্শনের আওতার বাইরে। সেদিক থেকে ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধারণাগুলোকে দর্শন অবশ্যই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে পারে। ধর্মের দার্শনিক মূল্যায়নের এক পর্যায়ে দেব মনে করেন, বিরাজমান অভিজ্ঞতার গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায় সর্বশেষ স্তর প্রশান্ত আত্মার এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা। দেবের ধর্মানুভূতি ছিল এক উচুঁমানের আধ্যাত্মতত্ত্বের স্বীকৃতি। তিনি তাঁর *The Philosophy of Vivekananda and the Future of Man* গ্রন্থের Religion of the Bold শীর্ষক প্রবন্ধে ধর্ম এবং জ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় উক্তি হলো, "In short, the way of knowledge constitutes the religion of the superlatively bold and not of the terror- stricken who, out of a fear-complex, are out to make a bargain with the Deity"[৩].

ধর্ম হচ্ছে এমন এক পদ্ধতি যেখানে অবিসংবাদিতভাবে নিহিত রয়েছে ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম, প্রার্থনা সর্বোপরি ব্যক্তি তার নিজেকে সমর্পণ করার এক আত্মিক প্রয়াস। ধর্মের প্রাকৃতিক এবং প্রত্যাদিষ্ট বিষয় যা-ই হোক না কেন এর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হলো অতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং এর মাধ্যমে মানবীয় চাহিদার পরিপূর্ণ সন্তুষ্টিলাভ যেখানে রয়েছে ঈশ্বর, প্রেম, দয়া, প্রার্থনা, ভক্তি-শ্রদ্ধা। কিন্তু দেব অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে লক্ষ্য করেছেন, যুগে যুগে ধর্মের নামে সংঘটিত হয়েছে নানা রকম শোষণ-বঞ্চনা-নির্যাতন। ধর্মের অন্তরালে অধর্ম, কুসংস্কার, অন্ধতা, পরপীড়নই যেন মুখ্য বিষয় হয়ে জগতের সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। অথচ ধর্মের মূলকথা হচ্ছে আমাদের ব্যষ্টি চেতনার পেছনে যে একটি 'সামগ্রিক শাশ্বত চেতনা' আছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন এবং

Dhaka University Institutional Repository

মানবকল্যাণে জীবনকে উৎসর্গ করা। ধর্মের এই ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে দেব বলেন, ধর্মীয় অনুভূতির মূলে যে ঐশী চেতনার অস্তিত্ব মানুষ অনুভব করে তাতে বিশ্বাস স্থাপনই হচ্ছে চূড়ান্ত ধর্মীয় লক্ষ্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানবমনকে উদারতা প্রদান করে বিশ্ব মানবল্যাণে এর স্বাক্ষর রাখতে সহায়তা করে। ফলে প্রগাঢ় একাত্মানুভূতি-সম্পন্ন মানুষের ব্যবহারিক জীবন হয়ে উঠে সত্যিকার অর্থেই সার্থক এবং সুন্দর। "ধর্ম মূলত একটি পরিপূর্ণ জীবন পদ্ধতি যার মাধ্যমে মানুষের চিন্তা, কর্ম, দৃষ্টিভঙ্গি সুসংগঠিত হয়। এটি মানুষের অস্তিত্ব বিকাশের প্রক্রিয়ায় সমগ্রসত্তার উন্মোচন ঘটায়। ধর্মে আস্থাশীল মানুষ একটি পূর্ণাঙ্গ সক্রিয় সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে সকল অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস এবং কর্ম আদান-প্রদান করে"[৪]। গোবিন্দদেবের অধিকাংশ রচনা তথা দার্শনিক পটভূমিতে ধর্মীয় আলোচনার সমাহারই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দেব সমগ্র সৃষ্টির মধ্যদিয়েই ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করার প্রয়াস চালিয়েছেন। তিনি মনে করেন, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সেবার মাধ্যমেই ঈশ্বরের সেবা করা সম্ভব। চিরায়ত ধর্মই হচ্ছে সেই আলোকবর্তিকা যা মানুষের বাস্তব প্রয়োজন মিটিয়ে বিশ্বঐক্য, শান্তি, সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করতে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করার প্রেরণা যোগাবে। আর সেই অর্থেই ধর্ম পরিপূর্ণরূপে অর্থবহ হয়ে উঠবে। দেবের ধর্মীয় আলোচনার প্রেরণা এসেছে প্রধানত গৌতম বুদ্ধের মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্বামী বিবেকানন্দের আধুনিক হিন্দু ভাবধারা থেকে। দেব চিরায়ত ইসলাম ধর্মের সাম্য-মৈত্রী এবং সম্প্রীতির বাণী, যিশুখ্রিষ্টের মহান প্রেমের সম্মোহনী বাণী দ্বারাও সমানভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি- করেছিলেন, এসব মহাপুরুষেরা তাদের যুগ চেতনায় ভিন্ন হলেও চিন্তা-চেতনা-বিশ্বাস ও লক্ষ্যে একই রকমের। যিশুখ্রিষ্টের আবির্ভাব প্রায় দু'হাজার বছর আগে হলেও শ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংসের আবির্ভাবের সময় ছিল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। সময়ের দুই ভিন্ন মেরুতে জন্মগ্রহণ করেও তাদের জীবনাচরণ, মন-মনন ও চিন্তায়, আধ্যাত্মিকতায়, পূর্ণতায়, ঐশী মহিমায় উভয়ে ছিলেন সমাসীন। দৈহিক অবয়বের দিক থেকে তারা দু'জন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব হলেও মূলত উভয়ে ছিলেন অভিন্ন মানবকল্যাণের মূলমন্ত্রে দীক্ষিত। যা

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগের ধর্মীয় প্রভাব ছাড়িয়ে নব-জাগরণের দ্বার উন্মোচিত করে। এই দুই মহাপুরুষ সম্পর্কে বলতে গিয়ে দেব বলেন–

> "এই রূপে— উপদেশে, কাজের ব্যবহারে সর্বত্রই এই দুই মহাপুরুষের ঐক্য দেখিতে পাইয়া তাহাদিগকে একইভাবের প্রচারক বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। বিভিন্ন শরীরধারী হইলেও মূলতঃ একইভাবের প্রচারক বলিয়া এ জগতে আবির্ভূত সকল মহাপুরুষকেই একই পর্যায়ের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া যাইতে পারে, বাহ্যিক ব্যবহারে পরস্পরের পার্থক্য থাকিলেও ইহারা সকলেই পার্থিব সুখ-সম্পদ ত্যাগ করিয়া মানবকে ত্যাগের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন ও মানবকল্যাণের জন্য প্রাণিপাত করিয়াছেন। মানব হৃদয়ের তমোরাশি দূরীকরণের জন্য স্বয়ং শ্রীভগবানই যেন ইহাদের ভিতর দিয়া যুগে যুগে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া থাকেন"[৫]।

গৌতম বুদ্ধকে দেব আকাশের মত উদার ও সাগরের মত গভীর হৃদয়ের অধিকারী বলে উল্লেখ করেছেন। এবং তিনি স্বীকার করেছেন যে, অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে তিনি সর্বদাই গৌতম বুদ্ধের উপর নির্ভর করেছেন। গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম ও দর্শনচিন্তা শুধু ভারতীয় উপমহাদেশেই নয়, বিশ্ব ইতিহাসে আজও তা মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তাঁর জীবনদর্শনের সারকথা হল, শৃঙ্খলিত ধারার এক উঁচুমানের আদর্শ নৈতিক জীবন যা ঐশী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত। এরকম উক্তির সত্যতা মেলে দেবের Religion of The Heart: Its Scientific And Ethical Basis শীর্ষক প্রবন্ধে। তিনি বলেন–

> "Without any preconceived metaphysics, he preaches on the house top a religion of the heart. His critical attitude is in fact a passport for the practice of this religion of the heart whose base is as wide as the human race, more precisely, all that has spark of life"[৬]

শ্রীরামকৃষ্ণ ও যিশুখ্রিষ্টের জীবনাদর্শ থেকে দেব ত্যাগের মহিমা তথা ভোগের আসক্তি বর্জন করে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মানবকল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করার এক মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। দেবের ধর্ম তথা জীবনাদর্শের প্রেরণা এসেছে বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, বিভিন্ন ধর্মে বিধৃত

Dhaka University Institutional Repository

মহাঐক্যের ধারণা থেকে। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তাঁর কথা আরও স্পষ্ট এবং তাঁরই সুরের অনুরণন। ইসলাম ধর্ম প্রসঙ্গে দেব বলেন, ইসলাম মানবতার ধর্ম, ইসলামে ধ্বনিত হয়েছে দ্বীন-দুনিয়া, ইহকাল-পরকাল পার্থিব-অপার্থিব জগতের মর্মবাণী। তিনি বলেন, ধর্ম আচরণ ও সংসার জীবন এ দু'য়ের সামঞ্জস্য বিধান হচ্ছে কোরানের শিক্ষা। দেব ইসলাম ধর্ম প্রসঙ্গে আরো বলেন–

> "Islam as a world-religion stands for a great synthesis. It is another name for the middle path between shunning the world straightaway and losing one's self in it. The life of the great Prophet Muhammad, exhibits this compromise in a very remarkable way"[৭].

মূলত মানবতাবাদী দার্শনিক গৌতম বুদ্ধের চিন্তাধারা আবর্তিত হয়েছে সাধারণ মানুষের দুঃখকে কেন্দ্র করেই। গৌতম বুদ্ধ তার দর্শনে এই দুঃখকে চিত্রিত করেছেন বিভিন্নভাবে। মানবজীবনের রূঢ় বাস্তবতা যে দুঃখ এবং এই দুঃখ থেকে পরিত্রাণের যে পথ বা মার্গ তিনি তাঁর সমগ্র প্রচেষ্টা দ্বারা লাভ করেছিলেন তা-ই তাঁকে বিশ্বসভ্যতায় অমরত্বের আসন করে দিয়েছে। জগৎ এবং জগতের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ এটাই ছিল তার সাধনার মূলকেন্দ্রবিন্দু। গোবিন্দ দেব তাঁর *Idealism and Progress* (১৯৫২) গ্রন্থের 'From Reality to Life' শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ে গৌতমবুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, "গৌতম বুদ্ধ তত্ত্ববিদ্যক ছিলেন না কিন্তু তত্ত্ববিদ্যা গঠনের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন এবং নীতিবিদ্যাকে তত্ত্ববিদ্যা থেকে পৃথক করে পরিপূর্ণরূপে নীতিবিদ্যার উপরই গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি মনে করেন, জীবনের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তত্ত্ববিদ্যার চেয়ে নীতিবিদ্যার প্রাসঙ্গিকতাই বেশি"[৮]।

গৌতম বুদ্ধকে দেব সনাতন এবং নতুনের মধ্যে সমন্বয় বিধানকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি (বুদ্ধ) যুক্তিবাদী এবং প্রয়োগবাদী নীতি গ্রহণ করেছিলেন। দেবের মতে, গৌতম বুদ্ধ তার পরিবেশ এবং যুগের অনন্য সৃষ্টি। তাঁর প্রচারিত মানবধর্ম এবং দর্শন তৎকালীন তথা সাম্প্রতিক সময়ের সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে রক্তপাতহীন এক বিপ্লবের সূচনা করেছে। যার মর্মবাণী সমগ্র বিশ্বে শান্তিপূর্ণভাবে আজও আন্দোলিত হচ্ছে। গৌতম বুদ্ধ সত্যিকার

Dhaka University Institutional Repository

অর্থেই একজন শান্তির বার্তা বাহক ছিলেন। দেবের Appeal to Common Man শীর্ষক প্রবন্ধে গৌতম বুদ্ধের সাথে জনৈক পেশাদার এক ব্রাহ্মণের কথোপকথনে বুদ্ধ বলেছেন: "Brahmin, I am a cultivator, you do not know. Instead of tilling the land like you, I till my mind to get self-control which grows a crop that gives eternal peace"[৯].

দেব মনে করেন, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম মানুষকে সত্যিকার অর্থে মুক্তি প্রদানে সক্ষম নয়। সীমিত এবং সসীম বুদ্ধির অধিকারী মানুষ তার অন্তরাত্মার স্বাভাবিক আহ্বান উপেক্ষা করতে পারেনি। আর সেজন্যই ঈশ্বরের বাণীকে মানুষ তার জীবনদর্শন রূপেই গ্রহণ করেছিল। শুধু বুদ্ধি বা যুক্তির অকাট্যতায় সেই সত্যকে লাভ করা যায় না। সত্য নির্ণয়ে প্রয়োজন হৃদয়ের গভীর অনুভব। আর সে হৃদয়ের প্রেরণা তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, ঈশ্বর অনন্ত কল্যাণের আধার। কাজেই তাঁর জগতে অশুভ বুদ্ধির কাছে শুভবুদ্ধি পরাভূত হতে পারে না। "যতো ধর্মস্ততো জয়—যেখানে ধর্ম বা সৎবুদ্ধি সেখানে জয় আর যেখানে অধর্ম বা অসৎ বুদ্ধি সেখানে পরাজয়"[১০]। দেব সারসত্তা ও বিশুদ্ধতার দিক থেকে ধর্মকে আনুষ্ঠানিকতার উর্ধ্বে রাখতে চেষ্টা করতেন। তাঁর মতে, ধর্মের অন্তর্নিহিত বাণী হচ্ছে বুদ্ধির অতিবর্তী এক পরম আধ্যাত্মিক চেতনার অভিজ্ঞতা। ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় আবেগের বিষয়টিকে তিনি উপেক্ষা না করে বলেছেন, এ ধরনের অভিজ্ঞতা পরিণতিতে সার্বিক সত্তায় পরিব্যাপ্ত করে। তিনি বলেন, "যদিও তা আবেগমূলক তবুও অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ, মানুষের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা, অনুভূতি প্রায়ই আবেগ দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হয়।"[১১]

দেব মনে করেন, সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্যই ধর্মকে তথাকথিত মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা হতে বের করে ধর্মের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে হবে। তবেই সার্বিকভাবে ধর্ম হয়ে উঠবে অর্থপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত, সমুন্নত হবে আধ্যাত্মিক ঐক্যের সুমহান চেতনা। দেবের মতে, তথাকথিত সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মের প্রভাব মুক্ত হয়ে অন্তর নিভৃতে মৌলিক ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত এবং তার যথাযথ অনুশীলনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ধর্মের ভবিষ্যৎ এবং সাধারণ মানুষের ভবিষ্যৎ।

দেব ধর্মের ভবিষ্যৎ রূপায়ণে হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস এসবকে এড়িয়ে চলে জীবনের চরিত্র মাধুর্যে পরিপূর্ণ 'স্ফুলিঙ্গের' উপস্থিতিকে অনিবার্য বলে মনে করেছেন। এবং তিনি একথাও বলেছেন, 'জীবন স্ফুলিঙ্গে'র অভাবে ধর্মীয় প্রচারনার অন্ধ অনুপ্রেরণা মানুষের আধ্যাত্মিক

Dhaka University Institutional Repository

ভবিষ্যৎকে করে তুলবে বিষন্ন ও বিপন্ন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হলো, "সাধারণ মানুষের সকল প্রকার উন্নতি ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আমাদেরকে সে মহাবিপদের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। মৌল ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করতে হবে, এর উপর বিশ্ব-শান্তিতে উৎসর্গীকৃত একটি সুসমঞ্জস সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে।"[১২]

তবে দেব একথাও মনে করেন, মানবসমাজের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে তার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ। জীবন জীবিকার এক চমৎকার সাযুজ্য রয়েছে অর্থনীতির সঙ্গে। তিনি একথা ভুলে যাননি। দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে প্রাচুর্য্যের যে অনটন তিনি বাল্য কৈশোরের সন্ধিক্ষণে দেখেছেন তা-ই তাঁকে চরম বস্তুবাদী করে তুলেছিল একথা যেমন সত্য, তেমনি এটিও অনুধাবণ করেছিলেন শুধুমাত্র জড়সত্তা বা বস্তু মানুষকে আধ্যাত্মিক বা আত্মিক মুক্তি এনে দিতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন 'ভাব'। অর্থাৎ বস্তু ও ভাব উভয়েরই সমন্বয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানানুসন্ধানী দেব লক্ষ্য করেছেন যে, প্লেটো থেকে শুরু করে চিরায়ত ভাববাদের প্রভাব ও বিকাশ আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের লক্ষ্যে যেমন একতরফা কিছু করতে পারে না অন্যদিকে মার্কসীয় বস্তুবাদে গণমানুষের মুক্তির বিষয়টির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অর্থনৈতিক বিষয়টি, যা বাস্তববাদেরই একক জয়গানে উদ্দীপিত। দেবের মতে, মার্কসীয় দর্শন তথা বস্তুবাদী দর্শনে অর্থনৈতিক মুক্তি মিললেও আধ্যাত্মিক মুক্তি কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাই তাঁর (দেবের) জোরালো সিদ্ধান্ত হল, মানুষের পার্থিব এবং অপার্থিব মুক্তির জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন উভয় সত্তার মধ্যে পরিপূর্ণ সম্মিলন। এখানে বিষয়টিকে দেব এভাবে ব্যক্ত করেন–

> "একদিকে আধুনিক উগ্র জড়বাদ আর অন্যদিকে অতি পুরনো অধ্যাত্মবাদ। প্রথমটি এক নিঃশ্বাসে অসংকোচে উড়িয়ে দেয় পরকাল আর ইহকালের সুখকেই মানুষের উন্নতির মাপকাঠি মনে করে। দ্বিতীয়টি তার ঠিক উল্টো। তার কাছে ইহকালের মূল্য অতি নগণ্য, পরকালই প্রধান, সে এক নিঃশ্বাসে মানুষকে বলে ইহকালের সব বেচাকেনা বন্ধ রেখে সব সময় পরকালের জন্য তৈরি থাক। অথচ প্রয়োজনের নিক্তিতে এ দুটির ওজনই সমান। প্রথমটির আশ্রয় নিলে সবকিছু আধ্যাত্মিককে বিসর্জন দিয়ে দুনিয়ার কামড়া-কামড়ি নিয়েই মানুষকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আর দ্বিতীয়টির আশ্রয় নিলে আধ্যাত্মিকতার নামে বহুলোক ইহলোকের সুখ-ভোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এই দুই পথের কোন পথেই মানুষের তৃষ্ণা

Dhaka University Institutional Repository

> মিটাতে পারে না। তাই, যাঁরা ভাবুক, তারা বেছে নেন মধ্যপথ ও এই মধ্যপথেই পান সত্যের সন্ধান। এই মধ্যপথই আমার জীবনদর্শনের মধ্যমণি।"[১৩]

দেব একথা অকপটে স্বীকার করেছেন যে, মধ্যপথের ধারণা নতুন কিছু নয়। সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও মধ্যপথের সন্ধান মেলে। কেননা মানুষের সকল কর্মকাণ্ড, জ্ঞানের বিস্তৃতি, অনুশীলন, চর্চা সবকিছুই সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে গতিপ্রাপ্ত হয়েছে। উপনিষদের ঐক্যের ধারণার প্রতি দেব ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। উপনিষদগুলি সম্পর্কে দেবের বক্তব্য হলো, এগুলির রচয়িতা স্বয়ং ঈশ্বর এবং বহুর মধ্যে অন্তঃস্থিত একত্বের নীতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত। একজন প্রখ্যাত ভাবীদর্শী যাজ্ঞ বাল্ক্য বলেন, "সর্ববস্তুর অন্তর্নিহিত একটি আত্মচৈতন্য শাশ্বত প্রেমের এক মহান সঞ্জীবনী-শক্তি। এটা জীবনের প্রধান বৈষম্যগুলির উর্ধ্বে চলে যায় এবং সকল অবস্থায় সবার জন্য প্রেমের অনন্ত নির্ঝরণী উন্মুক্ত রাখে।"[১৪] এরকম সমন্বয়ের উপলব্ধি ঘটলেই ছোট-বড়, সাধু-পাপী, গৃহবাসী-গৃহত্যাগী সবার পার্থক্য দূরীভূত হয়। উপনিষদের মূললক্ষ্য ছিল সমাজে সংঘটিত সংঘর্ষ-আতঙ্ক দূরীভূত করে এক আধ্যাত্মিক সমন্বয়ের পথে মানুষকে অনুপ্রাণিত করা। মূলত স্থান-কাল এবং যুগের গণ্ডি এর যাত্রা ব্যাহত করতে পারেনা। তাই উপনিষদের বাণী মানব অস্তিত্বের আজও নিত্য প্রেরণার উৎস। গৌতমবুদ্ধের নির্বাণের ধারণা যুগান্তকারী হিসেবে স্বীকৃত হলেও জনমনে এর আবেদন ছিল সীমিত। কিন্তু বুদ্ধের ঐক্য এবং মৈত্রীর বাণী সমগ্র বিশ্বে মানবজাতির জন্য নব প্রেরণার সঞ্জীবনী শক্তিরূপেই পরিগণিত হয়। যিশু আবির্ভূত হলেন, ঈশ্বরের অসীম দয়া ও ক্ষমতার বিশ্বাস নিয়ে। যিনি মানুষের পাপ মার্জনার জন্য উচ্চমার্গের ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা দান করেছিলেন। এক্ষেত্রে আত্মিক ঐশ্বর্যমণ্ডিত ঐশ্বরিক চেতনার গুরুত্বকে রোমান্টিকতার উচ্ছ্বসিত প্রকাশের ছদ্মাবরণে আবৃত করা হয় বলে দেব মনে করেন।

"আত্মা বাস্তবিক সবল, কিন্তু দেহ দুর্বল" এই মানবিক বাণীকে ধারণ করে যিশু দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে বললেন, স্বর্গ এবং মর্ত্যের মধ্যে সকল ব্যবধান ঘুচিয়ে উভয় রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। এই সমন্বয় সাধনের পথ ধরে একেশ্বরবাদ এবং তার অনুলিপি সৃষ্টির ঐক্য দর্শনের উপর নির্ভরশীল একটি সুষম সমাজ গড়ে তোলার দাবি নিয়ে ইসলামে শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবসান তথা নারীর যথাযথ মর্যাদা ও অধিকার প্রদান এবং ক্রীতদাসের ধর্মীয় সমতা স্বীকার করা হয়। ভগবতগীতার 'স্বর্গীয় গীতি'কে

Dhaka University Institutional Repository

দেব একটি আদর্শ পরিপূর্ণ সমাজব্যবস্থার ভিত রূপে চিত্রিত করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি মানবসমাজের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সুসমন্বিত করতে চেয়েছেন উচ্চ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের চরম উৎকর্ষকে। এরূপ সমাজব্যবস্থা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অধিকার নিশ্চিত করে মানুষকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং প্রগতির পথে ধাবিত করতে সহায়তা করবে। দেবের লক্ষ্য ছিল, সকল ধর্মের পুরনো জাগতিক ঐক্যকে সমন্বিত করে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ন্যায়পর সমাজ গঠনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করা। অর্থাৎ, সমন্বয়ের চূড়ান্ত এবং মূল উদ্দেশ্যই ছিল সাধারণ মানুষের কল্যাণ কামনা। এ প্রসঙ্গে দেব গৌতম বুদ্ধকে প্রাচীন ভারতের মহান দান উল্লেখ করে বলেন,

> "Equalization of spiritual rights of man and woman, of all and sundry, is the great gift of Buddha in Ancient India. He contributed not to a small extent to the growth of later liberal Hinduism."[১৫]

গৌতম বুদ্ধ যেমন সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষায় রক্তপাতহীন বিপ্লবের সূচনা করে গেছেন দেবও তেমনি সমগ্র বিশ্বে ঐক্য এবং সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন এসব সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন। বুদ্ধের বাণী হচ্ছে সর্বজনীন প্রেম ও করুণার বাণী, অহিংসা ও মৈত্রীর বাণী। গৌতম বুদ্ধের একজন যথার্থ অনুসারী হিসেবে দেবও মনে করেন, ধর্মকে সফল এবং ফলদায়ক হতে হলে আধ্যাত্মিক ঐক্যের সচেতনতা এবং সর্বজনীন প্রেমের চেতনার উৎকর্ষ বিধান করতে হবে। দেব ধর্মকে 'মানবকল্যাণের প্রেরণা' হিসেবে এবং মানুষের ভেতরে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপনকেই ধর্মের মূল উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন–

> "ধর্মের সারবস্তুর প্রতি যতোই আমরা মনঃসংযোগ করি, তার অন্তরালবর্তী সর্বজনীনতা ততোই আমাদের দৃষ্টির সামনে স্পষ্টতর হয়ে ফুটে উঠবে, এবং ধর্মের অবয়বগত বিভিন্নতা বিলীন হয়ে যাবে অথবা হয়ে পড়বে তাৎপর্যহীন। একেবারে কম করে ধরলেও বলা যায়, তখন সে আর ঐক্য, মৈত্রী সমঝোতাও সুসংহত শ্রীবৃদ্ধির পথে অন্তরায় হয়ে থাকবে না।"[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

এই ঐক্য, এই প্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মধ্যেই তিনি ধর্মের ভবিষ্যৎ ভূমিকা চিত্রিত করতে চেয়েছেন। ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিকতাকে তিনি বড়ো বেশি আমলে না নিয়ে বরং মনে করতেন ধর্ম তথাকথিত প্রাতিষ্ঠানিকতা থেকে মুক্তি পেলে সাধারণ মানুষের সম্ভাবনার দ্বার প্রসারিত হয়ে যাবে। তিনি এও মনে করেন যে, ধর্ম অসংখ্য শুভ প্রেরণার উৎস হিসেবে 'সর্বজনীন' এবং 'অধিব্যক্তিক'। আর এ কারণেই কল্যাণমূলক বিশ্বসমাজ গঠনে এরূপ ধর্মীয় ব্যবস্থার অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে।

ধর্মের অন্তরালে অধর্মের চর্চাকে দেব গণমানুষের জন্য এক ভয়ংকর ক্ষতিকর দিক বলে চিহ্নিত করেছেন। ধর্মের যথাযথ মূল্যায়ন, অনুভব, উপলব্ধিতেই মানুষের সার্বিক কল্যাণ তথা প্রগতির চরম উৎকর্ষ নিহিত। ধর্মে আচরিত প্রেমের পথই সর্বাঙ্গীন মুক্তির পথ। এ প্রসঙ্গে ড. আমিনুল ইসলাম বলেন, "ধর্মে অনুসৃত প্রেম ও ঐক্যের অবলম্বনেই তিনি (দেব) অনুপ্রাণিত ও সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন মানবজীবনকে। এই প্রেমের পথ বেয়েই তিনি অতিক্রম করতে পেরেছিলেন হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রীস্টান প্রভৃতি বিশেষ ধর্মের সংকীর্ণতাকে।"[১৭] দেবের অসামান্য পাণ্ডিত্য ও গভীর জ্ঞানীয় দৃষ্টিভঙ্গি দর্শনের বিভিন্ন শাখায় তার অবাধ বিচরণকে গতিময়তা দান করেছিল। তিনি লক্ষ্য করেছেন, ভাববাদ তার পুরনো ঐতিহ্য নিয়ে টিকে থাকতে পারে না। সমগ্র পৃথিবীতে ভাববাদ নানাভাবে নিগৃহীত হচ্ছে। আধুনিককালের জড়বাদ, অস্তিত্ববাদ, প্রয়োজনবাদ, বিশ্লেষণী দর্শন ও যৌক্তিক দৃষ্টবাদ ভাববাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার । দেব নিজেও বেদান্ত ভিত্তিক ভারতীয় ভাববাদ এবং প্লেটো এরিস্টটল থেকে হেগেল পর্যন্ত প্রবাহিত পাশ্চাত্য ভাববাদের বিরোধিতাও তিনি করেছেন। সমালোচনার প্রচলিত ধারায়ও দেব ভাববাদের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু দেবের সমালোচনার ধারায় শুধু নেতিবাচকই নয়, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিও পরিলক্ষিত হয়। দেব অত্যন্ত গভীরভাবে লক্ষ্য করেছেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী উগ্র অধ্যাত্মবাদ সাধারণ মানুষকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করেছে, নস্যাৎ করেছে মানুষের আশা আকঙ্ক্ষাকে। উগ্র জড়বাদও মানুষকে ঠেলে দিয়েছে ধ্বংসের মুখে।[১৮] একথা সত্য যে, জড়বাদে মানুষের স্বাভাবিক জীবনধারা প্রসারিত কিন্তু মানুষের কাঙ্ক্ষিত স্থায়ীকল্যাণ তাতে নিহিত নেই। এককভাবে মানবকল্যাণ অধ্যাত্মবাদেও নেই, বস্তুবাদেও নেই। তবে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছে জড়বাদের হাত ধরেই, একথা অস্বীকার করার কোনো উপায়

Dhaka University Institutional Repository

নেই। বর্তমান পৃথিবীতে যে কর্মচাঞ্চল্য, সরব জীবনের উপস্থিতি তা জড়বাদেরই দান। কিন্তু জড়বাদের শক্তি নিষ্ক্রিয় প্রতীয়মান হয় যদি না এতে প্রেমের ছোঁয়াচ থাকে। আর এই প্রেম প্রতিষ্ঠিত হবে জড়বাদ ও আধ্যাত্মবাদের সমন্বয়ে। দেবের মতে, বিজ্ঞানের দেয়া শক্তি আর আধ্যাত্মানুভূতির ভেতর ধর্ম উৎসারিত যে প্রেম এই উভয়শক্তির মিলনে তৈরি হবে সমঝোতা, যার নাম তিনি দিয়েছেন 'সমন্বয়ী ভাববাদ'। দেবের কাছে জড়বাদ এবং আধ্যাত্মবাদ সমান গুরুত্বপূর্ণ এদের মধ্যে কথিত দ্বন্দ্ব মিথ্যে-অলীক। কেননা, তাঁর বাল্য-কৈশোরের যে বিপরীতমুখী অভিজ্ঞতা তারই সফল অভিব্যক্তি ঘটেছে দুই পরস্পর বিরোধী মতবাদের সমন্বয়ের মাধ্যমে। এ জন্য তিনি বলেন, "অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদ উভয়ই আমার জীবনদর্শনের এক অপরিহার্য অবদান। জীবনের যে দ্বন্দ্ব আমাকে এই জীবন দর্শনের দিকে টেনে নিয়েছে, বাইরের বৃহত্তর জগতেও যেন আজ তার সার্থকতা দেখতে পাচ্ছি।"[১৯]

'বস্তু' ও 'ভাবের' সমন্বয় বিধানের প্রত্যয়টি দেবের বাস্তবজীবনেরই প্রতিলিপি। তবে এ প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেব বিবেকানন্দ এবং বুদ্ধের ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাই সমাজের ধনী-দরিদ্র, উচুঁ-নিচু, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে মহান সমন্বয়ের মধ্যে দিয়েই সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার প্রয়াসই ছিল তার চিন্তা-কর্ম ও দর্শনে। বিবেকানন্দ সহজাত বৃত্তি, বুদ্ধি ও পরমচৈতন্যকে মানবমনের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, উক্ত তিনটি স্তর পরস্পরের সঙ্গে বিরোধে না জড়িয়ে বরং বুদ্ধির পূর্ণতা দান করে। এ প্রসঙ্গে দেব বলেন, "বিবেকানন্দের এই অভিমত তার দর্শনের মূলভিত্তি রচনা করেছে ... কারণ, এ বক্তব্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাঁর অধিবিদ্যা ও জ্ঞানবিদ্যার সারমর্ম।"[২০] দেব বহুর ভেতরেই খুঁজে ফিরেছেন দেশ, জাতি, সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ঐক্যের মৌলিক-নীতি। আর এই ঐক্যের ভিত্তিতেই তিনি সাধারণ মানুষের কল্যাণ, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ এবং সম্প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এক মহারাষ্ট্রের সন্ধান করেছেন। সৃষ্টির মৌলিক একত্বতত্ত্বের ভেতরেই দেব সন্ধান করেছেন পরমচৈতন্যময় অপরিবর্তনীয় এক শাশ্বতসত্তাকে।

> "জগতের অসংখ্য বিচিত্র সত্তার মাঝে একক পরমসত্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করাই সর্বোত্তম ধর্ম ও আদর্শ। এ অদ্বৈত দর্শনের তত্ত্ব যখন ব্যাপ্ত ও প্রসারিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' তখনই রূপলাভ করে ব্যবহারিক জীবনধর্মে। সে কারণেই বিবেকানন্দ

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'।"[২১]

এখানে লক্ষণীয় বিষয়টি হলো, দেব যেক্ষেত্রে শুধু ব্যক্তি মানুষ তথা মানবজাতির নিরঙ্কুশ কল্যাণ কামনা করেছেন সেক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের মূল উপজীব্য বিষয় ছিল সমগ্র জীবের কল্যাণ এবং মুক্তি কামনা। দেবের দর্শনের স্বাতন্ত্র্য এখানেই। দেব স্বামী বিবেকানন্দের মতবাদের মধ্যে মানুষের এবং সমগ্র সৃষ্টির 'স্বর্গীয় সম্ভাব্যতাকে' খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই তো তিনি বলেন, "Never for a moment forget the glory of human nature. We are the greatest God that ever was or ever will be. Christs and Buddhas are but waves on the boundless ocean which I am."[২২] দেবের সমন্বয়ের মূললক্ষ্য ছিল তিনটি– 'একবিশ্ব' 'সাধারণ মানুষ' এবং 'সমন্বয়'। বিশ্বব্যাপী সাধারণ গণমানুষের ব্যধিগ্রস্ত ইতিহাসে যে মহাসংকট চলছে এই ক্রান্তিকাল উত্তরণের লক্ষ্যে দেবের সমন্বয়ের সুর অনুরণিত হবে চিরকাল। দেব বলেন, এই 'সমন্বয় দর্শনই' মানুষের সার্বিক কল্যাণে অপরিহার্য ও কার্যকর ভূমিকা পালনে সহায়তা করবে। এজন্য দেব উন্মুক্ত এবং প্রসারিত চিত্তে সমন্বয়কে গ্রহণ করার অভিব্যক্তিও প্রকাশ করেছেন। দেবের ভাবনা, এভাবেই সমগ্র বিশ্বের প্রগতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতরূপেই প্রতিষ্ঠা পাবে। দেবের চিন্তা-চেতনা, নীতি-আদর্শ সবকিছুই আবর্তিত হয়েছে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে। এসব আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণের নিয়ামক হিসেবে তিনি অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন মানবভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে। দেব পার্থিব এবং অপার্থিব জগতের মধ্যে এক সুখী সম্মিলন ঘটাতে চেয়েছিলেন তাঁর সমন্বয়ী ভাব দ্বারা। দেবের জীবনসাধনার লক্ষ্য ছিল, জড়বাদ এবং আধ্যাত্মবাদের মহামিলনে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখা। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সমন্বয়ের প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ধর্মের মহান ঐক্যের ধারণা থেকে।

দেব ছিলেন একজন মানবতাবাদী দার্শনিক। তাঁর আচরিত মানবতাবাদ কালোত্তীর্ণ। একথা আজ চরমভাবে সত্য যে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অপব্যবহার, ধর্মের অপ-প্রয়োগ সমাজজীবনকে আজ

Dhaka University Institutional Repository

নানাভাবে বিভক্ত করে তুলেছে। বিশ্বসমাজ বহুধা বিভক্ত হয়ে ক্রমেই বিপর্যস্ত ও সংঘাতময় পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

> "বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঠিক ও সুষ্ঠু ব্যবহার ও প্রয়োগ এবং একটি সামগ্রিক শাশ্বত ধর্মীয় চেতনা দ্বারা জীবন পরিচালন এবং এক বিশ্বপ্রেমময় একাত্মানুভূতিমূলক ব্যবহারিক দার্শনিক আলোচনা দ্বারা এই ধ্বংসমুখী বহুধাবিভক্ত বিশ্বব্যবস্থা থেকে 'একজগৎ' গড়ে তোলা সম্ভব বলে দেব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। এই জগৎ হবে শোষণবর্জিত, বঞ্চনাহীন ও নির্যাতনহীন– এই একজগৎ হবে বিশ্বমানবের মুক্তি এবং আগামী দিনের সভ্যতার ধারক ও বাহক। এই অনুভূতি ও অনুধ্যানমূলক ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে দেবের "দর্শন ও একজগৎ" প্রবন্ধে।"[২৩]

দেব 'একজগৎ' গড়ার আকাঙ্ক্ষায় পৃথিবীর সব ধর্মের মূল মর্মবাণী যে একই রকম সে কথা তিনি বহুবার বলেছেন। সব ধর্মের উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি তিনি ছিলেন সমানভাবে শ্রদ্ধাশীল। আর এই উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ভেতরই মানুষের ঐহিক-পারলৌকিক কল্যাণ ও মুক্তির বিষয়টি নিশ্চিতভাবেই প্রোথিত রয়েছে বলে দেব বিশ্বাস করতেন। তিনি বলেন, ধর্মের ফলপ্রসূতা নির্ণীত হয় গতিশীল জীবনের প্রবহমান ধারায় এবং উন্নত ও সমৃদ্ধ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে। বর্তমানে বিজ্ঞানের বিজয়-বৈজয়ন্তীর যুগে ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নই পারে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধ তথা মানবতাবোধ জাগ্রত করতে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার বেশির ভাগই ছিল ধর্মযুদ্ধ। ধর্ম নিয়ে হানাহানি, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ আজও বিশ্বে অশান্তি-অনাসৃষ্টির মূলকারণ। কিন্তু দেব এসব প্রতিকুল আবহে জন্মগ্রহণ করেও ছিলেন একজন সহজ-স্বাভাবিক সর্বজনীন মানবধর্মে উজ্জীবিত এক মহৎপ্রাণ মানুষ। যে ধর্ম সবার জন্য উন্মুক্ত সবার জন্য প্রসারিত। সার্থক পরিপূর্ণ এক জীবন ধর্মের ছবি একেঁছিলেন তিনি তার দর্শনে এবং বাস্তব জীবনাচরণে। সে জীবন কোনো দ্বন্দ্বে লিপ্ত নয়, প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ নয়। ধর্ম বৈষম্যহীন এই জ্ঞানসাধকের দার্শনিক ভিত্তিভূমি ছিল বিজ্ঞান-ধর্ম-দর্শনের সঠিক মূল্যায়নের এক সাবলীল প্রকাশ। সনাতন ধর্মে জন্মগ্রহণ করেও এই মহামানব সকল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে এক উজ্জ্বল আদর্শের মূর্ত প্রতীকরূপে আজও স্মরণীয় বরণীয় হয়ে আছেন সকলের হৃদয়-মনে।

Dhaka University Institutional Repository

২.২ বিজ্ঞান

দেবের দর্শন মূলত স্বাভাবিক জীবনধর্মে অনুপ্রাণিত এক জীবনদর্শন। জীবনের বাস্তবতার তাগিদে এ দর্শনের জন্ম। চলমান জীবনের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, হতাশা-ব্যর্থতার যে চিত্র তার মানসপটে অঙ্কিত হয়েছিল সে সবের পরিপূর্ণ ও কল্যাণকামী এক জীবনের ছবি তিনি একেঁছিলেন তার সমন্বয় দর্শনে। তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দর্শন থেকে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণকে আরও সুদৃঢ় করার জন্য বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করেছেন অত্যন্ত সুনিপুণভাবে। তবে দেবের দর্শন শুধুমাত্র তাত্ত্বিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকেনি, এর বিস্তার ঘটেছিলো ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও। ব্যবহারিক জীবনকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে তিনি দৃষ্টি দিয়েছিলেন ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, দর্শন, মানবতাসহ আরো নানাবিধ বিষয়াদির উপর। এসব নিত্য নতুন বিষয়াদির চুলচেরা বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের পথ বের করা দেবের কাছে হয়ে উঠেছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি চেয়েছিলেন নতুন এক জীবনদর্শন গড়ে তুলতে। যার লক্ষ্য হবে মানবপ্রেম, কল্যাণস্পৃহায় উদ্দীপিত এক অর্থবহ জীবনধারা।

দেবের সমন্বয়ের প্রচেষ্টা ব্যাপ্তি লাভ করেছিলো মূলত বৈপরীত্যের বিষয়গুলির মাঝে। এজন্যই লক্ষ্য করা যায়, তিনি সমন্বয়সাধন করেছেন-শক্তির সঙ্গে প্রেমের, বিশ্বাসের সঙ্গে সংশয়ের, নিরপেক্ষ যুক্তির সাথে প্রয়োগের, বিজ্ঞান ও দর্শনের সাথে চিরায়ত ধর্মের এবং সবশেষে সমন্বয় সাধন করেছেন আধ্যাত্মবাদের সঙ্গে জড়বাদের । জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনেই দেব তাঁর সমন্বয়-দর্শন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

দেবের দ্বিতীয় বই *Idealism: A New Defence And a New Application* গ্রন্থটিও ভাববাদ সম্পর্কিত । এখানে তাঁর বক্তব্য হলো পুরনো ভাববাদের সংস্কারের মধ্যে দিয়ে নতুন ভাববাদের প্রবর্তন। এছাড়াও রয়েছে মানুষের চিন্তাধারার মধ্যে যে বিরোধ ও বৈপরীত্য, যুক্তি ও বিশ্বাসের যে দ্বন্দ্ব তা সমগ্র মানবতার জন্য ক্ষতিকর এবং অকল্যাণকর। মানবজাতি আজ চরম ধ্বংসের সম্মুখীন। বিশ্বমানবতা চরমভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছে এই ধ্বংসনোন্মুখ পৃথিবীতে। উল্লিখিত গ্রন্থে রয়েছে দেবের এসব সমস্যা ও সংকট থেকে উত্তরণের পথ।

Dhaka University Institutional Repository

'একবিশ্ব' 'সাধারণ মানুষ' এবং 'সমন্বয়' এসবই হচ্ছে উক্ত গ্রন্থের মর্মকথা। তবে তা মানবতাবাদী আদর্শের এক চমৎকার সম্মিলন। দেব দর্শনের নিরস আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়ে ক্রমে ক্রমে তিনি তাঁর আলোচনায় প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অর্ন্তভুক্ত করেছিলেন বিজ্ঞান, রাজনীতি, সরকার, রাষ্ট্র, নৈতিকতা, প্রযুক্তিবিদ্যা আধুনিক মারণাস্ত্রসহ বিভিন্ন রকম যন্ত্রদানব। মূর্তমান মানুষই তাঁর চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। যে মানুষ সুখে হাসে, দুঃখে কাঁদে, অপরের ব্যথায় সহমর্মীতাবোধ করে। এই মানুষের চেয়ে বড়ো সত্য বড়ো স্পষ্ট বিষয় আর কিছুই ছিলো না তাঁর কাছে। বর্তমান বিশ্বের ভয়াল থাবা দেবকে অত্যন্ত ব্যথিত করে তুলেছিলো। বিজ্ঞান-নির্ভর পৃথিবীতে বিজ্ঞানের অপ-প্রয়োগে তাঁর সমস্ত হৃদয়-মন ছিলো ভারাক্রান্ত। দেব মোটেও বিজ্ঞান বিরোধী ছিলেন না। তাই তিনি বলেন, "নিজের অজ্ঞাতেই যেন বিজ্ঞান আজ জড়বাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চাইছে। আর অধ্যাত্মবাদ তারই পাশে দাঁড়িয়ে আবছায়ার মধ্যে উঁকি দিচ্ছে।"[২৪] দেব থিয়োরি সর্বস্ব বিজ্ঞানের বদলে সাধারণ মানুষের অনুভূতি প্রয়োজনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন সবচেয়ে আগে। তিনি মনে করতেন, উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির উপর জোর দিতে গিয়ে যেন সাধারণ মানুষকে কখনোই অবাঞ্ছিত ঘোষণা না করা হয়। কেননা, সাধারণ মানুষের অনুভূতির সাথেই সম্পৃক্ত রয়েছে তাদের প্রয়োজনের দিকটিও । প্রয়োজনবর্জিত জীবন, জীবন থেকে বহুদূর । দেব বিজ্ঞানের তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তাকে অপরিহার্য মনে করেছেন, শুধু তাই নয়, মানবসভ্যতাকে বৈজ্ঞানিক বলার সাথে সাথে মানুষের মনোবৃত্তিও যে বিজ্ঞান নির্ভর হয়ে পড়েছে একথা তিনি স্বীকার করেছেন অবলীলায়। অতএব, আজকের দিনের দর্শন তথা দার্শনিকের কাজ হবে বিজ্ঞান-নির্ভর অনুভূতিসম্পন্ন একত্ব প্রতীতির লক্ষ্যে জীবনদর্শন গড়ে তোলা যা হবে অনাবিল বিশ্বপ্রেমের-অফুরন্ত উৎস। এই বিশ্বপ্রেমই বৃহত্তর কর্মময় জীবনে আনতে পারে সমঝোতা, শান্তি ও শৃঙ্খলা। তাই, আগামী প্রজন্মের সমন্বয়-দর্শনের উৎস হলো ধর্ম-বিজ্ঞান, দর্শন-ধর্ম, বিজ্ঞান-দর্শন, একাত্মানুভূতিসম্পন্ন বিশ্বাস ও বিষয়কেন্দ্রিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসহ বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মবাদের সংযোগ ও সমন্বয়বিধান।

বিজ্ঞান-নির্ভর অনাগত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দেব স্পষ্ট ধারণা ব্যক্ত করেন এভাবে, "বিজ্ঞানের অফুরন্ত শক্তির সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের এই অফুরন্ত প্রেমের সামঞ্জস্য ও সংযোগ স্থাপনের উপরই মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। তা থেকেই উৎপন্ন হবে সে কালচার, ফ্রয়েডের মতে যা মানুষের মারণী-প্রবৃত্তিকে দাবিয়ে রাখতে পারে!"[২৫]

পৃথিবীর সকল ধর্মের মূলমর্মকথা প্রেম। এই প্রেমের উৎপত্তিস্থল হৃদয়গভীর থেকে। দেব এই অনুভূতিরই সন্ধান করেছিলেন সব মানুষের মধ্যে। বিশ্বপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবার যে মূলমন্ত্রে তিনি দীক্ষিত ছিলেন তার উৎস হলো হৃদয়ের গভীর আকুতি। প্রেমে উদ্ভাসিত অন্তঃকরণ সর্বদাই বিশ্বমানবের কল্যাণ কামনায় ব্যাকুল হয়ে উঠত। দেব সমস্যাসঙ্কুল পৃথিবীতে প্রেমের আবহ তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন সকলকে। সব রকমের সংকীর্ণতা পরিহার করে বিশ্বময় সম্প্রীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রেমের বন্ধনকেই তিনি শ্রেষ্ঠ বন্ধন বলে মনে করেন। বিজ্ঞানের জয়-জয়কার আজ সর্বত্র বিরাজিত। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে কোথায় নেই বিজ্ঞানের ছোঁয়া। দেব মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন বিজ্ঞানের অপব্যবহারের দায় বিজ্ঞানকে দেয়া যাবে না কোনোভাবেই। এছাড়াও, বিজ্ঞানের সাফল্যের যে ধারা মানবকল্যাণে নিয়োজিত তাকে গ্রহণ করার জন্য ইতিবাচক মানসিকতা তৈরির প্রতি দেব জোর দিয়েছেন বারবার। বিজ্ঞান তার যাত্রাপথে যেভাবে অবিরাম গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে তা ভেবে তিনি শঙ্কিতও ছিলেন। তাই তো তিনি বলেন, "আজ আবার সম্ভবত মানুষ সেই হৃদয়ের বাণীর দিকেই ঝুঁকে পড়েছে। কারণ, আজকের দিনের বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি সবই মানুষের জীবনকে জটিলই করে তুলেছে।"[২৬]

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের আশীর্বাদপুষ্ট মানুষ এতোসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করেও অশান্তির দাবানল থেকে তার মুক্তি মিলছে না। মানুষ তার প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির সীমারেখা নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। বিজ্ঞানের অনস্বীকার্যতা সম্পর্কে দেব বলেন, বিজ্ঞানের শক্তির অপরিহার্যতা মানবজীবনের জন্য অফুরন্ত শুভ প্রেরণা এবং আশীর্বাদ স্বরূপ, বিজ্ঞানের এই মহাযাত্রা কেবল দূরত্বকেই জয় করেনি বরং ভূ-মণ্ডল অতিক্রম করে সৌরমণ্ডলেও অবাধে বিচরণ করার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। জীবনযাত্রাকে করেছে সহজ সাবলীল। বিজ্ঞানের মহিমা সমগ্র বিশ্বময় মানুষকে সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকারও নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। বিজ্ঞানের সফলতা বিশ্বব্যাপী নবজাগরণ ঘটিয়েছে। মানুষ নতুন করে বাঁচার স্বপ্নে বিভোর। কিন্তু, বিজ্ঞানের ধ্বংসপ্রবণতাকে বশীভূত করার মতো মানসিক সংযম মানুষের নেই, এজন্যই বিশ্বময় এত অশান্তি, সংঘর্ষ, সন্দেহ ও পারস্পরিক অবিশ্বাস। দেব বলেন–

Dhaka University Institutional Repository

"এখানে তার অবস্থা অনেকটা মহাভারতের দুর্যোধনেরই মতো। দুর্যোধন অনেক দুঃখ করে বলেছিলেন :

'জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্য ধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ' ॥

অর্থাৎ, 'ধর্ম কি আমি জানি, তবু ধর্মে আমার মন নেই, অধর্ম কি তা-ও আমি জানি, তবু তা হতে আমার নিবৃত্তি নেই'। এজন্যেই মনে হয় অধ্যাত্মবাদী দর্শনের মূলে মানুষের যে ঐক্যের তত্ত্ব নিহিত, যার মূলকথা বিশ্বপ্রেম, তাতে মানুষের বিশ্বাস আবার জাগিয়ে তুলতে হবে।"[২৭]

দেব মনে করেন, লৌকিক বিজ্ঞানের দ্বারা মানুষের পরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্তার বিকাশ লাভ হয় না। এতে মানুষ তার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে। ঐক্যের বদলে তৈরি হচ্ছে বিভেদ, সংঘাত। মানুষ পরিণত হচ্ছে গাছ-গাছড়ায়। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য আরো স্পষ্ট-তিনি মনে করেন, বিভেদের এই প্রক্রিয়া অবিরামগতিতে চলতে থাকলে এ বিশ্ব এক প্রকাণ্ড 'ব্যাবেলের টাওয়ার'এ রূপান্তরিত হবে। দেব ঐক্যের এ ধারণাকে সমুন্নত ও অক্ষুন্ন রাখতে ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের যোগাযোগকে অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করেছেন। দেব আশা প্রকাশ করেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষার পাশাপাশি মানুষকে হৃদয়ের শিক্ষা দিয়ে তার ভেতর প্রেমের প্রেরণাও জাগাতে হবে। দেব ধর্মে প্রচারিত 'ঐক্যের বার্তাকে' সবচেয়ে মূল্যবান তথ্য বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন, আধ্যাত্মিক ঐক্য ও তার অপরিহার্য ফল প্রেমের সাধনাই মানুষকে নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এর ফলে, বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রেরণা মানুষকে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ধ্বংসের পথে না নিয়ে সমাজ-সংহতির দিকে নিয়ে যাবে। মানুষের মধ্যে জাগ্রত হবে পারস্পরিক সমঝোতা ও প্রেম।

দেবের মতে, বৈজ্ঞানিক এবং একই সাথে নৈতিক দর্শনের রূপরেখা প্রদান করেছেন মহামতি গৌতম বুদ্ধ। গৌতম বুদ্ধ তাঁর দর্শনে একদিকে যুক্তিবাদী এবং অন্যদিকে প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়সাধন করেছেন। ফলশ্রুতিতে, তাঁর দর্শনে অন্ধ বিশ্বাসের চেয়ে একদিকে বৈজ্ঞানিক ধর্ম অন্যদিকে বিজ্ঞানভিত্তিক নৈতিক দর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে দেব তাঁর *Buddha: The Humanist* গ্রন্থে বলেন–

"Buddha tried to give this appeal to heart and empirical as well as an ethical basis. He had a scientific temper and he was not only

Dhaka University Institutional Repository

opposed to blind faith but highly critical of it. As an advocate of religion, he was not a theorist but an experimentalist and also an experientialist. We have the right to believe what we feel and not what we are asked to. Religious discipline is valid just like a scientific hypothesis and a scientific experiment provided it produces the desired effect. In this respect Buddha's religion is a science-religion and is indeed a rare phenomenon in the history of faith".[২৮]

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতমবুদ্ধের জন্ম হলেও বৌদ্ধ ধর্ম আসলে একটি আধুনিক ধর্ম, বৈজ্ঞানিক ধর্ম, এবং যুক্তির ধর্ম। পাশ্চাত্যে যে বিজ্ঞানচর্চা শুরু হয়েছিলো, তা ধীরে ধীরে সূর্যের কিরণের মতোই চারদিকে তার বর্ণিল বর্ণ ছড়িয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সহজ-সরল-সাধারণ মানুষগুলো তাদের চিন্তা-চেতনা-ধারণা ও বিশ্বাসে পরিবর্তন সূচিত করার সুযোগ তৈরি করে। শেষ পর্যন্ত মানুষ স্বাধীনচিন্তার উপর নির্ভর করে বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে অব্যাহত রাখে। আর সেই স্বাধীনচিন্তার পথ ধরেই বৌদ্ধ দর্শনের অনুসারীগণ 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' (Pratityasamutpada) মতবাদকেই সত্য বলে গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ ধর্মও মনে করে যে, "মানুষ, সমাজ এবং জগতের সবকিছুই পরিবর্তনশীল এবং কার্যকারণ নিয়মানুসারে বিবর্তিত হয়। বিজ্ঞানীরা বিশ্বজগতের যে জড়বাদী (Materialistic) ব্যাখ্যা দেন, তাদের ব্যাখ্যার মূলে রয়েছে জড়ের আদি উপাদান হিসেবে পরমাণু (atom)."[২৯] এ প্রসঙ্গে দেব তাঁর *Buddha: The Humanist* গ্রন্থে Religion of The Heart: Its Scientific and Ethical Basis শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, "Science shows, and as rational beings we also find, what Buddha said ages before, that things around are all transitory, evanescent and what we call a thing is really a creature of imagination. There is nothing stable inside and outside."[৩০] গৌতম বুদ্ধ এবং দেব দুজনই ছিলেন বাস্তবসম্মত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অধিকারী এক অসাধারণ ব্যক্তিসত্তার নিয়ামক। দেবের দর্শনের দিকে লক্ষ্য করলে যে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয় তা হলো, তিনি প্রাচ্য প্রতীচ্য তথা বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, বাইবেল, এমনকি পবিত্র কোরান থেকেও তাঁর দর্শনের উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। বিনা বিশ্লেষণে দেব কোনো

Dhaka University Institutional Repository

মতবাদকেই গ্রহণ বা বর্জন করেননি। এদিকটি নিঃসন্দেহে দেবের বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় বহন করে। তদ্রুপ গৌতম বুদ্ধের দর্শনেও পরীক্ষণ পর্যবেক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত জোরালোভাবে পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধধর্মে "এহিপস্মিকো" (ehipassiko) বলে একটি কথা আছে যার অর্থ হল 'আস এবং পরীক্ষা করে দেখ' (come and see)। যদিও বৌদ্ধধর্মে প্রচারিত মতবাদসমূহ সঠিক মাত্রার পর্যবেক্ষণ পরীক্ষণ নির্ভর তথাপি একথা বলা যাবেনা যে, বিজ্ঞান আবিষ্কৃত সিদ্ধান্ত সমূহের সঙ্গে এ মতের নিকট সাদৃশ্য রয়েছে। তবে নির্বিচার বিশ্বাস থেকে বৌদ্ধমত অনেক দূরে সরে গিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সমর্থন প্রদর্শনপূর্বক যে মহান বাণীর প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন তার মূল্য অধিক এবং অনস্বীকার্য। প্রকৃতির ঐক্যে এবং সামঞ্জস্যে বিশ্বাসী দেব বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এবং অলিভার লজের বিজ্ঞানমনস্কতার আড়ালে সূক্ষ্ম ধর্মীয় বা অধ্যাত্মানুভূতির প্রকাশকে অত্যন্ত সুকৌশলে বের করে এনেছেন। তিনি আনন্দিত এই ভেবে যে, আইনস্টাইন প্রকৃতির ভেতর যে ঐক্য এবং সামঞ্জস্যের কথা বলেছেন তা ধর্মানুভূতিরই পরোক্ষ প্রকাশ। আইনস্টাইনের ধর্মানুভূতিকে দেব অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন এবং তার দার্শনিক লেখায় 'সত্য' 'শিব' ও 'সুন্দরের' প্রতি যে মহত্ত্বম দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে তাতে আইনস্টাইন সমসাময়িক বিশ্বে শান্তির বার্তাবাহকরূপেই আবির্ভূত হয়েছেন। তবে, দেব বিচলিত বোধও করেছেন । যখন তিনি লক্ষ্য করেছেন, এইসব বড়ো বড়ো বিজ্ঞানী চাপের মুখে না পারছেন অধ্যাত্মবাদের দিকে ঝুঁকতে না পারছেন জড়বাদের দিকে ঝুঁকে পড়তে। তারা এই সমস্যার সফল সমাধান খুঁজে পেয়েছেন 'নিউট্র্যালিজম' নামক তত্ত্বের মাধ্যমে। যেখানে নিরপেক্ষ তত্ত্বই কখনো জড় আবার অবস্থার প্রেক্ষিতে কখনো তা চেতন বলে পরিগণিত। দেব ছিলেন এসব বিতর্কের অনেক উর্ধ্বে। তাঁর সহজ সরল স্বীকারোক্তি ছিল, "অধ্যাত্মদৃষ্টিই একত্ববোধের জনক। শুধু হৃদয়ই সে অনুভূতির উৎস ও আকর । অনুরাগই তার বড় পাথেয়।"[৩১]

দেব ' আগামী দিনের শিক্ষাদর্শন' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাতে চেয়েছেন, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে প্রেমের সংযোগসাধন অত্যন্ত জরুরি। আর এই প্রেমের উৎপত্তি হবে একাত্মবোধ থেকে। বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের মূলে যে ঐক্যের ধারণা রয়েছে এ বিষয়টি বিজ্ঞানে চরমভাবে উপেক্ষিত। ফলে, বিজ্ঞানের নিজস্ব গণ্ডিতে বিজ্ঞান আজ অসহায় হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানের এই অসহায় অবস্থা থেকে উত্তরণের

Dhaka University Institutional Repository

একমাত্র পথ হল বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মবোধের মিলন, যার মূলকথা বিশ্বের ঐক্য, মানুষে মানুষে ঐক্যের অনুভূতি। এই ঐক্যের অনুভূতিকে শিক্ষার দ্বারা জাগ্রত করতে হবে। দেবের মতে, প্রকৃত শিক্ষার অনুপস্থিতি মৌলিক চেতনাবোধ বিকাশের অন্তরায়। শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক জ্ঞান মানুষকে তার আত্মিক শান্তির পথকে বাধাগ্রস্ত করে তুলে সভ্যতার ভাঙ্গনকে ত্বরান্বিত করবে । দেব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও বিজ্ঞান প্রভাবিত শিক্ষার উপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন, আজকের সভ্যতা পুরোটাই বিজ্ঞানের অবদান। তবে বিজ্ঞান সৃষ্ট সভ্যতাকে সুসংহত ও সুদৃঢ় করতে হলে প্রয়োজন ধর্মীয় ঐক্যবোধ এবং প্রেমের সঙ্গে বিজ্ঞানের জ্ঞানের সমন্বয় সাধন। দেবের মতে, এই সমন্বয়ের মধ্যে দিয়েই মানুষ রচনা করবে তার সোনালি ভবিষ্যতের স্বপ্নের ভিত। আর সেটাই হবে মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গলের চাবিকাঠি। এ প্রসঙ্গে জনৈক প্রবন্ধকার বলেন–

> "দেব বিজ্ঞান প্রভাবিত আধুনিক বস্তুবাদী শিক্ষাব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে বর্হিদৃষ্টিসম্পন্ন, আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে। এই শিক্ষাব্যবস্থা অপূর্ণ, ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের পরিপন্থী। তাই আজ বিশ্বময় এক নৈরাশ্যকর, সংঘাত-দ্বন্দ্বময়, ধ্বংসমুখী জটিল অবস্থা বিদ্যমান। ফলশ্রুতিতে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হচ্ছে বিঘ্নিত, মানুষ পালন করে চলছে জীবনদর্শনহীন নিষ্ফল কর্মজীবন। অথচ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলা"[৩২]।

দেব আত্যন্তিক অর্থে বিজ্ঞান বিরোধী তো ছিলেনই না বরং তিনি ভীত ছিলেন বিজ্ঞানের অসামান্য অবদানকে যেন তথাকথিত সভ্য জগতের মানুষগুলো অনাদরে অবহেলায় ভুলুণ্ঠিত না করে এর যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করে। তাঁর বৈজ্ঞানিক ভাবনা ছিল মানবপ্রেমে পরিশুদ্ধ, যুক্তিনিষ্ঠ ও কল্যাণধর্মে বলীয়ান। বিজ্ঞান ও প্রগতির ধারাকে তিনি বিশ্বসভ্যতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার সর্বোত্তম হাতিয়াররূপে বিবেচনা করেছেন। মানব প্রয়োজনের চরম বাস্তবতার প্রতি দেবের দরদী হৃদয় ছিলো সদা ব্যাকুল, সদা চঞ্চল। তাই তিনি তাঁর নতুন শিক্ষাদর্শনে বিজ্ঞানের দেয়া বাহ্যিক ঐক্যের সাথে বিভিন্ন ধর্মে প্রচারিত আত্মিক যোগের সমন্বয়সাধন করতে আগ্রহী। কারণ, জ্ঞানের সাথে প্রেমের সংমিশ্রণ ব্যতিত মানুষের পক্ষে পূর্ণাঙ্গ, সার্থক, সুন্দর ও সুষ্ঠু জীবনযাত্রা মোটেই সম্ভব নয়। এজন্য দেব মনে করেন, পরিপূর্ণ জীবনের লক্ষ্যে আজকের মানুষকে বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনদর্শন গড়ে তুলতে হবে। বিজ্ঞান

Dhaka University Institutional Repository

আবিষ্কৃত আধুনিক মরণাস্ত্রের ভয়াবহতা সম্পর্কে দেব সজাগ ছিলেন। মানুষের অস্তিত্ব রক্ষায় তিনি বিজ্ঞানের অপরিসীম শক্তিকে প্রেমের নির্ঝরিণী ধারায় প্রবাহিত করারও আহ্বান জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে দেব মনে করেন, হৃদয় গভীর থেকে উৎসারিত একত্ববোধের চেতনাই মানব মনে ঐশী প্রেমের বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে। আর এই প্রেমের সফল রূপায়ণ ঘটবে মানুষের বাস্তবজীবনে। দেব বিশ্বাস করেন, সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষের ইতিহাসে যে ঐক্যের বার্তা মানবহৃদয় আলোড়িত করেছে সেটিই সর্বজনীন প্রেমের বন্ধন তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। দেব মানবকল্যাণের একমাত্র সঞ্চালক শক্তি হিসেবে বিজ্ঞান এবং দর্শনের সমঝোতার উপরই গুরত্ব আরোপ করেছেন। তিনি মনে করেন জ্ঞান এবং প্রেমের মিলনে এক নতুন সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটবে। সভ্যতার উষালগ্নে মানুষ অপ্রত্যাশিত দুর্বিপাকে নিমজ্জিত ছিল ক্রমে মানবসভ্যতা বিকশিত হতে হতে আজকের জ্ঞান এবং প্রেমময় অনুভূতিসম্পন্ন যে আধুনিক সভ্য সমাজের উদ্ভব ঘটেছে তার লক্ষ্য হবে সার্বভৌম মানবতা। সুতরাং, দর্শন-বিজ্ঞানের একত্রীকরণ মানবজীবনে পরমসুখের সন্ধানদানে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করবে।

দেব তাঁর 'A Glimpse of the Philosophy of the Future' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাতে সমর্থ হয়েছেন যে, বিজ্ঞান এবং দর্শনের মধুর মিলনের উপরই নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ মানুষের বাচাঁর সৌধ। অন্যথায়, বর্তমান সভ্যতা বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত আণবিক শক্তির ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে রেহাই পাবে না। অভিজ্ঞ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দেব মনে করেন, এদের সমন্বয়ের মধ্যেই সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা তথা স্থায়ী কল্যাণ নিহিত। দেব বলেন–

> "In their practical aspect at least, science and philosophy stand respectively for unrestricted power and universal love and obviously, in a union of both lies the future of modern man who knows how 'to fly in the air like birds and to swim in water like the fishes but not know how to live on earth."[৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

দেব মনে করেন, বিজ্ঞানের ইতিবাচক অবদানকে সঠিকভাবে অর্জন করতে পারলে মানুষ ঐক্য এবং সম্প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি বিশ্বসমাজ গড়ে তুলতে পারবে। এ ব্যাপারে তিনি মানুষের পরিপূর্ণ সামর্থ্যের উপরই গুরত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন–

> "The prospects of science for human happiness in this nuclear age almost solely depends on our ability to build a coherent world-society on the bed-rock of these two inspiring ideas. If we fail to do this, science will and must fail modern man. To the contrary, if we can achieve this, science has a right future, possibly a brighter one than average enlightened commonsense can conceive".[৩৪]

দেব বলেন, বর্তমান জগৎ ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ ও দ্বিধা বিভক্ত, একদিকে বিজ্ঞানের বিজয়- বৈজয়ন্তী, অন্যদিকে বিজ্ঞান আবিষ্কৃত আধুনিক আণবিক মারণাস্ত্রের ভয়াবহতা ও নগ্ন প্রকাশ সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভুলুণ্ঠিত করে চলেছে। এমতাবস্থায়, দেবের প্রত্যাশিত ধর্ম ও বিজ্ঞানের, জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের মহামিলন কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে এ বিষয়ে ভাববার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। বিজ্ঞানের আকাশ ছোঁয়া সাফল্য মানব মনে এক ধরনের কৃত্রিমতার জন্ম দিয়েছে। আবেগবর্জিত মানুষ আজ বিজ্ঞান-স্পর্শমণির পরশে জটিল যান্ত্রিকতাকে আলিঙ্গন করছে অবলীলায়। হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগ নিস্ফল আক্রোশে ব্যর্থতার স্তুপে পরিণত হচ্ছে। দেব ধর্ম প্রভাবিত একত্বনিষ্ঠ অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক জড়বাদের সামঞ্জস্য বিধানের উপর গুরুত্বারোপ করতে যেয়ে বলেন, অধ্যাত্মবাদ এবং জড়বাদের মিলনে যে সর্বজনীন ও সার্বভৌম দর্শনের উদ্ভব ঘটবে তার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ মানবতা হয়ে উঠবে সুদৃঢ় এবং সুরক্ষিত। তবে এক্ষেত্রে দেবের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ৫এবং অধ্যাত্ম প্রেমের সমন্বয় বিদ্যমান পরিস্থিতিতে হয়তো অধরাই রয়ে যাবে। কেননা, যথার্থ প্রেমের উৎস গভীর হৃদয়ানুভূতি আর শক্তির উৎস আবেগবর্জিত নিরেট যান্ত্রিকতা। যৌক্তিক বিচারে তত্ত্ব এবং প্রয়োগ এ দু'টি বিষয় পরস্পর বিরোধী না হলেও মূলত বিপরীত দু'টি ধারা। তত্ত্বের দিক থেকে দেবের চিন্তা এবং আদর্শের সাথে বাস্তবধর্মী প্রয়োগের সমন্বয় কতোটা ইতিবাচক ফলাফল উৎপাদন করবে বিষয়টি চিন্তার খাতিরেই ভাবনার অবকাশ থেকে যায়। তবে, একথাও সত্য মানবকল্যাণ

Dhaka University Institutional Repository

কামনা মনুষ্য হৃদয়ের চিরন্তন সুপ্ত বাসনারই একটি দিক। মানুষের সৃজনশীল চেতন মনের স্পর্শে এবং যথার্থ দর্শনচর্চার মাধ্যমেই এর পরিস্ফুটন ঘটানো সম্ভব। দেবের এ সমন্বয় সাধারণ মানুষের হৃদয়ে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলে এ বিশ্বকে পূর্ণমাত্রায় সার্থক ও সুন্দর করে তুলবে এটাই আমাদের কামনা। দেব বিজ্ঞান এবং দর্শনের সেতুবন্ধন রচনা করেছেন সর্বজনীন ভালোবাসার উপর। তাই তো তিনি বলেন, "I am sanguine, science and philosophy will shake hands and an era of collective prosperity, free form the burden of prejudices and superstitions and inspired by universal love, dawn."[৩৫]

২.৩ দর্শন

প্রাচ্য দশর্নের ইতিহাসে গোবিন্দচন্দ্র দেব পাশ্চাত্যের. সক্রেটিস হিসেবে সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। চলনে-বলনে, মেধায়-প্রজ্ঞায়, চিন্তায়-চেতনায় সক্রেটিসেরই সমতুল্য বলে পরিগণিত এ মহামনীষী। দর্শনের ক্ষেত্রে দেবের দান অপরিসীম। দর্শনের মৌলিক সমস্যা সম্বলিত গভীর দার্শনিক জিজ্ঞাসা: দর্শন কী, কেমন এর স্বরূপ হওয়া উচিৎ এসব প্রশ্নের সমাধান দেব অনুসন্ধান করেছেন প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দর্শন তথা দার্শনিকদের বহু বিচিত্র মনোভাবের মাঝে। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ অজানাকে জানার চেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে। চিন্তাশীল মানুষ জগৎ-জীবনকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে দর্শনের স্বরূপকে উপলব্ধি করার জন্য নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। কিন্তু দর্শনের যথার্থ এবং সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণে সহজ-বুদ্ধি অসমর্থ হয়েছে বার বার। এ প্রসঙ্গে দেব তার *তত্ত্ববিদ্যা সার* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বলেন, "দর্শনের আসল রূপ যদি সত্যই সহজ বুদ্ধিতে দুরধিগম্য হয়, তবে দার্শনিক সমস্যার মাধ্যমে তার সম্পর্কে একটা আবছায়ার মতো ধারণা ক'রেই দর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।"[৩৬] দেব দর্শন বিষয়ে পাশ্চাত্য মনীষী ইমানুয়েল কান্টের মতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। কান্ট মনে করেন, দর্শনের প্রধান কাজ হচ্ছে জ্ঞানের বিস্তৃতি সম্বন্ধে সঠিক পরিমাপক নির্ধারণ করা, ব্যক্তিজীবনে করণীয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করা এবং সবশেষে কর্মের লক্ষ্য সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছা ।

Dhaka University Institutional Repository

দর্শনের স্বরূপ উপলব্ধির বিষয়ে দেব কান্ট ও বার্ট্রান্ড রাসেলের প্রচেষ্টাকে 'স্বরূপলক্ষণ' ও 'তটস্থলক্ষণ' বলেও অভিহিত করেছেন। দর্শনের স্বরূপ আবিষ্কারে বিভিন্ন দার্শনিকের মতের ভিন্নতাই সাধারণ মানুষকে দর্শনের আসল রূপ উদ্‌ঘাটনে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দেয়। দেবের মতে, স্বাধীনচিন্তা ও চেষ্টার দ্বারা ব্যক্তির স্বকীয়তাকে পরিপূর্ণভাবে অভিব্যক্ত করার প্রয়াসই দর্শন। দর্শন সম্পর্কে আধুনিক সভ্য মানবগোষ্ঠীর প্রত্যাশার বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখে দেব বলেন, "দর্শন মানব-সভ্যতার এক অনবদ্য, অনাবিল ভাস্বর সৃষ্টি। তাই যেদিন মানুষ দর্শনের কালো বিড়ালের সন্ধান একেবারে ছেড়ে দেবে, সেদিন তার সঙ্গে তার উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ মর্কট-প্রবরের কিছু তফাৎ থাকবে কি না ভেবে দেখা প্রয়োজন।"[৩৭] প্রাচীন এবং খ্রিষ্টপূর্ব যুগের গ্রিক দার্শনিকরা দর্শনের সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করেছেন নানাভাবে। তারা মনে করেন 'জ্ঞান পিপাসাই ' দর্শনের আসল বৈশিষ্ট্য। তবে প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকরা দর্শন এবং বিজ্ঞানের সম্পর্ককে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং নিকট বলে মনে করতেন। এ সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ হয়েছিলো যে বিজ্ঞানকেই সে যুগে দর্শনের মর্যাদায় আসীন করা হতো, আর আজ বিজ্ঞান তার প্রাচীনত্বকে অস্বীকার করে আপন মহিমায় নিজ স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে চলেছে। এসব অসন্তোষ সত্ত্বেও উভয়েরই মূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে দেব বলেন জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসাই হচ্ছে দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য। উভয়ই জগৎ এবং জীবনকে সমানভাবে জানতে প্রয়াসী। দর্শনের সাথে বিজ্ঞানের যে সমন্বয় এটি তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যকেই প্রকাশিত করে। তাই বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকেও দর্শন-বিজ্ঞানের সমন্বিত কার্যক্রম এক সময় হয়তো উপেক্ষণীয় ছিলো না বটে তবে বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানের সাড়ম্বর উপস্থিতি বিজ্ঞানকে দর্শন থেকে বহুদূর নিয়ে গিয়েছে। মনীষী সক্রেটিসের বিনয়াবনত স্বভাবের প্রেক্ষিতে যে দর্শন জ্ঞান পিপাসারূপে আবির্ভূত হয়েছিলো তারই সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায় হার্বার্ট স্পেনসারের দর্শনে। তিনি বলেন, বিজ্ঞান জগতের বিভিন্ন বিভাগের যে জ্ঞান আহরণ করে তার সমন্বয় সাধনই দর্শনের আসল কাজ। স্পেনসার আরো বলেন, জ্ঞানের পথে বিজ্ঞান আমাদের আরেক ধাপ এগিয়ে দেয়। বিজ্ঞানের নিরলস প্রচেষ্টায় যে জ্ঞান আহরিত হয় তাতে প্রকৃতির অসংখ্য, অগণিত বৈচিত্র্যের পেছনে এক ঐক্যসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এটিকে বিজ্ঞানের ভাষায় 'প্রকৃতির নিয়ম' বলা হয়। প্রকৃতির নিয়মের সেই ঐক্যসূত্র এক নয় বহু। "জগতের বিভিন্ন বিভাগে প্রাকৃতিক নিয়ম ভিন্ন।"[৩৮] তবে বিজ্ঞানের দেয়া আংশিক ঐক্যবোধের ধারণা পরিপূর্ণতা লাভ করে দর্শনের পূর্ণ ঐক্যের মাঝে। নিয়মের রাজত্বে বিজ্ঞান অসংখ্য নিয়মের নিয়ন্তা। আর এই

Dhaka University Institutional Repository

নিয়মের পেছনে পূর্ণ একক তত্ত্বের সন্ধান করাই হলো দর্শনের চিরাচরিত কাজ। সতেরো শতকের দার্শনিক স্পিনোজা দর্শনের স্বভাব সম্পর্কে বলেন, জগৎ একদিকে এক অগণিত বস্তুপ্রবাহ আর অন্যদিকে ভাব প্রবাহ, এটা হলো তার বৈচিত্র্য বা বহুত্ব। কিন্তু এই দুই অগণিত ধারার মূল উৎস এক পরম ঐক্য। এই পরম ঐক্য আবিষ্কার করাই দর্শনের কাজ। দেবের মতে, দর্শনের মৌলিক বিষয় হলো জগতের বৈচিত্র্যের ভেতরে একত্বের প্রতীতি আবিষ্কার করা। তবে এই 'একত্ববোধকে' শুধু তত্ত্ব হিসেবে চিন্তা করা যাবে না। তত্ত্বের আড়ালে সার্বিক সত্যের বিশালত্বকে অবমুক্ত করাই হবে দর্শনের উৎস। জগতে যে একত্বের চেতনা মানবভাবনায় সঞ্চারিত তার পেছনে কার্যকরী শক্তি হচ্ছে বিশ্বপ্রেমের 'অস্ফুট' এক অনুভূতি। দেবের মতে, এই অনুভূতি হচ্ছে এক সর্বজনীন ঐশী প্রেমের অমিয়ধারা। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্ম প্রভাবিত ভারতীয় অনেক দার্শনিক দর্শনকে একত্ববিজ্ঞান বলে অভিহিত করেন। তবে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন উভয়েরই লক্ষ্য এক হলেও প্রাথমিক পার্থক্য অনস্বীকার্য। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনবোধ থেকে এবং পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি জ্ঞানপিপাসা থেকে। দেবের দর্শনালোচনায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক চিন্তা-চেতনার মৌলিক বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে। মুসলিম দার্শনিকদের দর্শন সমন্বয় প্রসঙ্গে দেব বলেন, মুসলিম দার্শনিকদের ধর্ম-দর্শন সমন্বয় ও দর্শন-বিজ্ঞান সমন্বয় থেকে একথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, তাদের মতে দর্শনের শেষ লক্ষ্য হচ্ছে অধ্যাত্মজ্ঞান। "দর্শনের ধর্মীয় অনুভূতিতে রূপান্তরে তাঁরা প্রাচীন ভারতীয় মতের সমর্থন, আর জ্ঞান-পিপাসায় দর্শনের উৎস কল্পনায় তাঁরা পাশ্চাত্য মতের সমর্থন করেছেন।"[৩৯] উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, দেবের *তত্ত্ববিদ্যা সার* গ্রন্থটি দর্শন বিষয়ে রচিত অন্যান্য গ্রন্থ থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী একটি রচনা। এ গ্রন্থে দেবের চিন্তা-চেতনা এবং মৌলিকত্বের সুদূরপ্রসারী ও সুগভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য এ গ্রন্থটিতে দেব দর্শন সম্পর্কিত আলোচনায় দার্শনিক বিভিন্ন সমস্যাবলী তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন অত্যন্ত সহজ সরল ও সাবলীলভাবে। দর্শনের উৎপত্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে দেব প্রতীচ্য ও প্রাচ্য মতের একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, "উৎপত্তির দিক থেকে প্রতীচ্য ও প্রাচ্য দর্শনের লক্ষ্য এক হলেও প্রাথমিক পর্যায়ের পার্থক্যটি সুস্পষ্ট। কারণ, আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনে দার্শনিক জ্ঞানের ফল যে অপরিসীম তা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কোন দার্শনিকই অস্বীকার করেন না। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

সূচনালগ্নে প্রতীচ্য দর্শনের উৎপত্তি হয়েছিল প্রজ্ঞা-প্রেম (Love of wisdom) থেকে আর প্রাচ্য দর্শনের বিশেষত ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তি হয়েছিল মানবজীবনের প্রয়োজন সিদ্ধি থেকে।"[৪০] প্রাচ্য-প্রতীচ্য দর্শনের প্রজ্ঞা-প্রেম ও মানবজীবনের প্রয়োজন থেকে যে দর্শনের সূচনা হয়েছিলো সেটি তার যাত্রাপথের দীর্ঘ পরিক্রমায় স্থানিক-কালিক গণ্ডিকে অতিক্রম করে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্যে বর্তমান বিশ্বসভ্যতাকে করেছে কর্মমুখর ও গতিশীল। তবে দেবের এই দার্শনিক মতের নির্যাস পরিলক্ষিত হয় তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্যের ধারাবাহিকতায়। সভ্যতার সূচনালগ্নের সংকটাপন্ন অবস্থার উত্তরণ ঘটিয়ে বিজ্ঞান তার ব্যাপক বিস্তৃত পরিসরে স্বমহিমায় সমাসীন। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় মানুষ আজ-সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছেছে। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ের দর্শনের তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির প্রয়োজনীয়তা সঙ্গত কারণেই ম্লান হয়ে পড়েছে। আজকের দিনের বৈজ্ঞানিক সভ্যতার এই সুবিশাল পরিমণ্ডলে অবস্থান করে মহামতি গৌতম বুদ্ধের মতোই তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার বিশেষ কোনো প্রয়োজন রয়েছে বলে দেব মনে করেন না। এসব তাত্ত্বিক প্রশ্নের সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য কোনো সমাধানের পথ আবিষ্কার করাও দর্শনের অপরিহার্য কোনো কর্তব্য নয়। দেবের মতে, "এ সমস্ত প্রশ্ন মানুষের মনে জাগিয়ে তোলা এবং তার উত্তর আবিষ্কারের চেষ্টাই দর্শনের এক বড় কাজ।"[৪১] তবে, দেবের দর্শনের মূল ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে জ্ঞানের শক্তির সাথে ঐশী গুণসম্পন্ন হৃদয়ানুভূতির আহ্বানে। উল্লেখ্য যে, এ সম্পর্কিত আলোচনা প্রাধান্য লাভ করেছে দেবের তত্ত্ববিষয়ক মতবাদে। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনার সুযোগ অব্যাহত থাকবে। সার্বিক বিচারে দেব দর্শনকে অফুরন্ত শুভ প্রেরণার উৎস হিসেবে দেখেছেন। তিনি দর্শনকে জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করে জীবনের প্রতিচ্ছবি রূপায়ণ করতে চেয়েছেন দর্শনের সুবিশাল পরিমণ্ডলে। আর এ জন্যই তিনি তাঁর *আমার জীবন দর্শন* নামক গ্রন্থে বলেছেন, "সারাজীবন দর্শনের সঙ্গে আন্তরিক যোগ স্থাপনের চেষ্টা করে এই সত্য উপলব্ধি করেছি যে, সার্থক দর্শন মাত্রেই জীবন-দর্শন। দর্শন কথাটি তাই জীবন-দর্শন কথারই একটি প্রতিশব্দ।"[৪২] দেবের মতে, দর্শনের উদ্ভব ও বিকাশের মূলে রয়েছে মানুষের জগৎ-জীবন সম্পর্কিত স্বাভাবিক কৌতূহল, জীবনকে সার্থক সুন্দর ও মহিমান্বিত করার প্রয়াস। দর্শন যে জীবন থেকে মোটেই বিচ্ছিন্ন নয় এবং সম্ভবও নয় দেবের এ মত অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছে তাঁরই বক্তব্যের মাধ্যমে। দেব পরমসত্তার সাথে বৈচিত্র্যপূর্ণ ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার জগতের যে সম্পর্ক দেখাবার চেষ্টা করেছেন তাতে করে এটি প্রমাণিত হয় যে, দেব তার দর্শনকে

Dhaka University Institutional Repository

শুধুমাত্র তত্ত্বনির্ভর না করে মানবজাতির ব্যাপক প্রয়োজনে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। মানবসমাজের চলমান অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক, সামাজিক সংকটেও দেবের দর্শন শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। দেব মনে করেন বহুত্বের জগৎ পরমসত্তার মূর্ত প্রকাশিত রূপ। কিন্তু তিনি এও মনে করেন, ব্যক্তি পরমাত্মার সাথে মিলিত হওয়ার পরও জীবাত্মার সর্বোচ্চ কল্যাণার্থে অবিরামভাবে কাজ করে যেতে পারবে কেননা জীবাত্মার সেবার মাধ্যমেই ব্যক্তি পরমাত্মার সন্তোষবিধান তথা পার্থিবজীবনে জ্ঞানে-কর্মে আলোকিত পরিপূর্ণ এক সফল জীবন লাভ করতে পারবে। তবে দেবের দর্শনের তাত্ত্বিক দিকটা অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত। আর এ দিকটি পুরোপুরি বুঝতে হলে তাঁর *Idealism and Progress* গ্রন্থটি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করতে হবে। মূলত এ গ্রন্থে দেব তাঁর সহজ-স্বাভাবিক রম্যতার বদলে কঠিন-যুক্তি-তর্কের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দর্শনকে দাঁড় করানোর প্রয়াস পেয়েছেন। গ্রন্থটিতে দেবের বক্তব্যের পরিশীলিত এবং মার্জিত রূপ তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যকে প্রকাশিত করে। তিনি অত্যন্ত সহজ-সাবলীলভাবে দর্শনকে চিত্রিত করতে চেষ্টা করেছেন এ গ্রন্থে। দেব বলেন, "Prima facie at least, it has been responsible for not only an under-estimation of the material needs of the common man but also for his exploitation, economic or otherwise."[৪৩] চিরায়ত ভাববাদকে তিনি নব প্রজন্মের প্রগতির পথে এক শক্তিশালী হাতিয়াররূপে তৈরি করতে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। দেবের 'ভাববাদ'এ শুধু বিমূর্ত তত্ত্বালোচনাই স্থান পায়নি, যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়টিও। ভাববাদের প্রতি দার্শনিকদের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে দেব ভাববাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। বরং তার সমন্বয়ী ভাববাদের মধ্যেই মানব প্রগতির সুস্পষ্ট রূপায়ণ করেছেন। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়টিকে যারা অতীব আগ্রহের সাথে অনুশীলন করেন তারা প্রকৃতপক্ষে ভাববাদের বিরোধিতাই করে থাকেন। দেব সাধারণ জনগণের অর্থনৈতিক তথা সামগ্রিক মুক্তির বিষয়টি মাথায় রেখেই চিরাচরিত ভাববাদকে স্থায়ীরূপ প্রদানের প্রয়াস চালিয়েছেন। দেব ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা ও স্বজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত সমন্বয়ী-ভাববাদের মধ্যেই নিপীড়িত জনতার ভবিষ্যৎ অগ্রগতি ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে বলেও মনে করেন। সামাজিক, ধর্মীয়, নৈতিক পরিবেশের আবহ তাঁর মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সনাতন ধর্মে জন্মগ্রহণ করে দেব বাল্য–কৈশোরের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা এবং তার মূল্যমানগুলোকে

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের বীজমন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের নিত্য গতিময়তার সাথে সাথে পরিচিতি লাভ করেছেন নতুন নতুন ধ্যান–ধারণা, চিন্তা-চেতনার সাথে। প্রসারিত হয়েছে দর্শন-তত্ত্ব এবং প্রায়োগিক জ্ঞানের সীমা। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দার্শনিক ধারাকে গভীর অন্তদৃষ্টির সাহায্যে অধ্যয়ন করেছেন। এ গভীর এবং সুদূরপ্রসারী জ্ঞানীয় দৃষ্টিভঙ্গিই দেবকে সাধারণ মানুষের ভবিষ্যৎ রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। মানবজীবনের সকল বৃত্তি-প্রবৃত্তির চাহিদা পরিপূরণের লক্ষ্যে দেব তার দর্শনে অত্যন্ত সতর্কভাবে যেমন নৈতিক নীতির অন্তর্ভুক্তিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন তেমনি এই নৈতিক নীতিকে সুরক্ষিত করতে ধর্মীয় এবং বুদ্ধিগত আদর্শেরও সন্ধান করেছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রচলিত বিশ্লেষণী ধারার প্রভাবে চিন্তাজগতে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিলো এবং গ্রিক ভারতীয় দর্শনের তত্ত্ববিদ্যক ধারার প্রতিও দেবের বিমুখিনতার ভাব পরিলক্ষিত হয়। স্পিনোজার বিশুদ্ধ বুদ্ধিগত ঐশী প্রেমের বাণীর ক্ষেত্রে কান্টীয় নৈতিক নীতির মূল্যমানগুলো দর্শনের জগতে কোপারনিকীয় বিপ্লবের সূচনা করে। এভাবেই কান্ট ঈশ্বর, আত্মা, অমরত্ব এসব বিষয়গুলিকে নৈতিক বুদ্ধির প্রকল্পজাত ফল বলেও অভিহিত করেন। মহামতি গৌতমবুদ্ধও তত্ত্বীয় জ্ঞানকে পরিত্যাগ

করে 'নির্বাণ'- এর মাধ্যমে মানবমুক্তির সন্ধান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে দেব তাঁর *Buddha: The Humanist* গ্রন্থে বলেন–

> "Buddha does not even care to analyse its metaphysical implications. To the contrary, he discouraged such a theoretic approach and thought, for the novice at least, this may prove to be a departure from the road to peace and mean involvement in the tentacles of desires"[৪৪]

তত্ত্ববিদ্যা গঠনে দেবের আগ্রহ ছিলো শূন্যের কোঠায়। তিনি চিরন্তনী দার্শনিক ধারাকে অব্যাহত রেখেই বিশ্লেষণী পদ্ধতি এবং নৈতিক বুদ্ধির জগতে সমন্বয়সাধনের প্রয়াসে লিপ্ত হন। তবে এক্ষেত্রে তিনি জ্ঞানবিদ্যা সংক্রান্ত জটিল সমস্যায় আবর্তিত হন। জ্ঞানবিদ্যা সংক্রান্ত সমস্যার প্রথমটি হচ্ছে সমগ্র ও অংশের সম্বন্ধ। দ্বিতীয়ত, নির্বিশেষ ও বিশেষের সম্বন্ধ এবং তৃতীয়ত, অবভাস ও সত্তার সম্বন্ধ। এগুলোর বিশ্লেষণে দেব বৌদ্ধধর্ম, সনাতন ধর্ম এবং অন্যান্য নব্য- বাস্তববাদীদের ধারণার

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণ করে এগিয়ে যেতে থাকেন। এবং তিনি দেখতে পান সমগ্রগুলো হচ্ছে অংশের সমষ্টিমাত্র। তবে এ অংশগুলোর সমষ্টিতে যে ঐক্যের ধারণা পাওয়া যায় তা বিষয়মুখিন না বিষয়ীমুখিন এটি ছিল বাস্তবিকই মৌলিক সমস্যা। কোনো কোনো উপনিষদে অংশ ও সমগ্রের এ প্রত্যয়টিকে যুক্তিতর্কের উর্ধ্বে একটি মানসিক সহজাত বৃত্তির ফল বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন, "সমগ্রের যে ধারণা যুক্তির মাধ্যমে পাওয়া যায়, তা কোন স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা নয়। প্রকৃতপক্ষে যদিও এ সমগ্র বুদ্ধিজাত তবুও তা বাস্তবজীবনে গ্রহণীয় নয়"[৪৫]। অভিজ্ঞতার জগতে প্রতিটি বস্তু একটি আর একটির সাথে সংযুক্ত এবং অখণ্ড তবুও এগুলোকে বাস্তব বলে গ্রহণ করা যায় না। বিজ্ঞানের মধ্যে অভিজ্ঞতার বিষয়গুলোর যে একত্রীকরণ সেটাও মানুষের মানসিক চাহিদার অনিবার্য ফল বলে দেব দাবি করেন। এক্ষেত্রেও বিষয়নিষ্ঠতার দাবি অযৌক্তিক বলে প্রমাণিত হয়। তবে যা-ই হোক না কেন, "প্রজ্ঞার ধারণাগত একত্ব ইন্দ্রিয়ের কঠোর তথ্যের সঙ্গে খাপ খায় না। একত্বের ধারণাকে এবং তার মাধ্যমে সকল প্রকার খাঁটি যৌক্তিক ধারণাকেই বিষয়ীগত বলে চিত্রিত করা যায়। অপরদিকে যতই পরস্পর বিরোধী হোক না কেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষসমূহ বিষয়গত তথ্য হিসেবে বাস্তব"[৪৬]। এসব জটিল বিষয় থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে হেগেলের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি একটি স্বয়ংসিদ্ধ-নীতির সন্ধান দেয়। হেগেল বলেন, যা কিছু যুক্তিসঙ্গত তা সত্য বলে বিবেচিত। তবে, হেগেলের এই উক্তি কোনো বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ব্রাডলি হেগেলের এই ধারণাকে গ্রহণ না করে 'সুসংহতি'কেই সত্যের একমাত্র পরিমাপক বলে ধরে নিয়েছেন। তবে, ব্রাডলি মনে করেন অবভাসগুলি যে কোনোভাবে পরমসত্তার মধ্যে সংহতিলাভ করেছে। ঐক্যের ধারণা মানব মানসে সহজাত ধারণারই উৎকর্ষিত রূপ। তাই যুগে যুগে বিভিন্ন বর্ণ, ধর্ম, সম্প্রদায়ের মাঝে লক্ষ্য করলে এই রূপ বৈচিত্র্যের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। স্পিনোজার কাছে জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তর হলো স্বজ্ঞা। স্পিনোজা আপাতদৃষ্ট বিশেষগুলোকে কল্পনাপ্রসূত বলে উল্লেখ করেন এবং যুক্তিউর্ধ্ব স্বজ্ঞাকেই জ্ঞানের আদর্শিক মানদণ্ড বলে প্রতিস্থাপন করেন। 'বিপর্যস্ত বুদ্ধি'–শীর্ষক প্রবন্ধে দেব দেখিয়েছেন, হৃদয়বিবর্জিত বুদ্ধির অনুশীলন আজকের যুগের মানুষের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। সতেরো শতক থেকে বুদ্ধির যে চর্চা শুরু হয়েছিলো তার ভাঙ্গন লক্ষ্য করা যায় উনিশ শতকের শেষদিকে। দেবের মতে, "ধর্মকে রক্ষার জন্যেই মানুষের স্বাধীন চিন্তার দাবীতে বুদ্ধিবাদ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বুদ্ধিবাদ দীর্ঘকাল প্রাধান্য বিস্তার করে থাকতে পারেনি।[৪৭]" এ প্রসঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে মানুষের সীমাহীন কর্মচাঞ্চল্যই তাঁকে ভালোবাসাহীন এবং ভাবলেশহীন কৃত্রিম মানুষে পরিণত করেছে। কোনো এক সময় মানুষ হৃদয়বৃত্তির পরিবর্তে বুদ্ধিকে আশ্রয় করে জাগতিক কর্মযজ্ঞে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করেছিলো। আজ আবার সেই বুদ্ধিকেই নামসর্বস্ব প্রত্যয়ে সম্মুখে হাজির করে বিশাল কর্মক্ষেত্রের মাঝে মানুষ ডুবতে বসেছে। দেব মনে করেন, এটিই মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা। এই অবস্থার উত্তরণ ঘটানোর জন্যই দেব তাঁর দর্শনে সমন্বয়কে খুঁজে বেরিয়েছেন। মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য এই সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।। এখানেই দেব যুক্তি-উত্তর স্বজ্ঞার কার্যকারিতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। দেবের সমন্বয়ের মৌলিকতা এখানেই নিহিত। যে ঐক্যের ধারণা দেব বুদ্ধির সাথে হৃদয়ের মিলনে ঘটিয়েছেন সেটি লক্ষ্য করা যায় বার্গসোঁর দর্শনেও। বার্গসোঁ বুদ্ধির অসারতা প্রদর্শন করে স্বজ্ঞার কার্যকারিতার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর মতে, একমাত্র স্বজ্ঞাই ঐক্যের ধারণা লাভ করতে সমর্থ। দর্শন চিন্তার ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের পরিসরে ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞার ভূমিকা কার্যকারিতা লাভ করে যুক্তিউর্ধ্ব স্বজ্ঞার ধারণার সাথে সমন্বিত হয়ে । যুক্তিবহির্ভূত স্বজ্ঞার ভেতর থেকেই প্রজ্ঞা আবার তার দাবি অনুযায়ী চাহিদা পরিপূরণে অব্যাহতভাবে কাজ করে যায়। এ ক্ষেত্রে দেবের *ভাববাদ ও প্রগতি* গ্রন্থের ভূমিকায় হোসনে আরা আলম বলেন–

> "আমাদের সচেতন জীবনের একত্ব সম্বন্ধে বিবেচনা করলে এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, জ্ঞানে পৌঁছুবার জন্য ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা ও স্বজ্ঞারূপে চিহ্নিত আমাদের যে তিনটি সড়ক রয়েছে সেগুলোর সঙ্গমস্থলেই সম্ভবত যুক্তিবিদ্যা বর্হিভূত স্বজ্ঞার বিষয়গত দিকটি অবস্থান করছে। খাঁটি একত্বের স্বজ্ঞাই কেবলমাত্র এই দাবী মেটাতে পারে। এতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গত দিক ও প্রজ্ঞার আবশ্যকতা এ দুটোই আছে। যেহেতু এটা একটা অপরিহার্য অভিজ্ঞতা সেহেতু সত্য কারণ (Vera Causes) হিসেবে এর চরিত্র সম্ভবত যুক্তিবিদ্যানুযায়ী অস্বীকার করা যায় না। তাই এটা প্রজ্ঞা ও বিশ্বাসের, বুদ্ধি ও স্বজ্ঞার এবং বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যবর্তী একটা সেতু বিশেষ"[৪৮]।

দেব সমন্বয়ী দর্শনের ভিত্তি খুঁজে পেয়েছিলেন ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা ও স্বজ্ঞার ধারণার ভেতরে। তিনি প্রজ্ঞা ও স্বজ্ঞার সম্পর্ককে একতরফা নির্ভরশীলতার সম্পর্ক মনে করেননি। বরং উভয়ই নিরপেক্ষ এবং নির্ভরশীলতার সম্পর্ক বলে অভিহিত করেছেন। এরিষ্টটলের মতে, বুদ্ধি দেয় স্বজ্ঞাকে জ্ঞানের আকার

Dhaka University Institutional Repository

আর স্বজ্ঞা দেয় বুদ্ধিকে এর উপাদান। এ প্রসঙ্গে দেব বলেন, কান্ট এবং হেগেলের ভ্রান্তির ধরন প্রায় অভিন্ন। যুক্তিউর্ধ্ব স্বজ্ঞার উপর নির্ভর না করে কান্ট যে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছেন হেগেলও বুদ্ধির উপর অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন করে একই রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। অন্যদিকে বার্গসোঁ স্বজ্ঞার উপর আস্থা স্থাপন সত্ত্বেও বুদ্ধি ও স্বজ্ঞার প্রকৃত মিলনস্থল দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে দেবের ভাবনা সামান্য ভিন্নমাত্রা সংযোজন করে। দেব মনে করেন, বাস্তবজীবনের ক্রিয়াশীল চেতনার অব্যাহত অনুভূতিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা ও স্বজ্ঞার সঙ্গমস্থলেই সম্ভবত যুক্তিউর্দ্ধ স্বজ্ঞার আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যমণ্ডিত ক্রিয়াশীলতা সুসমন্বিত হয়। দেব তাঁর Sense Reason and Intuition অধ্যায়ের Synthetic Idealism and a Broad-Based Theory of Knowledge শীর্ষক প্রবন্ধের শিরোনামে ভাববাদ সম্পর্কে বলেন, বাস্তবতার এরকম জোরালো, যুক্তিনির্ভর এবং সুসমন্বিত প্রত্যয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে ভাববাদ অবশ্যই তার সমগ্র জটিল গতিপথ পরিবর্তনপূর্বক প্রজ্ঞার মাধ্যমে ইন্দ্রিয় থেকে স্বজ্ঞায় উত্তরণ করবে। তিনি বলেন–

> "The watch word of true philosophy is synthesis. It consists neither in an over estimation nor in an under- estimation but in a proper assessment and adjustment of the contributions of our different organs to the knowledge of reality. Both realism and idealism seem to admit it in a general way[৪৯]".

তবে সামগ্রিক আলোচনায় স্বজ্ঞার প্রতি দেবের অধিক আগ্রহ একটি লক্ষণীয় বিষয়। কেননা দেবের চিন্তা-চেতনা, মৌলিকত্বে অতীতের দার্শনিক তত্ত্বের চুলচেরা বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে প্রজ্ঞার পরিসর, সীমাবদ্ধতা সবকিছুরই অর্ন্তভুক্তি অত্যন্ত জোরালোভাবে রয়েছে। তবে স্বজ্ঞাকে তিনি স্থান করে দিয়েছেন সর্বোচ্চে। তিনি বলেন যে, এককভাবে বুদ্ধি কিংবা অভিজ্ঞতা জীবনের বিশালত্ব সম্পর্কে ধারণা দিতে অপারগ। কেননা, শুধুমাত্র বুদ্ধির চর্চা একদিকে যেমন শুষ্ক ও বৈচিত্র্যহীন তেমনি অভিজ্ঞতায় জীবনের সমগ্রতা ধরা পড়ে না। অভিজ্ঞতার বিষয়গুলিতে প্রতিনিয়ত নতুন রূপের সংযোজন ঘটছে। যা ক্ষুদ্র ক্ষদ্র এবং বিচ্ছিন্নতার সমাহার। সুতরাং স্বজ্ঞাই এক্ষেত্রে একমাত্র উদ্ধারক। স্বজ্ঞার মধ্যেই প্রতিফলিত হয় বৈচিত্র্যময় ঐক্যের অভিব্যক্তি এবং সমগ্রের মাঝে পরিস্ফুটন ঘটে গতিশীল জীবনের সমৃদ্ধি এবং প্রশান্তি। অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী দেবের রচনা ভাণ্ডার

Dhaka University Institutional Repository

একদিকে যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর নিখুঁত দর্শনালোচনায় অন্যদিকে সুকঠিন যুক্তি–তর্ক এবং গ্রহণ-বর্জন ও সমন্বয়ের সুস্পষ্ট ও পরিশীলিত ধারারও প্রতিফলন ঘটেছে। এত বিশাল যার পাণ্ডিত্য তাঁর দর্শনের দুর্বল দিকের প্রতি মনোনিবেশ করা নিছক বাতুলতামাত্র। তদুপরি দেব দর্শনের খানিকটা সংযোজনে হোসনে আরা আলম বলেন, "প্রজ্ঞার উপর আক্রমণ চালিয়ে স্বজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠিত করলেও ড. দেবের দর্শন সম্পর্কে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, প্রজ্ঞার সীমাবদ্ধতা তিনি প্রজ্ঞা দিয়েই আবিষ্কার করেছেন; স্বজ্ঞার গুরুত্বও প্রমাণ করেছেন বুদ্ধির সাহায্যেই। কাজেই তার সমন্বয়ী দর্শন সম্পর্কে মন্তব্য করা চলে যে, এই দর্শন প্রজ্ঞানির্মিত স্বজ্ঞা নির্ভর দর্শন।"[৫০] ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা এবং স্বজ্ঞার আলোচনাতেই তিনি থেমে থাকেন নি। এরপর তিনি তাত্ত্বিক জগৎ থেকে নেমে এসেছেন বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার জগতে। বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার জগৎ নানা আয়োজনে ভরপুর। বেদনাক্লিষ্ট মানবজাতির পার্থিব এবং অপার্থিব জীবনে মুক্তির আস্বাদ পৌঁছে দেবার মন্ত্রে বলীয়ান হয়ে তিনি আর্বিভূত হন। দেব দর্শনে সাধারণ মানুষের কাঙ্ক্ষিত বর্ণিল জীবনের মাঝে শুধু আধ্যাত্মিক চেতনারই ডাক ছিলো না, ছিলো বৈষয়িক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়টিও। দেব আশা প্রকাশ করেছেন যে, তার দর্শন মানবজাতির বর্তমান সংকটে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে পারবে। তিনি বিশ্বাস করেন, চিরায়ত ভাববাদের প্রতি অনীহা পার্থিবজীবনে মানবতার সুখ-সমৃদ্ধি ও মঙ্গলের অন্তরায়স্বরূপ। তাঁর মতে, আত্মার পরিপূর্ণ বিশ্বাসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সফল জীবনের সোনালি ভবিষ্যৎ। দেব মনে করেন, সমন্বয়ী ভাববাদই একটি আদর্শ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গোড়াপত্তনপূর্বক এর যৌক্তিক ভিত্তি রচনায় সার্বিক সহায়তা প্রদানে সক্ষম।

দেব এভাবেই অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে জড়বাদের মিলন ঘটিয়ে ভবিষ্যৎ অগ্রগতিকে সুসমন্বিত রাখার প্রয়াস ব্যক্ত করেছেন। তাঁর বক্তব্যের স্পষ্ট প্রতিফলন এবং সমন্বয়ের প্রত্যয়টি জোরালোভাবে প্রকাশিত হয়েছে এভাবে–

> "In other words, a balanced and legitimate allegiance to sense, reason and intuition gives us, as against empirical idealism of Berkeley and pre-eminently logical idealism of the Hegelians, a new type of idealism which may aptly be called, because of its comprehensive character, synthetic."[৫১]

Dhaka University Institutional Repository

তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেবের এ সমন্বয় অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং প্রশংসার দাবি রাখে। সমন্বয়ের যে উদ্যোগ তিনি বাংলাদেশ দর্শনের প্রেক্ষাপটে গ্রহণ করেছিলেন প্রয়োগিক স্তরে এর কার্যকারিতা যথেষ্ট প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়ায়। তদুপরি দেবের মহত্ত্ব এবং হৃদয়ের বিশালত্বের কাছে এসব সীমাবদ্ধতা সহজেই অতিক্রান্ত হয়ে জ্ঞানের সুদূরপ্রসারী দীপ্তি বিশ্বঐক্য এবং সমৃদ্ধির দিগন্তকে উন্মোচিত করে। উল্লেখ্য, দেব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং দর্শনে এর প্রভাব নিয়েও যথেষ্ট শঙ্কিত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি জৈনদর্শনের একদল অন্ধলোকের হাতি দেখার অভিজ্ঞতা এবং হাতি সম্পর্কে তাদের খণ্ড খণ্ড ধারণা সম্বলিত গল্পটি চমৎকারভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "Naturally their estimation varied and could be settled only by taking a total view."[৫২] দর্শন সম্পর্কেও দেবের অভিমত এবং আশংকা এমনই, তিনি আধুনিক যুগের মানুষের জন্য দর্শনের একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে চেয়েছেন । সেখানে দর্শন শুধুমাত্র উষর, নিষ্ফলা মরুভূমির মতো বিরোধ বা বিতর্কে না জড়িয়ে জীবন এবং সত্তা সম্পর্কে সুসমন্বিত আদর্শিক এক রূপরেখা প্রণয়ন করবে। যার লক্ষ্য হবে ঔদার্য্যে, মহত্ত্বে, সহনশীলতায় এবং সর্বোপরি কর্মচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ অগ্রগতির এক অব্যাহত ধারা। এ প্রসঙ্গে দেব বলেন, "Philosophy to-day badly needs a total view of reality and life. There is no other way to rid it of barren and arid controversies and make it a synthetic gospel adequate to the complex needs of modern man.[৫৩]"

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ধর্ম-দর্শন দ্বারা প্রভাবিত দেব সর্বদর্শন সমন্বয়ে গড়ে তুলেছেন তাঁর মহান সমন্বয়ী দর্শন। প্রতিকূল আবহে নিজের জীবনকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তেমনি তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারাকেও এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছেন। দেবের সমন্বয় আক্ষরিক অর্থেই মৈত্রী এবং সম্প্রীতির এক অনবদ্য সমাহার। তিনি একথা স্বীকার করেছেন, জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের মধ্যে-গুণগত বৈষম্য আছে, স্ববিরোধিতা নেই যা প্রকাশ পেয়েছে Pakistan Philosophical Congress-এর ১৯৫৫ সালের করাচির দ্বিতীয় অধিবেশনে দেবের–'Logic and Metaphysics,'এর ভাষণে। সেখানে তিনি বলেছেন–

> "Thought it may sound paradoxical, synthetic idealism makes materialism Spiritualistic and Spiritualism materialistic. Judged from a correct perspective the overemphasis on the other

Dhaka University Institutional Repository

direction has failed humanity miserably through centuries, if not millenniums."[৫৪]

মানবতাবাদী এ দার্শনিকের মূললক্ষ্য ছিল সমষ্টিগত জীবনকে সুখী-সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তোলা। জীবনকেন্দ্রিক দর্শনে দেব জীবনেরই জয়গান গেয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন, মানবজীবনে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয় রূপেরই সমঞ্জসী সমাহার দর্শনের এক অনন্য অবদান। মানব প্রয়োজনের তাগিদে সেই প্রাচীনকাল থেকে তাত্ত্বিকভাবে দর্শনের শুরু ঘটলেও ব্যবহারিক জীবনে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। জগৎ জীবনের অবিরাম যাত্রাপথে কোনো একদেশদর্শী চিন্তা বা কর্ম যেমন কার্যকর নয় তেমনি জীবনকে সার্থক এবং সফল রূপায়ণে কোনো একপেশে দৃষ্টিভঙ্গিও ফলপ্রসূ নয়। দেবের দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছিলো বৈচিত্র্যময় মানবজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাওয়া-পাওয়াকে কেন্দ্র করে। তত্ত্বের কঠোরতা পরিহার করে দর্শন সম্পর্কে দেবের সঠিক উপলব্ধি জীবনবাদেরই নামান্তর। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন–

> "আন্তরিক অনুরাগের নিবিড় স্পর্শে, সার্থক দর্শনমাত্রই যে জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত, একথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। সে প্রয়োজনের তাগিদেই জড়বাদের উৎপত্তি, অধ্যাত্মবাদেরও উৎপত্তি। আর এই দুই-এর ভিতর আপোষ করার চেষ্টাও সেই একই প্রয়োজনে। আজকের দিনের মানুষের বৃহত্তর ঐহিক জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করবার জন্যে এই সমঞ্জসী দর্শনের বিশেষ প্রয়োজন একথা আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। যাদের কানের কাছে এই সত্যের অস্ফুট ধ্বনি এসে পৌঁছেছে আমি সেই অগণিত মানুষেরই একজন। তাই আমি যুক্তিবাদ অস্বীকার করি না, বিশ্বাসবাদকে অবজ্ঞা করি না– জীবনবাদই আমার প্রধান উপজীব্য, আমার জীবন-দর্শনের শেষকথা।"[৫৫]

মূলত জীবন ছাড়া দর্শনকে দেব অর্থহীন বলে মনে করতেন। আর সে কারণেই তিনি এর ব্যবহারিক ভিত্তি তৈরি করতে চেয়েছেন মানুষের জাগ্রত চেতনার মাঝে। এ চেতনার ডাক বিশ্বমানবতাকে শুভ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে সার্বিক সহায়তা প্রদানে সক্ষম। বিশ্বায়নের সর্বপ্রকার সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে উঠে দেবের জাগ্রত চেতনার বাণী এ অস্থির পতনোন্মুখ পৃথিবীতে সম্প্রীতির সুবাতাস ছড়াবে সন্দেহ নেই। তবে, তাত্ত্বিক পর্যায়ে দেবের এরকম প্রত্যাশা যুক্তির কষ্টিপাথরে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। আর

Dhaka University Institutional Repository

প্রায়োগিক পর্যায়ে এ দাবি কতটুকু কার্যকারিতা লাভ করবে সে ভাবনাও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। তদুপরিও বৈজ্ঞানিক এ বিশ্বব্যবস্থায় দেব দর্শনের গুরুত্বকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখার উপায় নেই বরং এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন ও তার ব্যবহারের আতঙ্কে সমগ্র বিশ্ব আজ আতঙ্কিত। আস্থাহীনতা বিরাজ করছে দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে। পুরো বিশ্ব আজ গোষ্ঠীগত বলয়ে বিভক্ত। পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন এবং এর পরীক্ষামূলক ব্যবহার আশংকাজনকভাবে বেড়ে চলেছে। চলমান পারমাণবিক অস্ত্র-সংক্রান্ত অনাস্থার প্রেক্ষাপটে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশংকাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। হানাহানি, সংঘাত, সন্ত্রাস, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হুমকি গ্রাস করে ফেলেছে পুরো বিশ্বকে। বর্তমান পারমাণবিক ও নিউক্লিয়ার যুগে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হলে এর তীব্রতা, ধ্বংসলীলা ও পরিণতি কি মারাত্মক হতে পারে তাঁর ইঙ্গিত দিয়েছেন দেব তাঁর *Aspirations of the Common Man* গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি বলেন–

> In this atomic, or more precisely, nuclear age, no country however strong its natural boundaries, can expect to remain safe in case of a world-conflagration. That would be a foolhardy as to imagine oneself safe under intoxication in a plague-stricken city. Nuclear age has its great lessons for war-mongers. It has little respect for the so-called victor and the vanquished. In fact, it is a great levelling down force. By its unimaginable ferocity, it hardly leaves any the least scope for a one-sided victory in war. Strangely enough, in this atomic race even the possession of a larger quantity of atomic weapons does not necessarily ensure security because by the help of a smaller quantity of these horrible engines of destruction, even the stronger party might be exterminated by the weaker. War in this atomic age has in it the grim possibility of total extinction."[৫৬]

বস্তুবাদী দুনিয়ায় বস্তুবাদী ও ভোগবাদী পরিবেশ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-নির্ভর বর্তমান পরিস্থিতিতে পার্থিব প্রয়োজনের মূল্য অধিক। বৈজ্ঞানিক যুগ মানুষের প্রয়োজনের মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছে নানাদিক থেকে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ রচিত হয়েছে মানুষের প্রয়োজনের নিরিখেই। বিজ্ঞানের

Dhaka University Institutional Repository

অভূতপূর্ব সাফল্য নিশ্চিত করেছে মানুষের সুখ-শান্তিময় জীবনধারা। কিন্তু না, এত প্রাচুর্য্যের মধ্যেও পৃথিবী আজ অশান্ত-অস্থির। হিংস্রতার দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বিশ্বময়। তথাকথিত যন্ত্রদানব সৃষ্ট শিল্পবলয়গুলো থেকে যে কার্বন নিঃসৃত হচ্ছে তা থেকে সৃষ্টি হয়েছে বিশ্ববিধ্বংসী ভয়ংকর এক পরিবেশ বিপর্যয়ের। যাকে আধুনিককালের পরিবেশবাদীরা বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ বলে দাবি করছেন। অথচ প্রকৃত অনাসৃষ্টিকারী শিল্পবলয়গুলোর নিয়ামক দেশগুলো যেন আজ নির্বিকার, নিশঙ্কচিত্ত। নীতিবোধ-মূল্যবোধের চরম সংকট গ্রাস করেছে বিশ্ব নৈতিকতাকে। নীতিবোধ বিবর্জিত মানুষ দিশেহারা হয়ে লক্ষ্যে পৌছুঁতে ব্যর্থ হচ্ছে। মানুষের এই লক্ষ্যহীন যাত্রাপথে দেবের দর্শন সঠিক অর্থেই কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে যদি আধ্যাত্মিক ঐক্য ও বিশ্বপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্বের সুনিবিড় বন্ধন মানুষের মধ্যে গড়ে তোলা যায়। সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে তৈরি করবে নৈতিক মূল্যবোধ। দৈহিক পরিপুষ্টি যেমন খাদ্য গ্রহণে আসে তেমনি আত্মিক পরিপুষ্টির জন্য প্রয়োজন হয় নৈতিকতার চর্চা ও কল্যাণের চর্চা। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্তার উন্নতিকল্পে দেব তাই চেয়েছিলেন সমন্বয়ের ধারণাকে মানুষের বাস্তবজীবনে প্রতিফলন ঘটাতে। ধর্ম-দর্শন, বিজ্ঞানের আদর্শে উজ্জীবিত মানুষ সর্বজনীন প্রেম ও বিজ্ঞানের শক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে এক কল্যাণকামী বিশ্বরাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটাবে। এটাই ছিল মনীষী দেবের আজন্ম লালিত স্বপ্ন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূচি

১. কল্যাণচন্দ্রগুপ্ত ও অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ধর্মদর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, জুলাই, ১৯৯০/ই, পৃ. ২

২. মোহাম্মদ নূরনবী অনুবাদিত, *সাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষা*, মূল ড. জি.সি.দেব, গ্রীন বুক হাউস লিঃ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ২৯

৩. Dr. G.C. Dev, *The Philosophy of Vivekananda and the Future of Man,* Ramakrishna Mission, Dacca, 1963, p.76

৪. Brightman, *A Philosophy of Religion,* Prientice Hall, New York, 1954, p. 13

৫. ড. প্রদীপ কুমার রায়, "গোবিন্দদেবের বাংলা প্রবন্ধঃ একটি মূল্যায়ন", *দর্শন ও প্রগতি*, ১৪ শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ১৭৬

৬. G.C. Dev, *Buddha: The Humanist,* Paramount Publishers, Dacca, Karachi, Lahore, 1969, p. 29

৭. ড. প্রদীপ রায় সম্পাদিত, *'গোবিন্দচন্দ্র দেব, জীবন ও দর্শন'*, নির্ঝর প্রেস, ঢাকা ১৯৯১, পৃ. ২৬

8. Hasan Azizul Huq (ed), *Works of Govinda Chandra Dev,* Vol.1, Bangla Academy, Dacca, 1980, p. 235

৯. G.C. Dev, *Buddha: The Humanist,* Paramount Publishers, Dacca, Karachi, Lahore, 1969, p. 66

১০. ড. প্রদীপ রায় সম্পাদিত ও সংগৃহীত, "*গোবিন্দচন্দ্র দেব, অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা*", বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৯

১১. G.C. Dev. *Aspirations of the Common Man,* University of Dacca, 1963, p. 463-464

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭

১৩. হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত, *আমার জীবন-দর্শন, গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলী*, (তৃতীয় খণ্ড) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ১২

১৪. মোহাম্মদ নূরনবী অনুবাদিত, মূলঃ ড. জি.সি. দেব, *সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা*, গ্রীন বুক হাউস লিঃ, ১৯৮৩, পৃ. ১৫

১৫. G.C. Dev *Buddha: The Humanist*, Paramount publishers. Dacca, Karachi, Lahore, 1969. p. 49

১৬. Hasan Azizul Huq (ed), *Works of Govinda Chandra Dev,* Vol.1, Bangla Academy, Dacca, 1980, p. 479

১৭. আমিনুল ইসলাম, *গোবিন্দচন্দ্র দেবঃ জীবন ও দর্শন*, বাংলাবাজার, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

১৮. হোসনে আরা আলম অনুবাদিত, *ভাববাদ ও প্রগতি*, মূল: ড. জি.সি. দেব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. তের।

১৯. হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত, *আমার জীবন-দর্শন, গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলী*, (তৃতীয় খণ্ড) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ৩১

২০. G.C. Dev, *The Philosophy of Swami Vivekananda and the Future of Man*, Ramakrishna, Mission, Dacca, Pakistan, 1963, p. 5-6

২১. উদ্দীপন, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১১৯

২২. G.C. Dev, *The Philosophy of Swami Vivekananda and the Future of Man*, Ramakrishna, Mission, Dacca, Pakistan, 1963, p. 74

২৩. ড. প্রদীপ কুমার রায়, "গোবিন্দদেবের বাংলা প্রবন্ধ: একটি মূল্যায়ন", *দর্শন ও প্রগতি*, ১৪ শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ১৭৭

২৪. হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত, *আমার জীবন-দর্শন, গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলী*, (তৃতীয় খণ্ড) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ৪১

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

২৮. G.C. Dev, *Buddha: The Humanist*, Paramount Publishers, Dacca, Karachi, Lahore, 1969, p. 39

২৯. নীরুকুমার চাকমা, *বুদ্ধ: ধর্ম ও দর্শন*, প্রথম অবসর প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৮৩

৩০. G.C. Dev, *Buddha: The Humanist*, Paramount Publishers, Dacca, Karachi, Lahore 1969, p. 28

৩১. হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত, *আমার জীবন-দর্শন, গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলী*, (তৃতীয় খণ্ড) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ৪৭

৩২. ড. প্রদীপ কুমার রায়, "গোবিন্দদেবের বাংলা প্রবন্ধ: একটি মূল্যায়ন", *দর্শন ও প্রগতি*, ১৪ শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ১৮৮

৩৩. ড. প্রদীপ রায় সম্পাদিত ও সংগৃহীত, *"গোবিন্দ চন্দ্র দেব, অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা"*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১২২

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৭

৩৫. Hasan Azizul Huq (ed), *Works of Govinda Chandra Dev,* Vol.1, Bangla Academy, Dacca, 1980, p. 400

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত, "*তত্ত্ববিদ্যা সার*", গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলী, (তৃতীয় খণ্ড) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ৮৯

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩

৪০. মালবিকা বিশ্বাস, "গোবিন্দ দেবের দৃষ্টিতে গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর দর্শন", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা ৮৮, জুন ২০০৭, আষাঢ়, ১৪১৪, পৃ. ৮

৪১. হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত, "*তত্ত্ববিদ্যা সার*", গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলী, (তৃতীয় খণ্ড) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ১০৫

৪২. হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত, *আমার জীবন-দর্শন, গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলী,* (তৃতীয় খণ্ড) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ১০

৪৩. Hasan Azizul Huq (ed), *Works of Govinda Chandra Dev,* Vol.1, Bangla Academy, Dacca, 1980, Introduction, p.1

৪৪. G.C. Dev, *Buddha: The Humanist*, Paramount Publishers, Dacca, Karachi, Lahore1969, p. 155

৪৫. ড. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস সম্পাদিত *"জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি: গোবিন্দচন্দ্র দেব: জীবন ও দর্শন"*, অবসর প্রকাশনা, জুলাই ২০০৮, পৃ. ১২০

৪৬. হোসনে আরা আলম অনুবাদিত, *ভাববাদ ও প্রগতি*, মূল: ড. জি. সি. দেব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮,পৃ. ত্রিশ-একত্রিশ

৪৭. মালবিকা বিশ্বাস, "গোবিন্দ দেবের সংস্কৃতচর্চা ও তার প্রাসঙ্গিকতা", *দর্শন ও প্রগতি*, ২৪শ বর্ষ, ১ম ও ২ য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, ২০০৭, পৃ. ১৫৯ ।

৪৮. হোসনে আরা আলম অনুবাদিত, *ভাববাদ ও প্রগতি*, মূল: ড. জি. সি. দেব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮,পৃ. একত্রিশ

৪৯. Hasan Azizul Huq (ed), *Works of Govinda Chandra Dev,* Vol.1, Bangla Academy, Dacca, 1980, p. 314

৫০. হোসনে আরা আলম অনুবাদিত, *ভাববাদ ও প্রগতি*, মূল: ড. জি. সি. দেব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮,পৃ. পনর-ষোল

৫১. Hasan Azizul Huq (ed), *Works of Govinda Chandra Dev,* Vol.1, Bangla Academy, Dacca, 1980, p. 314

৫২. Ibid., p. 315

৫৩. Ibid., p. 315

Dhaka University Institutional Repository

৫৪. কাজী নূরুল ইসলাম ও প্রদীপ কুমার রায় সম্পাদিত, "*দেব স্মারক বক্তৃতামালা, ১৯৮১-১৯৯৯*",গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জুলাই ২০০১, পৃ. ৬৬

৫৫. হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত, *আমার জীবন-দর্শন*, *গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলী*, (তৃতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ৪০

৫৬. Hasan Azizul Huq (ed), *Works of Govinda Chandra Dev,* Vol.1, Bangla Academy, Dacca, 1980, p. 412

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

দেবের দার্শনিক তত্ত্ব

৩.১ অধিবিদ্যা

৩.২ জ্ঞানবিদ্যা

৩.৩ দেবের শিক্ষাদর্শন

Dhaka University Institutional Repository

দেবের দার্শনিক তত্ত্ব

ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা এবং স্বজ্ঞার আলোচনা দেব দর্শনের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাঁর সমগ্র দার্শনিক আলোচনা আবর্তিত হয়েছে এই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, দেবের *ভাববাদ ও প্রগতি* গ্রন্থটি যথার্থ অর্থেই মৌলিক এবং এর দার্শনিক তাৎপর্য অনেক গভীর এবং গুরুত্বপূর্ণ। দেবের অন্যান্য রচনায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্যের সহজ-সরল ও সদাহাস্যরসে পরিপূর্ণ একজন প্রসন্ন ব্যক্তিকে। কিন্তু তাঁর "ভাববাদ ও প্রগতি" গ্রন্থটি একমাত্র ব্যতিক্রম। যেখানে আয়াস-সাধ্য চটুলতার কোনো ছোঁয়াচ নেই, বরং রয়েছে গভীর জটিল জ্ঞানগর্ভ যুক্তির কুট-কৌশল। পুরো এ গ্রন্থটিতে তিনি তাঁর দর্শনের নির্যাস বের করে আনার প্রয়াস পেয়েছেন। তত্ত্বের জাল বুনে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন পুরনো ভাববাদকে কিভাবে সূক্ষ্ম যুক্তির বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে নবরূপে আবিষ্কার করা যায়। সকল রকমের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে তিনি সক্ষম হয়েছেন ভাববাদের নতুন দিক-নির্দেশনা দিতে। তিনি দেখিয়েছেন, ভাববাদ কোনোভাবেই প্রগতির অন্তরায় নয়, বরং সর্বতোভাবেই সহায়ক। ভাববাদীয় গতানুগতিকতা পরিহার করে এটিকে জীবন-উপযোগী করে তোলার সমস্ত চেষ্টাই তিনি করেছেন এই গ্রন্থে। স্বাভাবিক মানবধর্মে বিশ্বাসী এই মহামনীষী মানবকল্যাণের লক্ষ্যেই এগিয়ে গেছেন যদিও প্রজ্ঞা, স্বজ্ঞা, পরমসত্তার মতো মৌলিক বিষয়াবলী তার দর্শনের মূল সমস্যা। শুধু তত্ত্বালোচনাই নয়, জীবনের প্রয়োজনে, মানবতার প্রয়োজনে এ পৃথিবীর মানুষকে মাটির কাছাকাছি আনতে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় কিছুই তার চলার গতিরোধ করতে পারেনি। পারেনি মৃত্যুর ভয়াল হাতছানিও। তাইতো আজও তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাঁরই অনুসারী স্বনামধন্য ছাত্রছাত্রীরা দর্শনের কল্যাণে, সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন প্রসন্নচিত্তে। দর্শনে ভাববাদকে অকার্যকর করার কৌশল হিসেবে অর্থনৈতিক বিষয়টিকে নানাদিক থেকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। দেখানো হয় জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির সপক্ষে যারা কাজ করেন তারা ভাববাদের তীব্র সমালোচক। কিন্তু দেব ভাববাদের সমর্থক হিসেবেই অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন সর্বাগ্রে। পারিবারিক আবহ থেকে দারিদ্র্যের যে কষাঘাত তাঁর বাল্য-কৈশোর জীবনে অঙ্কিত হয়েছিলো সেই বাস্তবতার নিরিখেই তিনি সাধারণ

Dhaka University Institutional Repository

গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়টিকে অত্যন্ত তীব্রভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তো তিনি খুব সহজ করেই বলতে পেরেছেন–

> "আমার বাবাই তাঁর নিজের অজ্ঞাতে এবং আমারও অজ্ঞাতে শৈশবের সেই অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যেই আমার চিত্তে জড়বাদের বীজ বপন করেছেন। সে বীজ থেকে আস্তে আস্তে যে ছোটগাছ বেরিয়ে আজ মনের ভেতর শিকড় গজিয়ে ডালপালা বিস্তার করেছে, তাকে কেটে ফেলার সামর্থ্য আমার নেই। অন্যদিকে, যে মহানুভব পুরুষদের সংস্পর্শে এসে বাল্য-যৌবনের সন্ধিক্ষণে অধ্যাত্মবাদের বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছিল তাও আমার জীবনের এক বড় পাথেয়। কাজেই জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের দ্বন্দ্বকে যে আমি অলীক বলি, আর কখনো কখনো বা বলি জড়বাদ আর অধ্যাত্মবাদ একই জীবন-দর্শনের এপিঠ আর ওপিঠ, তার মূলে রয়েছে আমার বাল্যের ও যৌবনের অনুপ্রেরণাদায়ক এই দুটি পরস্পর বিরোধী মনোবৃত্তি ও অনুভূতি।"[১]

অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এই জ্ঞানতাপসের রচনাশৈলী তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যকেই প্রকাশ করে। দেবের চিন্তা-চেতনার স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা এবং জটিল তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করার অসাধারণ ক্ষমতা সত্যিই বিস্ময়কর। তাঁর দর্শনচর্চার লক্ষণীয় বিষয় ছিলো সামগ্রিকভাবে জগৎ-জীবনের স্বরূপ অন্বেষা, দর্শনের নিগুঢ় তাৎপর্য আবিষ্কার- উপলব্ধি ও সর্বোপরি মনুষ্য সমাজে এর সার্থক বাস্তবায়ন। দর্শনের জটিল তত্ত্বের সহজ সরল বিশ্লেষণের পাশাপাশি তিনি মনোযোগী হয়েছেন রক্তে-মাংসে গড়া জীবন্ত মানবসত্তার কল্যাণে। মানবভাবনা দেব-দর্শনের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে, আলোকিত করেছে, মর্যাদাবান করেছে পৃথিবীর সমগ্র মানব সম্প্রদায়কে। যেখানে ধর্ম, বর্ণ, উঁচু-নিচু, ধনী দরিদ্রের কোন ভেদাভেদ নেই। তিনি মাটির পৃথিবীর সকল গোষ্ঠী, সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে একই আদর্শে উজ্জীবিত করার জন্যে আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে গেছেন তাঁর 'সমন্বয়ের' মাধ্যমে। 'এক বিশ্বের' স্বপ্নই ছিলো তাঁর দার্শনিক চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। বস্তুবাদী ও বিজ্ঞানবাদী এই বিশ্বে মানুষের বৈষয়িক ও আত্মিক মুক্তি একাধারে সম্ভব নয়। এজন্য তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেছেন মানুষকে সত্যিকার অর্থে মুক্ত করতে হলে প্রয়োজন বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদের 'সমন্বয়'। তিনি তাঁর দর্শনে সমন্বয়-কে নতুনরূপে, নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করার সব রকমের প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। যেখানে মৌলবাদ, ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার, বর্ণবাদ, অস্পৃশ্যতার কোনো স্থান নেই। সেই সমন্বয়ের লক্ষ্য হবে সার্বিক মানবকল্যাণ, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ সর্বোপরি গণমানুষের মুক্তির বারতা।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১ অধিবিদ্যা

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার মানবকুল মননে-মজ্জায় আগাগোড়াই এক কৌতুহলোদ্দীপক প্রাণী। এই ব্যাপক কৌতুহল প্রবণতাকে তৃপ্ত করতেই রচিত হয়েছে দর্শন, তথা নানা মত নানা পথ। গোবিন্দদেব তাঁর স্বভাবসুলভ জিজ্ঞাসু প্রবণতার ভিত তৈরি করতে পেরেছিলেন প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দার্শনিক ভাবনার নির্যাস থেকে। দেবের দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে, মতামত প্রদানেও প্রাচ্য-প্রতীচ্য ধারার অব্যাহত প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য এ অধ্যায়ে আমরা দেবের দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনার চেষ্টা করবো। প্রথম অধ্যায়ে দেবের জীবন ও কর্ম আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেবের ধর্ম, বিজ্ঞান এবং দর্শন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে দেবের দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনায় তাঁর মূল আলোচ্য বিষয় অধিবিদ্যা বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করবো। দেবের পরমসত্তার ধারণা মূলত আবর্তিত হয়েছে স্বজ্ঞার ধারণার উপর ভিত্তি করে। দেব প্রজ্ঞা এবং স্বজ্ঞার ধারণার সমন্বয়ে পরমসত্তার ধারণাকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন বটে, তবে স্বজ্ঞার উপর দেবের দুর্বলতা ছিল যথেষ্ট। স্বজ্ঞা সম্পর্কিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেব করেছেন। জ্ঞানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে জ্ঞাতার অন্তর্ভুক্তিকেও তিনি জরুরি মনে করেছেন। হেগেলের বুদ্ধিবাদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, পরমতত্ত্বের জ্ঞানলাভ তখনই সম্ভব যখন বিষয় এবং বিষয়ী পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। পরবর্তীতে, এই একাত্মতার চরম পর্যায়ে বুদ্ধির গুরুত্বকে একটুও হ্রাস না করে, স্বজ্ঞায় উত্তরণ ঘটানো সম্ভব বলে দেব মনে করেন। এ প্রসঙ্গে দেব বলেছেন : "Supralogical intuition is immediate apprehension of a supernatural character through supernatural means and negatively, it can be characterised as beyond common reach."[২]

সত্তা সম্পর্কে দেবের অভিমত হলো, এটি নিজ আলোকেই উদ্ভাসিত। সত্তার সম্ভাবনাকে চিন্তা ক্রিয়ার মাঝে সীমাবদ্ধ রাখতে দেব নারাজ। এজন্য তিনি বলেন, চিন্তায় যে সত্তার ধারণা পরিব্যাপ্ত হয় তা পুরোপুরি অজ্ঞেয়। যুক্তিউর্ধ্ব স্বজ্ঞায় সত্তার ধারণার যে উত্তরণ তাকে দেব জ্ঞেয়তার দিকে ক্রমবর্ধমান সফল এবং সুস্পষ্ট পদক্ষেপ বলে মনে করেন। দেব ব্যক্তি ও সমাজের সাথে সম্পর্কিত করে সত্তার আলোচনা এগিয়ে নিয়েছেন বহুদূর। তিনি সত্তা প্রসঙ্গে বৈদান্তিক মত তথা শংকরের

Dhaka University Institutional Repository

মনোভাবের প্রতিও গুরুত্বারোপ করেছেন। শংকর সত্তার চরম উপাদানরূপে অনির্দিষ্ট পরমের ধারণার প্রতি প্রগাঢ় আনুগত্য সত্ত্বেও অভিজ্ঞতাবাদীয় অসত্তাকে নিষ্প্রয়োজন জ্ঞানে উড়িয়ে দেননি। দেব শঙ্করাচার্যকে শুধু একজন নিষ্ক্রিয় চিন্তাবিদ হিসেবেই নয় বরং সক্রিয় এক মহান সংস্কারক হিসেবে মূল্যায়িত করেছেন। এ প্রসঙ্গে দেবের বক্তব্য হলো, "নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্নতামুক্ত পরমের ধারণার উপর অবশ্যই সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্বারোপ করতে হবে এবং এর ভিন্নতামুক্ত পটভূমির সাথে এটা অবশ্যই অভিজ্ঞতার বিচিত্র দৃশ্যাবলীর চরম অসত্তা এবং সসীম আত্মার অভিন্নতার প্রতি পথনির্দেশ করবে।"[৩] প্রজ্ঞার অতিমূল্যায়ন দেব কখনোই সমর্থন করেন না। কেননা প্রজ্ঞার কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বিশৃঙ্খল প্রকৃতির। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সবকিছুই সদা পরিবর্তনশীল, আর এজন্য তা সামঞ্জস্যপূর্ণ বা সুশৃঙ্খল নয়। কেননা, অভিজ্ঞতার জগতের বিচিত্রিতা প্রতিনিয়ত নতুন পথের বাঁকে বাঁকে সুদৃঢ় অবস্থান তৈরি করে চলেছে। সৃষ্টি হচ্ছে নতুন তথ্য, নতুন তত্ত্ব। তাত্ত্বিক-বিশ্লেষণী পর্যায়ে 'অস্তিত্ব'-অনস্তিত্ব', 'হয়'এবং 'হয় না' এসবের সংগঠনগত জটিলতার বেড়াজালে পরিবর্তনটা সম্পূর্ণ অসংলগ্ন এবং এলোমেলো। ফলে, প্রজ্ঞা নিজেকে সুসমঞ্জস এবং খাপ খাওয়ানোর তাগিদেই স্থায়ী একত্বতত্ত্বের মাঝেই বাস্তবসত্তার উপস্থিতি অনুসন্ধান করে। দেব ব্রাডলির 'প্রতিভাস' ও 'সত্তা' বিষয়ক মতবাদকে অভিজ্ঞতার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করেন। এবং দেবের মতে, ব্রাডলির এমন ধারণা তাকে যুক্তিবিদ্যা থেকে বিদায় গ্রহণের পথ সুগম করে দেয়। দেব বলেন, "খাঁটি যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে, পুরোপুরি বৈপরীত্যবর্জিত আত্ম-সামঞ্জস্য হলো সত্তা। কিন্তু অভিজ্ঞতার তুলাদণ্ডে বিচার করলে এটা অবশ্যই শূন্য বলে প্রতীয়মান হবে।"[৪] তবে দেব একথাও স্বীকার করেছেন যে, দর্শনের চিরাচরিত বিতর্ক সত্ত্বেও একথা দার্শনিকরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, এর প্রারম্ভিক পর্যায়ের সূচনা হয়েছিল অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যময় বাস্তবতা থেকে। আর প্রজ্ঞার নিরঙ্কুশ বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমেই অভিজ্ঞতা পূর্ণতা লাভ করে। দেবের মতে, অভিজ্ঞতার ভূমিকা অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠে সাম্প্রতিক সময়ের বৈজ্ঞানিক উপাত্তসমূহের উপর অধিক গুরুত্বারোপের বিষয়গুলো থেকে। সত্তার প্রকৃতি নিরূপণের মতো দর্শনের মৌলিক সমস্যাদি সমাধানের স্বার্থেই সাধারণত এটাও মনে করা হয়ে থাকে যে, অভিজ্ঞতাই দার্শনিক বিশ্লেষণের উপাত্তসমূহ অবিরামভাবে তৈরি করে যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

দেব অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই বিশ্বাস করেন, "সব রকমের অভিজ্ঞতাই, যদি তা ন্যায়সঙ্গতভাবে অভিজ্ঞতা বলে বিবেচনা করা যায়, তবে তা দর্শনের উপাত্ত হবে এবং কোন দর্শনেরই সেগুলোকে গোড়া থেকেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজস্ব আরোহ প্রণালীতে অগ্রসর হবার কোনও অধিকার নেই।"[৫] দেব পরমসত্তার প্রকৃতি নির্ধারণ প্রজ্ঞার জন্য রক্ষিত আছে বলেও মন্তব্য করেন। বলা হয়ে থাকে, প্রজ্ঞার বিশ্লেষণ পদ্ধতি অভিজ্ঞতাকে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সমন্বয় সাধনে সহায়তা করে। তিনি নির্ভুল তত্ত্ববিদ্যা গঠনে প্রজ্ঞা ও ইন্দ্রিয় এই উভয়ের উপরই গুরুত্বারোপের কথা বলেছেন। তিনি বলেন, সত্তার ধারণায় পৌছুঁতে উভয়েরই অবদান অনস্বীকার্য। সমসাময়িক দর্শনে ইন্দ্রিয়ের প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্যকেও দেব ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেননি। অভিজ্ঞতাবাদীরা অপরিবর্তনশীল ঐক্যের ধারণাকে অগ্রাহ্য করে ইন্দ্রিয়কেই সত্তার জ্ঞানলাভের উপায় হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

অন্যদিকে একত্ববাদে, প্রজ্ঞা একটা সর্বগ্রাহী সংশ্লেষণ; পক্ষান্তরে, বহুত্ববাদে সংশ্লেষণের বিভিন্ন প্রকার আছে। সত্তার ধারণা গঠনে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা এবং স্বজ্ঞাপ্রসূত অভিজ্ঞতাকে অভিন্নমাত্রা প্রদান করা যাবে না। অবশ্য, দর্শনে স্বজ্ঞার প্রতি এরূপ নির্ভরশীলতা তৈরি হয়ে থাকে বুদ্ধির অক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আবশ্যিকভাবেই সমর্থন প্রদর্শন করে। এছাড়া, দর্শনের যেকোনো শাখার প্রতি এরূপ আবেদন সঙ্গতকারণেই অনাবশ্যক বলে বিবেচিত হবে। এ কারণেই দেব বলেন, "বুদ্ধিবাদ ও স্বজ্ঞাবাদের মধ্যে যে বিতর্ক তা বুদ্ধির জ্ঞানগত চরিত্রের স্বীকৃতি-অস্বীকৃতি অপেক্ষা যুক্তিউর্ধ্ব স্বজ্ঞার জ্ঞানগত চরিত্রের স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির উপর অধিকতর নির্ভরশীল।"[৬] দেব মনে করেন, প্রজ্ঞা ও ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতা সত্তার জ্ঞানের ক্ষেত্রে সংকটের সৃষ্টি করে। তিনি একথাও বলেছেন, পরমসত্তা সম্পর্কীয় হেগেলের ধারণা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। হেগেল পরমসত্তাকে বাস্তবজগতের সাথে সুসমন্বিত করে এর মূর্ত প্রতীয়মান রূপদানে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু হেগেলের এমন প্রচেষ্টাও সফল হয়নি। কেননা বৈচিত্র্যময় ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার জগৎ সামগ্রিক সত্তার বাস্তবরূপ প্রদানে কখনো সক্ষম নয়। কারণ, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার জগৎ সর্বসম্মত কোনো পরমসত্তার জ্ঞানদানে সমর্থ নয়। দেব

Dhaka University Institutional Repository

মনে করেন, শুদ্ধসত্তা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে ঐক্য স্থাপনের একমাত্র উপায় হচ্ছে 'সমন্বয়ী ভাববাদ'। সমন্বয়ী ভাববাদই পারে ব্যক্তি তথা সমষ্টির ব্যাপক প্রয়োজন মেটাতে। তিনি বলেন–

> "প্রজ্ঞা ও ইন্দ্রিয়ের সমন্বয় যদি হয় সমন্বয়ী ভাববাদের প্রথম শর্ত, তাহলে এর দ্বিতীয় শর্ত হবে প্রজ্ঞার বিশুদ্ধ একত্বের ধারণাকে অস্তিত্বশীল করার জন্য বুদ্ধি থেকে স্বজ্ঞায় গমন করা। দেব বিশ্বাস করেন যে, জ্ঞানে পৌঁছানোর জন্য ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা ও স্বজ্ঞা নামে যে তিনটি সড়ক রয়েছে সেগুলোর সঙ্গমস্থলেই সম্ভবত যুক্তিউর্ধ্ব স্বজ্ঞার বিষয়গত দিকটি অবস্থান করছে। খাঁটি একত্বের স্বজ্ঞাই কেবল এই দাবি মেটাতে পারে। এতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গত দিক ও প্রজ্ঞার আবশ্যকতা দুই-ই আছে।"[৭]

দেব সত্তার ধারণাকে আপেক্ষিক বহুগুণের ভিত্তিবস্তু হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তার অতিপ্রাকৃতিক চরিত্রের প্রকাশকরূপে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সমন্বয়ের মাধ্যমে অ-আপেক্ষিক অভিন্নতার প্রতিচ্ছবি হিসেবে দেব সত্তার স্থান নির্ধারণ করেছেন। এমন পর্যায়কে দেব, দর্শনের দাবি মিটানোর প্রতি পুরোপুরি সুবিচার বলেও দাবি করেন। দেব যুক্তিউর্ধ্ব স্বজ্ঞাকে অতিপ্রাকৃতিক উপায়ে অতিপ্রাকৃতিক চরিত্রের একটা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বলে বর্ণনা করাটা অধিকতর সঙ্গত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে, এ ধরনের স্বজ্ঞাপ্রসূত অভিমতকে দেব বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের ধরা- ছোঁয়ার বাইরে বলেও মন্তব্য করেন। দেব সত্তার ধারণা গঠনে মানববোধের দুর্বল দিকটিকে চিহ্নিত করে বলেন, চিন্তার খোরাক হিসেবেই সত্তার ধারণা অধিকতর সম্ভাবনাময়। মানুষ তার চিন্তাশক্তির কার্যকারিতাকে সত্তার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত করবে এটাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। তবে চূড়ান্ত সত্তায় উত্তরণের যে বাস্তব প্রতিকৃতি তা এই দুর্বলবোধ সম্পন্ন সসীম মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

শেষ বিশ্লেষণে দেব অ-আপেক্ষিক পরমসত্তাকে আপেক্ষিক পরমসত্তার অবলম্বন হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে দেবের বক্তব্য হল–

> "This is a 'somehow' which intellect can understand in a general way but which neither sense nor supra-logical intuition can apprehend. This constitutes Maya, the great mystery of the universe, whose grasp one can transcend but whose nature one can never exactly unravel."[৮]

Dhaka University Institutional Repository

দেব তাঁর সমন্বয়ী দর্শন গঠন করতে চেয়েছেন এক অনুপলব্ধ আদর্শ অর্জনের মধ্যে দিয়ে। তিনি অভিজ্ঞতাবাদীয় বৈচিত্র্যের মধ্যে এক অভিন্নতা তত্ত্বের সন্ধান করেছেন। তাঁর পরমসত্তা যুক্তিউর্ধ্ব স্বজ্ঞায় খাঁটি একত্বতত্ত্বের এক আত্মসমঞ্জস নীতি। যুক্তিউর্ধ্ব স্বজ্ঞার সহায়তায় খাঁটি একত্বের অনুভূতি যখন পরমসত্তার ধারণায় পরিগণিত হয় তখন যৌক্তিক বিচারে ইন্দ্রিয় ও বৌদ্ধিক আবেদনের প্রত্যয়গত বিষয়টি দ্বারা একটি সমন্বয়ী তত্ত্ববিদ্যক ধারণা গঠন তেমন জটিল কিছু নয় বলে দেব মনে করেন। ইন্দ্রিয়ের দর্শনকে নিত্য পরিবর্তনশীলতার দর্শন এবং প্রজ্ঞার দর্শনকে খাঁটি অভিন্নতার দর্শন বলেও অভিহিত করা যায়। সুতরাং, দেবের সমন্বয়ী দর্শনের সারমর্ম হলো ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞার আপাতঃ প্রতীয়মান পরস্পর বিরোধী ধারণার অবিচ্ছেদ্য যৌক্তিক সমন্বয়ের স্বীকৃতি। তত্ত্ববিদ্যা গঠনের ক্ষেত্রে দেব তাঁর সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি যথেষ্ট আস্থাশীল এবং যত্নবান ছিলেন। তিনি মনে করেন, বৈচিত্র্যময় বহুত্বের জগতে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিসঞ্জাত জ্ঞানই শুদ্ধসত্তার রহস্য উদ্‌ঘাটনে অন্তত ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এক্ষেত্রে সমপদমর্যাদাসম্পন্ন ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সমন্বিত প্রয়াস চূড়ান্ত একত্বতত্ত্বেরই ইঙ্গিত প্রদান করে। আর নির্ভুল তত্ত্ববিদ্যা গঠনে উভয়ের অবদানকেই দেব যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেন। তবে এ প্রসঙ্গে তিনি কান্টীয় তত্ত্ববিদ্যাকে স্বীকার করে নিয়েছেন যা সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ মন্তব্য করেন কান্টীয় ফর্মূলার 'সর্বজনীনতা' ও 'অনিবার্যতাকে' পরোক্ষভাবে দেব তাঁর অধিবিদ্যায় গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন–

> "এক্ষেত্রে প্রশ্ন করা যেতে পারে, যে স্বজ্ঞার মাধ্যমে দেব এতগুলো সমস্যার সমাধান আবিষ্কার করেছেন, সেগুলো কি সার্বজনীন ও অনিবার্য বিষয়? দেব স্বজ্ঞাকে সার্বজনীন ও অনিবার্য বলে গ্রহণ করেছেন, তার সপক্ষে কোনো যুক্তির অবতারণা করেন নি। মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, স্বজ্ঞা ব্যক্তিকেন্দ্রিক এজন্য তাকে অনিবার্য বলা যায় না। একথা অবশ্য সত্যি যে কান্ট স্থান-কাল সম্পর্কিত যে স্বজ্ঞার বর্ণনা দিয়েছেন তা' সত্যিই সার্বজনীন ও অনিবার্য। তবে ব্যক্তি বিশেষের জীবনে যে স্বজ্ঞার ক্রিয়াশীলতা দেখা দেয় তা' স্বভাবত ক্ষণিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এক্ষেত্রে বার্গসোঁ স্বজ্ঞার যে সার্বিকরূপ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন, তাতে তাঁর অনিবার্যতা প্রমাণিত হয় নি। এজন্য রাসেল সত্যিই মন্তব্য করেছেন, স্বজ্ঞার যে কোনো ফলকে বুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা করতে হবে এবং বিচারের সর্বশেষ কর্তা হচ্ছে বুদ্ধি।"[৯]

Dhaka University Institutional Repository

দেব সত্তার বাস্তবতা বিধানে বুদ্ধির অক্ষমতাকে প্রতিপাদন করেন। তিনি মনে করেন, বুদ্ধি মানুষের সাধারণ গুণ কিন্তু স্বজ্ঞা অপরাপর গুণের মতো মানুষের একটা অর্জিত গুণ। স্বজ্ঞা সম্পর্কিত বার্গসোঁর উক্তিও স্বজ্ঞার উপর বুদ্ধির প্রাধান্য প্রতিপাদন করে। বার্গসোঁর মতে, স্বজ্ঞাকে তৈরি দ্রব্যরূপে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলে স্বজ্ঞার প্রতি অনীহা প্রকাশেরও কোনো কারণ নেই। কেননা সার্বিক মূল্যায়নে প্রতীয়মান হয় যে, বুদ্ধির চেয়ে স্বজ্ঞা অনেক বেশি কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, স্বজ্ঞার বিরোধ নিরসনে বুদ্ধি অগ্রগামী হলেও বুদ্ধির অন্তর্নিহিত অপূর্ণতা স্বজ্ঞার দ্বারাই সাধিত হয়। সর্বজনীনতা ও অনিবার্যতা থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধির বিষয়গত কোনো ভিত্তি নেই। অন্যদিকে অভিজ্ঞতার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্যের যে বিষয়গততা রয়েছে তা সূক্ষ্ম বুদ্ধিগত সংগঠনে ধরা পড়ে না। সুতরাং, বুদ্ধি তার অকাট্য চরিত্রকে প্রতিপাদন করতে এর পরমমানের বিষয়নিষ্ঠতার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে। কিন্তু দেবের মতে, এমন অকাট্যতা বুদ্ধির একার পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়। ফলে বুদ্ধি নিজের উত্তরণ ঘটাতে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত প্রকারের বুদ্ধির দিকে যে উল্লম্ফন ঘটায় তাকে 'স্বজ্ঞা' নামেই দেব বিশেষায়িত করেছেন। দেব বিশ্বাস করেন, তত্ত্ববিদ্যা তার যৌক্তিক অনিবার্যতা সত্ত্বেও বুদ্ধি থেকে স্বজ্ঞায় উত্তরণ ব্যতীত সত্তা থেকে বহুদূরে কেবল আদর্শ হয়েই থেকে যাবে।

দেব দর্শনের সত্তা বিষয়ক আলোচনার সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও তাঁর সমন্বয়ী দর্শনের তত্ত্বগত দিকটির সংগঠনগত কাঠামো সফল মানবপ্রেমের এক অলঙ্ঘনীয় আদর্শ। দেব মনে করেন, সাপেক্ষ জ্ঞান দ্বারা যদি বুদ্ধি ও ইচ্ছার পরিতুষ্টি বিধান সম্ভব হয় তাহলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দর্শনের বহুমাত্রিক সম্পর্ককে যৎসামান্যই উপেক্ষা করা চলে। দেব দৃঢ়তার সাথে একথাও বলেন, সত্তার জ্ঞান পূর্ণতার সমানুপাতিক হলে সত্যানুসন্ধানের পেছনে কোনো ব্যবহারিক উদ্দেশ্য না থাকলেও সে পর্যায়টি তাত্ত্বিক না হয়ে বরং ব্যবহারিক হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং পূর্ণতার সর্বোচ্চ পর্যায়টি সত্তারূপে ভালোবাসা, ভালোত্বের সর্বোচ্চ নীতির সচেতন অবগতি যা মানবহৃদয়ের তাত্ত্বিক সত্তাকে পরিতৃপ্ত করে বহুমুখী বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটায়।

৩.২ জ্ঞানবিদ্যা

দর্শন এবং দার্শনিকদের পথ মূলত জ্ঞানের পথ। এজন্য দর্শনের সাথে জ্ঞানবিদ্যার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। দর্শনের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদগুলি হচ্ছে বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, বিচারবাদ, স্বজ্ঞাবাদ এবং কোথাও কোথাও ঐশী বা দৈববাণীর সাক্ষাত

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়া যায়। বুদ্ধিবাদ অনুযায়ী বুদ্ধিই হচ্ছে জ্ঞানের একমাত্র উৎস। আধুনিক দর্শনে ডেকার্ত, লাইবনিজ ও স্পিনোজা হচ্ছেন বিশিষ্ট বুদ্ধিবাদী দার্শনিক। অভিজ্ঞতাবাদ ইন্দ্রিয়কেই জ্ঞানলাভের একমাত্র উৎস বলে মনে করে। লক, বার্কলি, হিউমকে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক বলা হয়। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট–এর দর্শনের নাম বিচারবাদ। তিনি মনে করেন, এককভাবে বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা আমাদের কোন জ্ঞানদানে সক্ষম নয়। সঠিক জ্ঞান পেতে হলে এ দু'টো পদ্ধতির উপরই আমাদের আস্থা থাকতে হবে। তিনি বলেন, বুদ্ধি থেকে জ্ঞানের কেবল আকার পাওয়া যায় অন্যদিকে অভিজ্ঞতা দেয় জ্ঞানের উপাদান। স্বজ্ঞাবাদী দার্শনিক বার্গসোর মতে, প্রকৃত জ্ঞান এক ধরনের অতীন্দ্রিয় অনুস্মৃতিবিশেষ। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর মিলনের মাধ্যমেই জ্ঞানক্রিয়ার উৎপত্তি ঘটে। দেব উপর্যুক্ত জ্ঞানবিদ্যার সকল ধারার প্রতিই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

আধিবিদ্যক মতবাদ হিসেবে বস্তুবাদ ও ভাববাদের যে পারস্পরিক বিরোধিতা সেটি দর্শনের ইতিহাসে সবচেয়ে পুরনো সংঘাত। বস্তুবাদ অনুযায়ী জড়বস্তুকেই জগতের আদিসত্তা হিসেবে ধরা হয় অন্যদিকে 'ভাব' বা অধ্যাত্মবাদে জগতের আদিসত্তাকে অধ্যাত্ম প্রকৃতির ও পরমচৈতন্য বলে মনে করা হয়। দেব 'ভাববাদ' এবং বাস্তববাদের সমন্বয় সাধন করে গোটা দর্শন ইতিহাসে এক নতুন ধারার সংযোজন করেছেন। এক্ষেত্রে মূলত দেবের জ্ঞানতত্ত্বের বিকাশ ঘটেছে ভাববাদী দর্শনকে কেন্দ্র করেই। ক্ষয়ে যাওয়া ভাববাদকে তিনি নতুন আঙ্গিক-অবয়বে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন অত্যন্ত শক্তিশালীভাবেই। তিনি লক্ষ্য করেছেন, ইউরোপে ভাববাদ টিকে থাকতে পারে নি। গতানুগতিক ধারায় চলতে থাকলে ভাববাদের একদিন অবলুপ্তি ঘটবে এ আশংকায় তিনি ভাববাদকে রক্ষা করার জন্য নতুন নতুন যুক্তি-কৌশলের অবতারণা করেছেন। তিনি তাঁর নিজস্ব ধারায় সমালোচনা করেছেন ভাববাদের। আক্রমণ করেছেন বেদান্তভিত্তিক ভারতীয় ভাববাদকে, প্লেটো-এরিস্টটল থেকে কান্ট-হেগেল পর্যন্ত ভাববাদী ধারার তিনি তীব্র সমালোচনা করেছেন। তবে, যেসব দার্শনিক ধারায় তিনি সমালোচনায় ব্রতী হয়েছিলেন সেগুলোকে আবার সতর্কতার সাথে পরিহারও করেছেন। কেননা, তাঁর মূললক্ষ্য ছিল ভাববাদে পুনরায় ফিরে আসা। তবে মার্কসীয় ভাববাদে দেবের খানিকটা নিস্পৃহতা লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে হাসান আজিজুল হক তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ *গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলী* (তৃতীয় খণ্ড)-র ভূমিকাতে বলেন, "মার্কসীয় দর্শনে ভাববাদের বিরুদ্ধে যে মৌলিক সমালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে, তার সাহায্য তিনি নেন নি বললেই চলে। মনে হয়, তিনি বুঝতে পারেন যে, যৌক্তিক দৃষ্টবাদ, প্রয়োগবাদ বা অস্তিত্ববাদ প্রবলভাবে ভাববাদ বিরোধী হলেও এই মতবাদগুলির মধ্যেই আবার লুকিয়ে আছে ভাববাদেরই কণা পরিমাণ বীজ।"[১০]

একমাত্র ভাববাদের সপক্ষে থেকেই দুর্দশাগ্রস্ত মানবতার মুক্তি আনয়ন সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। নিঃশেষিত দর্শনের জগতকে পুনরায় জাগ্রত করার লক্ষ্যে দর্শনের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয় দিককে তিনি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সাবলীল ভাষায় পর্যায়-পরম্পরায় তিনি তাঁর দর্শনের মৌলিকত্বের দিকেই এগিয়ে গেছেন। এক্ষেত্রে তিনি নতুন ভাববাদের ভিত্তি তৈরি করতে গিয়ে দর্শনে বুদ্ধির ভূমিকা আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। অভিজ্ঞতার সাথে বুদ্ধির যে বিরোধ, বুদ্ধির সাথে সত্তার যে বিরোধ, স্বজ্ঞা কিভাবে বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক—এসব আলোচনায় তিনি অত্যন্ত পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। ইউরোপীয় ভাববাদের যে বিকাশ তা বুদ্ধির আদলেই গড়া। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো এবং এরিস্টটলের দর্শনও বুদ্ধিবাদী দর্শন। দেব বুদ্ধিবাদীদের বুদ্ধির উপর অতিশয় আস্থাশীলতাকে মেনে নিতে পারেননি। মানুষ তাঁর চারপাশের বৈষয়িক অথবা ঘটনাসমৃদ্ধ যা-ই হোক না কেন যে অভিজ্ঞতার জগৎ পরিদর্শন করে একে অস্বীকার করার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। চিন্তাশীল মানুষ নানাভাবে এর বাস্তবতাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। স্পিনোজার ধারণা এক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত। তিনি মনে করেন, অভিজ্ঞতা বহির্ভূত যেকোনো ধরনের সূচনাই সত্তার সঠিক জ্ঞানলাভে সমর্থ নয়। বিপুল ঐশ্বর্যসম্ভারেমণ্ডিত এই ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার জগৎ জ্ঞানলাভের প্রথম এবং প্রাথমিক শর্ত। বুদ্ধির নিজের প্রতি অতিমাত্রায় আস্থা প্রবণতা তার চারিদিকে যে বৃত্ত তৈরি করে তা থেকে বুদ্ধি অভিজ্ঞতার বাস্তবজগতে প্রবেশ করতে পারে না। প্লেটোর 'ধারণার জগৎ' আর যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি ভাবছেন সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার জগতকে তিনি বলেছেন অবভাস, প্রতিরূপ, নকল, ছায়া। প্রকৃতপক্ষে তাঁর বুদ্ধিপ্রসূত বিশুদ্ধ ধারণার জগতের সাথে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার জগতের কোনো মিলই পরিলক্ষিত হয় না। দেব বলেন, ডেকার্ত এর 'আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি'- এ ধারণায় দেহ নয় বরং আধ্যাত্মিক দ্রব্যের প্রতিই ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। যার কড়া সমালোচনা পরিলক্ষিত হয় কান্টের দর্শনে। দেবের ভাষায় কান্ট ধারণা ও বাস্তবের বিরোধ যথার্থভাবেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি একথাও বলেন, অসামঞ্জস্য এবং বিশৃঙ্খল জগৎ প্রজ্ঞার কাছে কখনোই

Dhaka University Institutional Repository

সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বরং গরমিলে ভরা। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় যা পরিলক্ষিত হয় সেটি 'ঐক্য' নয় 'বহু'। ইন্দ্রিয়ের উপর সমসাময়িক দর্শনের যে নির্ভরশীলতা তাতে অভিজ্ঞতাবাদীরা বুদ্ধির ঐক্যের পরিবর্তে ইন্দ্রিয়কেই সত্তার জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় বলে মনে করেন। অন্যদিকে, প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির কাছে অভিজ্ঞতার বিচিত্র জগৎ শুধুই এলোমেলো, বহুত্বে ভরা, অবাস্তব ছায়ামাত্র। দেবের মতে, প্রাচীন দার্শনিকরা একমাত্র বুদ্ধির উপরই গুরুত্ব আরোপ করে বুদ্ধিকেই দর্শন ইতিহাসে আলোকিত করে গেছেন। অন্যদিকে, সমসাময়িক দর্শন ইন্দ্রিয় বা অভিজ্ঞতাকেই সত্তালাভের একমাত্র উপায় বলে গুরুত্ব দিচ্ছেন। কর্মকোলাহলময় এ জগতকে ইন্দ্রিয় অস্বীকার করতে পারে না এবং দার্শনিকরাও অভিজ্ঞতার জগতের বহুত্বের পেছনে ঐক্যের কল্পনা করারও অধিকার রাখেন না। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা উভয়েরই অবস্থান দর্শনের দুই বিপরীত মেরুতে। দেব এদের কোনো একটি দিকের উপর অতিমাত্রায় আস্থাশীল ছিলেন না। লক্ষণীয় বিষয় হলো, মানুষ কখনো ইন্দ্রিয়ের প্রতি আবার কখনো বুদ্ধির প্রতি একতরফাভাবে আস্থাশীল হয়ে ওঠে। এই অবস্থার একমাত্র কারণ হলো, মানুষের আদিম মনোবৃত্তি যা প্রতিনিয়ত মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। কোনো একটির উপর জোর দেয়া মনস্তত্ত্বের দিক থেকে অসম্ভব বলে দাবি করেন দেব। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এটিকে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির উর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়েছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের মতে, বিন্যস্ত প্রাণী জগতের সহজ-স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থেকেই মানব বুদ্ধির উৎপত্তি হয়।

দেবের মতে, বৈচিত্র্যময় বহুত্বের জগৎ বিরোধে পরিপূর্ণ। অভিজ্ঞতার তথ্যাবলীর বিষয়গততা এবং তাত্ত্বিক সংগঠনের প্রত্যয়গত ধারণাই এ বিরোধিতার মূল কারণ।। বিষয়গত মানের বিচারে দর্শনের প্রত্যয়মূহ অভিজ্ঞতার অসামঞ্জস্যতার কাছে তুচ্ছ বলে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে, বিষয়ীগত দিক থেকে বিচার করলে অভিজ্ঞতা প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে টিকতে পারে না। দেব এ পর্যায়টিকেই দর্শনের সঠিক শুরু বলেছেন। শংকর, নার্গাজুন, ব্রাডলি, হেগেলের মতো প্রসিদ্ধ দার্শনিকরাও তথ্যের যে বৈপরীত্য এটিকে ইতিবাচকভাবেই দেখেছেন। ঘটনাবলীর পরস্পর বিরোধিতাকে লাইবনিজ দেখেছেন সহজাত হিসেবে। হেগেল ও ব্রাডলির বিপরীতের সমন্বয় হলো পরমদ্বারা যতটুকু সদৃশীকৃত হতে পারে। অর্থাৎ, সমন্বয়ের চরম বৈধতা নির্ভর করে পরমের ধারণার যৌক্তিকতার উপর। দর্শনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে দার্শনিকরা অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন বার বার, নানাভাবে, নানা

Dhaka University Institutional Repository

আঙ্গিকে। তারপরও এরূপ সমন্বয় দর্শনের ক্ষেত্রে খুব অল্পই কার্যকরী হয়েছে। প্রজ্ঞা ও ইন্দ্রিয়ের যে বৈপরীত্য তা দর্শনজগতে নানান সংকটের সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে দেব বলেছেন,

> "এই বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য হেগেলের ভাববাদ চিন্তনকেই বাস্তবসত্তার মাপকাঠি বলে গ্রহণ করেছেন। কেবলমাত্র চিন্তা যে আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারে না তা হেগেল বুঝতে পারেন নি। ... কারণ, বাস্তবজগৎ সর্বগ্রাহী কোন পরমসত্তার স্থান দিতে অসমর্থ। কাজেই হেগেলের ভাববাদ আদর্শকে বাস্তব রূপ দেয়ার বদলে বাস্তবকেই আদর্শায়িত করে গেছে।"[১১]

মূলত ব্রাডলি ও হেগেলের ধারণা প্রায় একই রকমের। ব্রাডলিও সর্বগ্রাহী সমন্বয়ের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। পার্থক্য কেবল হেগেল যেখানে চরমসত্তায় চিন্তনের কথা বলেছেন ব্রাডলি সেখানে আত্মসামঞ্জস্যের নীতিকে গ্রহণ করেছেন। তবে, উভয়ক্ষেত্রেই গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান। দেব অভিজ্ঞতার তথ্যগুলোকে দেখিয়েছেন একটা ইঙ্গিত বলে যার আলোকে বুদ্ধি সমগ্র সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করতে পারে। তিনি মনে করেন, দর্শনের ক্ষেত্রে বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা উভয়ই প্রয়োজন, এককভাবে বুদ্ধি বা এককভাবে অভিজ্ঞতা সত্তার ধারণা গঠনে সফলতা লাভ করতে পারে না। তিনি বলেন, বুদ্ধির সংগঠনে রয়েছে সংশয়, দোদুল্যমানতা ও দ্বিধা। বুদ্ধি কখনোই সংবেদোপাত্তের মর্যাদা নিয়ে সত্তা গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে না। দেব এভাবেই ভাববাদের গোড়াপত্তন করেন ঠিকই কিন্তু এখানেই তিনি সন্তুষ্ট নন। তিনি সত্তার ধারণা গঠনে যুক্তিউর্ধ্ব স্বজ্ঞার ধারণাকেই সত্য বলে মেনে নেয়ার পক্ষপাতী। এক্ষেত্রে বিচারবাদী দার্শনিক কান্টের উপলব্ধি হচ্ছে, ধারণা ও বাস্তবজগতের মধ্যে এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎ ও অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যে এক সুবিশাল পার্থক্য বিদ্যমান। দেব বুদ্ধিবাদের প্রতি সরাসরি তাঁর ক্ষোভের বর্হিপ্রকাশ ঘটান এবং আধুনিক দার্শনিক ধারাগুলিকে কঠোরভাবে সমালোচনা করতে পিছপা হন নি। তিনি বলেন, ভাববাদের প্রচারকগণ ভাববাদকে বাস্তবজগৎ বিচ্ছিন্ন করে দর্শনকে পারলৌকিকতার আঙ্গিকে গড়ে তুলেছিলেন। যাতে করে মনে হয়েছে ভাববাদ পার্থিব জগতের শোষণ-নির্যাতন, অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনাকে সমর্থন জুগিয়ে গেছে। ভাববাদের উপর এরূপ নেতিবাচক মনোভাব দেব কখনোই সমর্থন করেন না। তাই তিনি ভাববাদকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে সমন্বয়ী ভাববাদের অবতারণা করেন। সমন্বয়ী ভাববাদের মাধ্যমেই শুদ্ধসত্তা ও বাস্তবজগতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হবে। ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও সমষ্টির প্রয়োজন উভয়ই এ

Dhaka University Institutional Repository

সমন্বয়ের দ্বারা সাধিত হবে। সমন্বয়ী ভাববাদই দেবদর্শনের প্রাণকেন্দ্র। যে সমন্বয়ের মূলমন্ত্রে তিনি দীক্ষিত ছিলেন সেই সমন্বয়ের সফল বাস্তবায়নই তাঁর জীবনদর্শনের সারাৎসার। একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ-গঠনে এ সমন্বয়ের জুড়ি নেই। একটি সার্থক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ গণমানুষের মুক্তি মিলবে তাঁর নতুন ভাববাদে। দেবের সমন্বয়ী ভাববাদ এবং একটি আদর্শ অর্থনৈতিক পদ্ধতি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক এবং প্রথমটি দ্বিতীয়টির মৌলিক ভিত্তি রচনা করে। দেব পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন এবং দেখেছেন, যুগ যুগ ধরে উগ্র অধ্যাত্মবাদ সাধারণ মানুষকে নানাভাবে বঞ্চিত করেছে, নস্যাৎ করেছে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়াকে। ধর্মের নামে মানুষকে প্রতারিত করে ইহলোকের সমস্ত চাহিদা থেকে বঞ্চিত করেছে, অন্যদিকে উগ্র জড়বাদও ইহলোকের সুখকেই মানুষের উন্নতির চাবিকাঠি বলে মনে করে, পরকালকে নির্দ্বিধায় ত্যাগ করে। কিন্তু দেবের মতে, প্রয়োজনের নিক্তিতে উভয়েরই মূল্য সমান। উভয় মতের মিলনেই সম্ভব সার্থক সমন্বয়। দেব সূক্ষ্ম-যুক্তির জাল বুনে ধীরে ধীরে তিনি তাঁর দর্শনের মূলতত্ত্বকে হাজির করেছেন। দেবের সমন্বয়ক্রিয়া বাস্তবায়নের সার্থক পন্থা হচ্ছে ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও স্বজ্ঞার পূর্ণ সম্মিলন। প্রজ্ঞার বিশুদ্ধ ধারণাকে অস্তিত্বশীল করার লক্ষ্যে দেব বুদ্ধি থেকে যুক্তিউর্ধ্ব স্বজ্ঞায় গমনের কথা বলেন । এ বিষয়ে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জ্ঞানে পৌঁছুবার সঠিক পথের সন্ধান করাই হলো দেবের তাত্ত্বিক দর্শনের নির্যাস। যা 'স্বজ্ঞা' নামে অভিহিত। দেব দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন, প্রাথমিক পর্যায়ে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে বুদ্ধির জগৎ থেকে স্বজ্ঞার জগতে উত্তরণের চেষ্টা করা হয়। সুতরাং বুদ্ধির সীমা এবং যুক্তিউর্ধ্ব স্বজ্ঞার সীমা একই গণ্ডির ভেতর। তবে, স্বজ্ঞাকে সত্তা জ্ঞানের উপায় হিসেবে গ্রহণ করলে বুদ্ধিকে বাদ দেয়ার সামিলই হয়ে যায়, অন্যদিকে বুদ্ধি থেকে সত্তায় উত্তরণ আবার এটিই প্রমাণ করে যে, দু'টোর ভেতরে ক্রমের একটি সহজাত পার্থক্য রয়েছে। এসব সত্ত্বেও দেবের বক্তব্য হচ্ছে, বুদ্ধি থেকে স্বজ্ঞায় উত্তরণের ক্ষেত্রে আত্মসামঞ্জস্যের প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করা হয় তাতে উভয়ের মধ্যে কোন ফাঁক থাকতে পারে না। এই একটি ক্ষেত্রে উভয়ের মিল হতেই হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। দেব এও মনে করেন, শুধুমাত্র বুদ্ধির অনুশীলনে জীবন হয়ে পড়ে অনুর্বর শুষ্ক ও মরুময় তেমনি শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার অনুশীলনও জীবনের সীমাহীন ব্যাপকতার সন্ধান পেতে পারে না। অভিজ্ঞতার খণ্ডিত চিত্রে সাক্ষাৎ মেলে বৈচিত্র্যময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের। সমগ্রের ধারণার পরিমাপ করা একক অভিজ্ঞতায় সম্ভব নয়। জীবনের সামগ্রিক ধারণার

Dhaka University Institutional Repository

সন্ধান পেতে প্রয়োজন তাই যুক্তিউর্ধ্ব স্বজ্ঞার। দেব স্বজ্ঞার উপর ভরসা করেছেন ঠিকই, কিন্তু তিনি আবার স্বজ্ঞার স্বপক্ষে বিপক্ষে দার্শনিক মতামতসমূহের পর্যাপ্ত আলোচনা-পর্যালোচনাও করেছেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ধারার সাথে যুক্ত করে স্বজ্ঞার স্থান নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন। দর্শন বিষয়ে দেবের বিশ্লেষণাত্মক প্রক্রিয়া সত্যিকার অর্থেই বিস্ময়কর । যুগচেতনার মধ্যমণি এ জ্ঞানতাপস দর্শনের জটিল তত্ত্বকে অত্যন্ত সুচারুরূপে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সাধারণ মানুষের উপলব্ধির বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছেন। তিনি এটাও বলেন যে, স্বজ্ঞা ও বুদ্ধি পরস্পর নিরপেক্ষ বটে তবে কোনোক্রমেই এদের মধ্যে বিরোধিতা নেই। সামঞ্জস্যের সহাবস্থান রয়েছে উভয়ের মধ্যে। দেব মনে করেন, ইন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞা উভয়ই দর্শন ইতিহাসের একটি ভুল প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রজ্ঞাকে প্রায়ই ইন্দ্রিয়ের দাসত্বে পরিণত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা দেব সমর্থন করেন না। এক্ষেত্রে প্রজ্ঞার দাবিকে স্বজ্ঞা বিষয়নিষ্ঠতা প্রদান করলে দর্শনের কাজ হবে ইন্দ্রিয় এবং স্বজ্ঞা সমর্থিত প্রজ্ঞার মধ্যে একটা আন্তরিক যোগসূত্র স্থাপন করা। ভারতবর্ষের অনেক দর্শনই স্বীকার করে যে, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি পরমসত্তার জ্ঞান পেতে পারে না। সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত দর্শনেও অপরোক্ষ অনুভব স্বীকার করে না। তবে, দেব সত্তার সাক্ষাৎ জ্ঞানে বিশ্বাসী হলেও তিনি বিশ্বাস করেন যোগাভ্যাসের ফলে সত্তার সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করা যায়। এজন্য দেব আধ্যাত্মিক স্বজ্ঞাকে একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা বলে অভিহিত করেছেন। অতএব, দেবের সমন্বয়ী দর্শনের মূলমন্ত্র হলো, এটি আপাতঃপ্রতীয়মান পরস্পর বিরোধী নিগুঢ় অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের স্বীকৃতি। ইন্দ্রিয় এর সত্যতা আবিষ্কার করে প্রজ্ঞার ভেতর, অন্যদিকে প্রজ্ঞার আবির্ভাব সূচিত হয় ইন্দ্রিয়ের ভেতর। ইন্দ্রিয়ের বহুত্ব আর প্রজ্ঞার খাঁটি অভিন্নতা মূলত একই। এভাবেই জ্ঞানবিদ্যা পর্যায়ে অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার সমন্বয় দ্বারা উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ বিদ্যমান তা দূরীভূত করার মধ্যে দিয়েই দর্শনের তত্ত্বগত ধারণা সফলতা লাভ করে। দেব মনে করেন, শুষ্ক বুদ্ধির চর্চা যেমন জীবনের বাস্তব চাহিদা মেটাতে পারে না, তেমনি অভিজ্ঞতার খণ্ডচিত্র পরিপূর্ণ কোনো সত্তার ধারণা দান করতে সক্ষম নয়। দেব যুক্তিউর্ধ্ব স্বজ্ঞার মধ্যেই দেখতে পান বৈচিত্র্যময় জীবনের ঐক্য। এই ঐক্যই আবার প্রকাশিত করে বিচিত্ররূপী বহুত্বকে। এভাবে দেব স্বজ্ঞার ধারণা থেকে সত্তার ধারণায় উপনীত হন। দেব *ভাববাদ ও প্রগতি* এই গ্রন্থটিতে প্রজ্ঞা ও স্বজ্ঞার প্রকৃতি নির্ণয়ের পাশাপাশি পরমসত্তার সাথে কিভাবে এরা সম্পর্কিত তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। পরমসত্তাকে তিনি একত্বের এক সুমহান মানদণ্ডে দাঁড় করিয়েছেন। ধর্মীয় ঈশ্বর, গড,

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ এবং অতীন্দ্রিয় ভাবের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। ভাববাদের মূল ধারাটি হচ্ছে ধর্মীয় অনুভূতি, যা অধ্যাত্মবাদেরই আরেক রূপ। আধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে দেব যিশুর মন্তব্য উপস্থাপিত করেন এবং বলেন "ব্যগ্রতাই সত্তার প্রতি আধ্যাত্মিক তীর্থযাত্রার একমাত্র আবশ্যক পথ। 'খোঁজ তাহলেই পাবে, করাঘাত কর দরজা তোমার জন্য খুলবে'। ... শেষ বিশ্লেষণে' বুদ্ধিও জানে না, স্বজ্ঞাও জানে না, জানে প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র আত্মা'ই। তত্ত্ববিদ্যকভাবে অন্তত বুদ্ধি এবং স্বজ্ঞা মূলে অভিন্ন।"[১২] সুতরাং দেবের বক্তব্যে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, খাঁটি বুদ্ধি এবং প্রকৃত আত্মা একই। অতএব, সুসংগত কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে দেখতে গেলে খাঁটি অভিন্নতা এবং বহুত্ব, প্রাণ এবং জড় পদার্থের জগৎ একত্রে মিলে এক অভিন্ন সত্তা গঠন করে। সত্তার ধারণায় দেব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অসংখ্য দার্শনিকের মতামত বিশ্লেষণাত্মকভাবে তুলে ধরে বিস্তর আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। এক্ষেত্রে বেদ-বেদান্ত, স্পিনোজা, রামানুজ, হেগেল সকলের মতামতই অত্যন্ত জোরালোভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। পরমসত্তার ধারণা আলোচনায় তিনি বৈদান্তিকদের ভেদসমূহের শ্রেণীবিভাগ দেখিয়েছেন। বৈদান্তিক মতে, পরমসত্তার বাইরে কিছু থাকতে পারে না, চরমসত্তায় বহুত্বও গ্রহণযোগ্য নয়, এমনকি বিপরীত কিছুও ভাবা সঠিক নয়। কেননা, এগুলো বৈদান্তিকদের স্বজাতীয় ভেদ, বিজাতীয় ভেদের পরিপন্থী। কেবলমাত্র অন্তঃস্থ সম্পর্ক অর্থাৎ স্বগতভেদই পরমসত্তার জ্ঞান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্দেশ করতে পারে।

অন্যদিকে স্পিনোজা ও রামানুজ উভয়েই হেগেলপন্থীদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। রামানুজ, স্পিনোজা ক্রোচের ধারণায় পরমসত্তা হলো পৃথকের একত্ব, বহুত্বে এক, একটা গঠনমূলক একত্ব। এক্ষেত্রে ক্রোচের মত খানিকটা ভিন্ন হলেও সত্তা সম্পর্কে কোনো দ্বিমত নেই। তবে তিনি বলেন, একত্ব একটা চিরবর্ধমান প্রক্রিয়া, একটা তৈরি সত্তা নয়। দেব পরমসত্তার একত্বের ধারণাকে আরো সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করার জন্য একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করেন। এতে বলা হয়, "একজন শংকর ও একজন হেগেলের মধ্যে অথবা একজন রামানুজ ও একজন ব্রাডলির মধ্যে কোন্ জিনিসটা সাধারণ তা খুঁজে বের করা বরং শক্ত, কেবলমাত্র এটুকু ব্যতীত যে, তাঁরা সবাই বিশ্বাস করেন যে, চূড়ান্ত পর্যায়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক, অথবা আর একটু স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, এটা দুই নয় (অদ্বৈত)।"[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং পরমসত্তা সকল বৈপরীত্য সকল পরিবর্তন বিবর্জিত হয়ে সকল পরিবর্তনের স্থায়ী আধার। যাতে কোন অসামঞ্জস্য নেই, কোন অসঙ্গতি নেই।

দেব বিশ্বাস করেন, পৃথিবীর সর্ববহুত্বের সমন্বিত প্রকাশ হল পরমসত্তা। সেই পরমসত্তার সাথে ব্যক্তি একাত্ম হবার অনুভূতি লাভের পরও সে বন্ধনপ্রাপ্ত মানবাত্মার কল্যাণসাধনে সচেষ্ট থাকতে পারে। ব্যক্তি তখন বন্ধনপ্রাপ্ত জীবন থেকে মুক্তজীবনের আলোতে আলোকিত হয়। সর্বোচ্চ আধ্যাত্মসিদ্ধিলাভের প্রত্যাশা কখনোই আত্ম-স্বার্থের মাধ্যমে হয় না তা যতো উচ্চস্তরের সাধনাই হোক না কেন। প্রাপ্তির প্রত্যাশা ব্যক্তির আত্মোন্নতিকে ক্ষুন্ন করে। আত্মোন্নতি বা আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষণ দ্বারা সম্ভব নয়। ক্লান্তিহীনভাবে অন্যের কল্যাণে, অন্যের সেবা করার মাঝেই রয়েছে অনাবিল স্বর্গীয় সুখের পরিতৃপ্তি। এই অবস্থাকেই দেব মানুষের নাগালের মধ্যে 'পরমস্বর্গীয় সুখের' উপলব্ধি বলে মনে করেছেন।

৩.৩ দেবের শিক্ষাদর্শন

যুগ চেতনার মধ্যমণি মানব সম্প্রদায় সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই এ বিশ্বে তার অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করে এসেছে। অনাগত ভবিষ্যতে তার এ অবস্থানকে সুদৃঢ় করে রাখতেও নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভব হয়েছে বিভিন্ন মতের, বিভিন্ন পথের। এসব মত পথের প্রকৃত প্রদর্শকরাই দার্শনিক বলে পরিচিতি লাভ করেছেন। এসব দার্শনিকদের সুদীর্ঘ সাধনাপ্রসূত বিষয়াবলী মানবজাতির এক মূল্যবান এবং শক্তিশালী হাতিয়ার। প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি শিক্ষাব্যবস্থায় তাদের এ অবদান প্রেরণাদায়ী ও অনস্বীকার্য। দর্শনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক আন্তরিক এবং অবিচ্ছেদ্য। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য যেমন জ্ঞান অর্জন তেমনি 'দর্শন' হলো সেই জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ। আর গোবিন্দদেব ছিলেন সেই জ্ঞানানুরাগীদেরই একজন। আলোচ্য এ অংশে আমরা দেবের 'শিক্ষাদর্শন' বিষয়টির প্রতি কিছুটা আলোকপাত করার প্রয়াস পাব। মূলত শিক্ষা হচ্ছে গতিশীল এবং প্রবহমান একটি ধারা। চলমান শিক্ষাব্যবস্থার সাথে যুগ-চেতনার দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত হয়ে সফল জীবনবিধানকারী ধারা তৈরি করাই শিক্ষার মূললক্ষ্য। দেবের ভাবনাও এর ব্যতিক্রম নয়। 'আগামী দিনের শিক্ষাদর্শন' এবং 'In Search of a New Philosophy of Education' এ দু'টি প্রবন্ধেই

Dhaka University Institutional Repository

তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত শিক্ষাদর্শনকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। দেব অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে লক্ষ্য করেছেন আধুনিক শিক্ষা মানুষকে ভোগ-বিলাস ও শক্তি বৃদ্ধির পথকে উন্মুক্ত করে তার মানবিক-আত্মিক গুণগুলিকে বর্জন করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। তিনি মনে করেন, ইউরোপে তিন চারশো বছর ধরে যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রচার এবং প্রসার ঘটেছে তার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ ঘটানো নয়; উপরন্তু এ ধারাকে অক্ষুন্ন রাখতে নিত্য-নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও অব্যাহত রয়েছে। এখানে দেবের তেমন আপত্তি নেই বললেই চলে। দেবের আপত্তির বিষয়টি হলো, বৈজ্ঞানিক শিক্ষার পদ্ধতি বা ধরণ সম্পর্কিত। দেব মনে করেন, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হলো বহির্জগতের জ্ঞান। বাইরের জগতের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যকেই বিজ্ঞান অকাট্য বলে মনে করে। এক্ষেত্রে দেব বলেন, "বাইরের দুনিয়াকে ভাল করে জানলেই মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি, আর জ্ঞান বৃদ্ধিতেই শক্তি বৃদ্ধি, শক্তি বৃদ্ধিতেই জীবনের সাফল্য–এই হলো আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানের সারমর্ম।"[১৪] সাম্প্রতিক সময়ে বিজ্ঞানের সরব উপস্থিতি মানুষের বৈষয়িক সুখের নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। জীবনকে করেছে সহজ-সাবলীল। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সব আবিষ্কার ও ব্যবহার সভ্যতার অগ্রগতিকে বহুগুণে ত্বরান্বিত করেছে একথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দেব মনে করেন, আজকের আধুনিক সভ্যতা এবং প্রাচীনকালের বিশ্বাসবাদী ধ্যান-ধারণার ফারাক আকাশ-পাতাল। স্বাধীন চিন্তাচর্চা এবং নিরঙ্কুশ জ্ঞানীয় দৃষ্টিভঙ্গিই বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে। আর এই বিজ্ঞান প্রভাবিত শিক্ষা দ্বারা মানুষের জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তোলাকেই দেব শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য বলে দাবি করেন। তবে, এক্ষেত্রে দেবের আক্ষেপ হলো, স্বাধীন চিন্তাচর্চার কার্যকারিতা আজ একদেশদর্শী হয়ে পড়েছে। কেননা, প্রাচীন ধর্মগুলি আত্মজ্ঞান লাভের যে চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলো তার মূলেও স্বাধীন এবং মুক্তচিন্তার কার্যকারিতাই প্রাধান্য পেয়েছিল। দেবের মতে, আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে সেই আত্মিক চর্চার দিকটিকে নিষ্প্রয়োজন জ্ঞানে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। দেবের আপত্তির কারণটি এখানেই। দেব সভ্যতার মহান বাহক বিজ্ঞানকে কখনোই খাটো করে দেখতে আগ্রহী নন। তিনি বলেন, "আজকের দিনের শিক্ষা-বিজ্ঞানের পেছনেও এক জীবন-দর্শনের প্রভাব প্রচুর। গত তিন চারশো বছর ধরে তা মানুষকে উন্নতির প্রেরণা জুগিয়েছে।"[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

দেব মনে করেন, আত্মিক উন্নতির দিকটিকে বর্জন করে শুধুমাত্র বাইরের জগতের জ্ঞান অর্জন দ্বারা যথার্থ শিক্ষালাভ সম্ভব নয়। আত্মার মলিনতা এবং হীনতা মানুষকে অন্যের প্রতি ঈর্ষান্বিত করে তোলার প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে, মানুষ স্বার্থান্ধ হয়ে বিচ্ছিন্নতাবোধের শিকার হয়। মানুষের মধ্যে ঐক্যবোধের সৃষ্টি হয় না। বিজ্ঞান প্রভাবিত এ বিশ্বে মানুষ শুধু বাইরের জৌলুস নিয়েই নিজের বৈষয়িক উন্নতির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তিনি মনে করেন, আমাদের অতীত ইতিহাসের শিক্ষা হলো তথাকথিত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকারে পরিণত হওয়া ব্যক্তিবর্গের যথার্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ তৈরি করে দেয়া। নতুবা ব্যক্তির জীবন হবে নিষ্ফল এবং নিরর্থক। ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগের মাধ্যমেই কর্মক্ষেত্রে মানুষ সফল এবং সার্থক জীবন গঠনে সচেষ্ট হবে। অন্যথায় এর ব্যত্যয় ঘটলেই সমাজজীবনে নেমে আসবে সীমাহীন দুঃখ-দ্বন্দ্ব, সংঘাত-সংঘর্ষ এবং সর্বশেষে বিপ্লবের মতো ভয়ঙ্কর-ভয়াল থাবা। প্রজন্মের দিকপাল গোবিন্দচন্দ্র দেব তার সুদূরপ্রসারী চিন্তার গভীরতা থেকে সভ্যতার এরূপ ভাঙ্গনকে ভীতিজনক-উদ্বেগজনক বলে মনে করেছেন। দেবের আশংকা যে অমূলক নয় তা বর্তমান বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায়। সমগ্র বিশ্ব আজ এক মহাসংকটের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। দেব মনে করেন, এ সংকট উত্তরণের জন্য প্রয়োজন বাইরের জগতের তথ্য উপাত্তের সাথে আত্মিক জগতের সমন্বয়। আর এজন্য প্রয়োজন সফল সমঝোতা। বিজ্ঞানের শক্তির অপব্যবহারের ফলে মানবসভ্যতা আজ ধ্বংসের দোরগোঁড়ায়। যে সব দেশ বিজ্ঞানের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে শক্তিধর হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে সে সব দেশের রাষ্ট্রনায়কদের মাঝে মূল্যবোধ তথা আত্মিক প্রেমের কোনো যোগাযোগ নেই। ফলে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে চরম বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে ধ্বংসের যে দাবানল ছড়িয়ে পড়ছে তাতে করে যেকোনো সময় এ বিশ্বে মানবসৃষ্ট এক মহাপ্রলয়ের সম্ভাবনা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, বিজ্ঞান নির্মিত এ সভ্যতা বালির ইমারতের মতোই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে। এ আশঙ্কাতেই দেব বলেন, "এই নিউক্লীয়ার যুগে শক্তির অপব্যরহারের ফলে মানুষের ব্যাপক ধ্বংসের সম্ভাবনা যেদিন প্রকট হলো সেদিন শিক্ষার এই নিছক ব্যক্তিত্ববাদী আদর্শের মুখোশ দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ...শিক্ষার আদর্শ যে সার্থক জীবন-যাত্রা তা বাস্তব করার আগেই মানুষের জ্যান্ত কবরের ব্যবস্থা হয়ে যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়।"[১৬] দেব বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি মোটেও অনীহা প্রকাশ করেন নি। মধ্যযুগে ধর্মীয় অনুশাসনের শৃঙ্খলে যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশ বিরাজিত

Dhaka University Institutional Repository

ছিল তিনি তা স্বজ্ঞানেই বর্জন করেছিলেন। মধ্যযুগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণাকে ধর্মীয় বেড়াজালের আবর্তে একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে দেয়া হয়েছিল। বর্তমান সময়েও এর কার্যকারিতা একেবারে থেমে নেই। ইতিহাসের দিকে তাকালে প্রমাণ পাওয়া যাবে ধর্মবিরোধিতার জন্য কত মহান মনীষী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক শুধু নির্যাতিতই নয়, প্রাণও হারিয়েছেন অবলীলায়। দেব ভবিষ্যৎ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ব্যক্তিত্ববাদী আদর্শকে পরিত্যাগ করে নতুন ধারায় সমঝোতা ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে এক অনাগত আগামীর শিক্ষা পরিকল্পনা করেন যে শিক্ষার মর্মমূলে ধ্বনিত হবে ঐক্যজ্ঞান এবং প্রেম। দেব শিক্ষাক্ষেত্রে একদিকে ব্যক্তিত্ববাদী আদর্শকে পরিত্যাগ করেন এবং অন্যদিকে পুঁজিবাদকে মূলে রেখে বৈষম্যভিত্তিক বিশ্বাসবাদী ধ্যান-ধারণা থেকে যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠে তারও বিরোধিতা করেন। দেবের পুরোদর্শন তথা শিক্ষাদর্শনেরও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকটি হলো সমন্বয়। জ্ঞান এবং প্রেমের আদর্শের উপর ভিত্তি করে রচিত দেবের শিক্ষা-দর্শন তথা সমগ্র দর্শনালোচনা। জ্ঞানের সাথে, শক্তির সাথে প্রেমের সম্পর্কই সাফল্যের প্রকৃত নিয়ামক বলে দেব বিশ্বাস করেন। দেব এ সমন্বয়ের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুস্থ সহাবস্থানের মাধ্যমে। তিনি মনে করেন, প্রতিটি মানবদেহ যেমন একটি অঙ্গের সাথে আরেকটি অঙ্গের আঙ্গিক সম্বন্ধ বর্তমান তেমনি এ বিশ্বে বিরাজিত বিভিন্ন দেশ, জাতি, রাষ্ট্রের মধ্যেও এমন আঙ্গিক ঐক্যের নীতি বিরাজিত। দেব এ প্রসঙ্গে তাঁর 'A Mysterious Mixture' শীর্ষক শিরোনামে চমৎকারভাবে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি এভাবে বলেন–

> "There is a great danger in this race for efficiency and power, in this mechanised struggle for personal success. Man today has enough powers in his possession to achieve and ensure his complete success in the direction of death. Aesop's Fable's familiar story of a tussle between the belly and the other limbs of the human body which finally meant a victory for the former is about to become true in a literal sense in case of man as he stands today. Different groups of man representing different nations and countries and even sub groups within them, the different limbs of the human body as it were, are fighting hard for supremacy so

Dhaka University Institutional Repository

> that in the absence of a cohesive understanding and growth, they are also out to grow something take a big belly, the alarm-signal of death according to medical exparts."[১৭]

দেব মনে করেন, মানবদেহের আঙ্গিক ঐক্যের সম্বন্ধ যেমন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য জরুরি, তেমনি এ বিশ্বরাষ্ট্রেও প্রয়োজন সমন্বিত ঐক্য। তাঁর মতে, এ বিশ্বরাষ্ট্র বিশাল এক আঙ্গিক ঐক্যের সমাহার। এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এক জাতির সাথে অন্য জাতির, এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের নিবিড়-নিরবচ্ছিন্ন একক ঐক্যের নীতি যাকে দেব 'আঙ্গিক' বলেই অভিহিত করেছেন। এর অন্যথা হলেই বিশ্বে বিপর্যয় নেমে আসবে। দেবের শিক্ষাব্যবস্থার সফল-স্বার্থক রূপটি হচ্ছে 'প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' নীতি দ্বারা সমর্থিত। এ জগৎ-সংসারের চিরকল্যাণ ও মঙ্গল কামনাই দেবের শিক্ষা দর্শনের মূললক্ষ্য। ব্যক্তিত্ববাদী ধারার খোলস ছাড়িয়ে দেব শিক্ষাব্যবস্থার উন্মোচন ঘটিয়েছেন বিজ্ঞানের বাহ্যিক ঐক্যের সাথে জগতের বিভিন্ন ধর্মে বিঘোষিত আত্মিক ঐক্যের সামঞ্জস্য বিধান করে। দেব মনে করেন, যে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা দ্বারা মানুষ পেয়েছিলো মুক্তি, বেঁচে থাকার ইঙ্গিত আর আজ সেই বিজ্ঞানের ব্যাপক বিস্তার সত্ত্বেও তাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে মানুষ ব্যর্থ হচ্ছে। যদিও বিজ্ঞানকে সুপথে চালিত করার অব্যর্থ হাতিয়ার মানুষেরই হাতে। আজকের মানুষ বিজ্ঞানের যথেচ্ছ ব্যবহার করে যাচ্ছে ঠিকই পরিণামে দৈহিক ও বাহ্যিক সুখের সন্ধানও পেয়েছে কিন্তু বিজ্ঞান যা দিতে পারছে না তা হলো 'প্রশান্তি' এবং 'আত্মতৃপ্তি'। এখানেই দেবের শিক্ষাদর্শনের মূল সারাৎসার নিহিত। গভীর জ্ঞানানুরাগী দেব মনে করেন, আত্মতৃপ্তির জন্য প্রয়োজন হৃদয়ের চিরচেনা সেই ঐশী আহ্বান। যা আত্মিকনীতির এক অনন্যসাধারণ দিক। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় সন্নিবেশিত বিষয়টি যেমন বিজ্ঞানের বাহ্যিক জ্ঞান তার সাথে সমন্বিত হতে হবে আত্মিক যোগাযোগ । সুতরাং, জ্ঞান এবং এই হৃদয় উৎসারিত প্রেমের সামঞ্জস্য বিধানই শিক্ষাদর্শনের অপরিহার্য উপাদান। দেব দর্শনের মূল বিষয়টি ঐক্যের ধারণা। বহু নয়, বিচ্ছিন্নতা নয়, আপাতঃপ্রতীয়মান বিরোধিতাকেও দেব গ্রহণ করেননি। দেব সমন্বয় ঘটিয়েছেন বিজ্ঞানের সাথে ধর্মবোধের। তবে সে ধর্মবোধ পারলৌকিকতা বর্জিত ঐহিক ঐক্যের এক অনাবিল প্রকাশ। বস্তুর সাথে সমন্বয় ঘটিয়েছেন ভাবের। এক্ষেত্রে জন ডিউঈ-র সাথে দেবের খানিকটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ডিউঈ তাঁর শিক্ষাচিন্তায় ভাববাদী ধারা

Dhaka University Institutional Repository

থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেন নি। "ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি শিক্ষাভাবনার ক্ষেত্রে 'ভাব' ও 'ধারণার' স্থলে মানুষের অবস্থানটিকে নিশ্চিত করেছেন।"[১৮]

দেব প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের শিক্ষার সাথে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের যথাযথ স্ফূরণ ঘটিয়ে বিশ্বরাষ্ট্র ব্যবস্থায় একক ঐক্যের ধারণার প্রতি তাঁর মতামত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। বিশ্বের ঐক্যের মাঝে মানুষের ঐক্যের ধারণাটি সম্পৃক্ত হয়ে এ বিশ্বব্যবস্থা এগিয়ে যাবে। সার্থক হবে মাটির পৃথিবীর অভ্যুদয়ের ইতিহাস। এ প্রসঙ্গে দেব বলেন, "In our philosophy of education, we must make significant transition from plurality to unity, from separateness to integrity, from power to love, from efficiency to goodness not in order to bid farewell to the first but to achieve a workable measure of compromise between them both."[১৯]

দেব উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকেই তাঁর শিক্ষাদর্শনের পরিপূর্ণতা প্রদানে সচেষ্ট হয়েছেন।। আদর্শ বিশ্বরাষ্ট্র গঠনে একাত্মানুভূতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ব্যক্তির মানবীয় ব্যক্তিত্বের সমন্বয়বিধান জরুরি বলে দেব বিশ্বাস করেন। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা দেবের মতে, অপূর্ণ এবং ব্যক্তিসত্তা বিকাশের প্রধান অন্তরায়। তিনি আরো মনে করেন, আজকের মানুষ ভাবলেশহীন নিষ্ফল জীবনের কাণ্ডারি হয়ে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দিনাতিপাত করে চলেছে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পথ বিঘ্নিত হয়ে ' জীবন দর্শনহীন' এক কর্মজীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এজন্য প্রয়োজন শিক্ষার সমন্বয়সাধন। জ্ঞানের সাথে প্রেমের সংমিশ্রণ ঘটলেই মানুষ পেতে পারে সার্থক সফল এক পূর্ণাঙ্গ জীবনের আবহ। দেবের সমন্বয়ধর্মীতার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির যথাযথ উপলব্ধি মানবজীবনকে সার্থক এক কবিতারূপে মহিমান্বিত করতে সক্ষম। তবে, দেবের শিক্ষাদর্শনের অপূর্ণতা যে নেই তা ঠিক বলা যাবে না। দেব দর্শনের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য রেখেই তার শিক্ষা সম্পর্কিত মতামত প্রদান করেছেন। তবে, তাঁর শিক্ষাদর্শনে কাঠামোগত কিছু অপূর্ণতা রয়েছে। দেবের শিক্ষা সম্পর্কিত আলোচনায় এর সঠিক রূপায়ণের পদ্ধতিগত দিকটি সুস্পষ্ট নয়। কোন্ কাঠামোর উপর নির্ভর করে তাঁর এ শিক্ষাদর্শনকে বাস্তবায়িত করা হবে এ দিকটির প্রতি দেবের উদাসীনতাই পরিলক্ষিত হয়। নতুন শিক্ষাপদ্ধতি প্রণয়নের দায়িত্ব তিনি আধুনিক বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষাবিদদের উপরই ন্যস্ত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তবে, একটি ন্যায়পর ও কল্যাণমূলক বিশ্বগঠনে প্রাচীন ধর্মীয় শিক্ষা ও তথাকথিত আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়সাধন যে অপরিহার্য দেব তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। উপমহাদেশীয় চিন্তাধারায় দেবের এরূপ শিক্ষা সম্পর্কিত দিক-নির্দেশনা শিক্ষাপ্রেমীদের আজীবন প্রেরণা যুগিয়ে যাবে। এখানেই দেবের শিক্ষাদর্শনের স্বার্থকতা।

এই অধ্যায়ে আমরা গোবিন্দ দেবের বিভিন্ন প্রকার দার্শনিক তত্ত্ব তথা অধিবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা, শিক্ষাতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেছি। গোবিন্দ দেবের দার্শনিক তত্ত্বের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাঁর নব্য নৈতিকতা। পূর্ববর্তী আলোচনা তাঁর নব্য নৈতিক তত্ত্বের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে। যেহেতু নব্য নৈতিকতা এই অভিসন্দর্ভের মূল আলোচ্য বিষয় তাই আমরা নব্য নৈতিকতার অংশটি পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূচি

১. হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত, *আমার জীবন-দর্শন, গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলী*, (তৃতীয় খণ্ড) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ৩১

২. Hasan Azizul Huq (ed), *Works of Govinda Chandra Dev,* Vol.1, Bangla Academy, Dacca, 1980, p. Introduction.ix

৩. Ibid., p. 227

৪. হোসনে আরা আলম অনুবাদিত, *ভাববাদ ও প্রগতি*, মূলঃ ড. জি.সি. দেব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮,পৃ. ২৩৪

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ০২

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ০৩

৭. ড. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস সম্পাদিত *"জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ গোবিন্দচন্দ্র দেবঃ জীবন ও দর্শন"*, অবসর প্রকাশনা, জুলাই ২০০৮, পৃ. ১২৭

৮. Hasan Azizul Huq (ed), *Works of Govinda Chandra Dev,* Vol.1, Bangla Academy, Dacca, 1980, p. 229-230

৯. ড. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস সম্পাদিত *"জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ গোবিন্দচন্দ্র দেবঃ জীবন ও দর্শন"*, অবসর প্রকাশনা, জুলাই ২০০৮, পৃ. ১২৩

১০. ড. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস সম্পাদিত *"জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ গোবিন্দচন্দ্র দেবঃ জীবন ও দর্শন"*, অবসর প্রকাশনা, জুলাই ২০০৮, পৃ. ১৭

১১. হোসনে আরা আলম অনুবাদিত, *ভাববাদ ও প্রগতি*, মূলঃ ড. জি.সি. দেব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮,পৃ. চৌদ্দ

১২. পূর্বোক্ত, পৃ.১১০

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০

১৪. ড. প্রদীপ রায় সম্পাদিত ও সংগৃহীত, *"গোবিন্দ চন্দ্র দেব, অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা"*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৮৩

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৭

১৮. আফরোজান নাহার রাশেদা সম্পাদিত, *শিক্ষাবার্তা*, ৭৫, আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তলা) শাহ্‌বাগ, ঢাকা, এপ্রিল-২০০৯, পৃ. ১৫

১৯. ড. প্রদীপ রায় সম্পাদিত ও সংগৃহীত, *"গোবিন্দ চন্দ্র দেব, অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা"*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ২৯৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

গোবিন্দ দেবের নব্য নৈতিকতা

Dhaka University Institutional Repository

গোবিন্দ দেবের নব্য নৈতিকতা

সেই আদিকাল থেকে মানবসমাজের যাত্রা শুরু হয়েছিল অনাড়ম্বর, অসহায়-ভীতিজনক এক চরম অবস্থার মধ্য দিয়ে। সময়ের ধারাবাহিকতায় নানান সর্পিল পথ পেরিয়ে বৈচিত্র্যে-বিশেষত্বে সভ্যতার মুক্ত আবহে অবগাহিত হয়ে একবিংশ শতাব্দীতে সময়ের পদচারণা বড়ই বিস্ময়কর। তাই, এ সময়ের সমাজভাবনা, ধর্ম, সংস্কৃতি, দর্শনের সাথে আদিম সমাজের রয়েছে যোজন যোজন দূরত্ব। অতীতের বিশেষ করে মধ্যযুগের ধর্ম প্রভাবিত জীবন ব্যক্তিমানুষকে তার স্বাধীন চিন্তাচেতনা থেকে দূরে বহুদূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এক সুবিধাবাদী-ভোগবাদী জীবনব্যবস্থা, সাধারণ মানুষ পরিণত হয়েছিল শোষণ-বঞ্চনার নিষ্ঠুর হাতিয়াররূপে। তবে, এ অবস্থার উত্তরণ ঘটেছিলো ইউরোপীয় রেনেঁসা বা নবজাগরণের মধ্য দিয়ে। মানুষ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তা-চেতনাকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের তথা ব্যক্তির মুক্তির আবহ তৈরি করেছে।

বর্তমান যুগ বৈজ্ঞানিক-বস্তুবাদী যুগ। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সব আবিষ্কার নিঃসন্দেহে মানুষের জীবনযাত্রাকে করে তুলেছে আনন্দঘন, সহজ এবং আয়েশী। বিজ্ঞানের অভাবনীয় সাফল্য মানুষকে যেমন অনাবিল সুখের সমুদ্রে আনন্দে ভাসতে শিখিয়েছে অন্যদিকে মনুষ্যসমাজকে মারণী প্রবৃত্তিতে অভ্যস্ত করে তুলতেও তার জুড়ি নেই। আজকের এ পারমাণবিক যুগে বৈশ্বিক রাজনীতিতে যে অসহিষ্ণুতার নীতি বিদ্যমান রয়েছে এর দায় মনুষ্যসমাজ তথা সভ্যসমাজ এড়াতে পারে না। নীতিহীন সভ্যতা ধ্বংসের অনিয়ন্ত্রিত পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। মানবতা ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে পদে পদে। বিশ্বশান্তি নামের চোরাবালিতে তথাকথিত সভ্যতা আজ ডুবতে বসেছে। হাহাকার, ক্রন্দন, দীর্ঘশ্বাস, নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা, অন্যায়-অবিচার, অসামাজিক কার্যাবলী নিত্য অশুভ সব বিষয়গুলি বীরদর্পে নিজেদের উপস্থিতি ঘোষণা করে যাচ্ছে। নেই নৈতিকতা, নেই যুক্তিবাদীতা, নেই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির সেই আধ্যাত্মিক গুণাবলী। নৈতিকতা হৃদয়বৃত্তির অলংকার। অর্থাৎ, এটি হলো ন্যায়-অন্যায় বোধজাত সত্তাকে শুধু মাত্র যুক্তির তত্ত্বীয় আবরণে আচ্ছাদিত করা নয় বরং সত্য, সুন্দর ও কল্যাণময়তাকে হৃদয়ের গভীর থেকে উপলব্ধি করার এক অকাট্য প্রয়াস। এজন্য প্রয়োজন ধর্ম-বিজ্ঞান এবং দর্শনের সাথে মানবপ্রবৃত্তির এক সঠিক, সুষ্ঠু এবং সাবলীল সামঞ্জস্যবিধান। এসবের সঠিক মিলনই পারে বিশ্বশান্তি, ঐক্য তথা অগ্রগতির সুমহান আদর্শ রচনা করতে।

Dhaka University Institutional Repository

দেব সাধারণ মানবধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তারপরও শ্রেণীগত, গোষ্ঠীগত, সম্প্রদায়গত ধর্মকে কখনো তিনি অবহেলা করেনি। বরং ধর্মের সুমহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে মানবাত্মার, মানবকল্যাণের মুক্তির পথ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। দেব ধর্মকে কখনো ব্যক্তিচেতনা কখনো বা বহিঃসত্তার চেতনা বলে অভিহিত করেন এবং বলেন, "বহিঃসত্তার সে অভিজ্ঞতা, মানববুদ্ধি যাকে বুঝে উঠে না এবং ব্যাখ্যা করতে পারে না তা হচেছ ধর্মের মণিকোঠা মূল সুর। বাদবাকী সব হচ্ছে সে লক্ষ্যে পৌছুঁবার উপায়সমূহ এবং এর সত্যতা অবশ্যই সেভাবে বিচার করতে হবে।"[১] ধর্মকে দেব এক সুদৃঢ় সংযোগশক্তি হিসেবে মেনে নিয়ে এর ভিতকে সাধারণ মানুষের শান্তিলাভের এবং সর্বজনীন প্রেমের স্থায়ী প্রেরণার উৎসস্থল রূপে চিত্রিত করেছেন। দেব মানুষের ধর্মকে তার ভৌগলিক সীমারেখায় দাঁড় করাতে নারাজ। ধর্মের অবাধ বিচরণ এবং এর উচ্চমার্গের স্বাধীনতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ধর্মকে প্রচলিত নিশ্চলতা ও কঠোরতা থেকে মুক্ত করার মানসে একে জীবন্তশক্তির উৎস বলে মনে করেন। আচরিত অভ্যাস এবং যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে ধর্মের সর্বজনীনতায় উত্তরণকে, ফলপ্রসূ প্রয়াস বলে দেব বিশ্বাস করেন। এ প্রসঙ্গে দেব শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বজনীনতায় গমনের অভ্যাসকে অত্যন্ত সার্থক এবং সফল বলে মনে করেন। এবং রামকৃষ্ণ যেভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় ঐশী গুণগুলির সমন্বয়ে তাঁর চরিত্রকে জীবন্তকিংবদন্তীরূপে রূপায়িত করতে পেরেছিলেন তার প্রতি দেবের বিশ্বাস প্রকাশ অসাধারণ উঁচুমানের। দেব বলেন–

> "তাঁর স্বনামধন্য শিষ্য বিবেকানন্দ, সর্বজনীনতার বাণী ও মহিমা দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এবং সর্বান্তকরণে দুরদূরান্তরে প্রচার করেন। মহান বুদ্ধিজীবীগণ যেমন– রাজা রামমোহন, রুড্লফ্ ওটো এবং আরো অনেকে প্রধানতঃ যৌক্তিক আবেদনের মাধ্যমে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। বিশ্বাস করি ভবিষ্যৎ ধর্ম তার কেন্দ্রবিন্দু খুঁজে পাবে এ ঐক্যের তাৎপর্যের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির সার্বজনীনতায়।"[২]

দেব দর্শনের সমন্বয়ধর্মীতা জীবনভিত্তিক। এই জীবনের সাথে সম্পৃক্ত ধর্ম এবং বিজ্ঞান। প্রত্যাদেশিত ধর্ম বা ঐতিহাসিক ধর্ম যা-ই হোক না কেন এটি ছিলো দেবের অধ্যাত্মদিকের চরম উৎকর্ষিত রূপ। ধর্ম ও বিজ্ঞানের যথাযথ মূল্যায়নের আলোকে মানব আচরণকে বিশেষায়িত করেছেন তিনি। মানবমনের বিচ্ছিন্ন ভাবনাগুলোকে একসূত্রে গ্রথিত করেই চিত্রিত করেছিলেন সুসমন্বিত এক মহাবিশ্বের রূপকল্পনা। সাধারণ মানুষের অনুভূতিগুলিকে আপন অন্তরে ধারণ করে নিজ হৃদয়বৃত্তির

Dhaka University Institutional Repository

ঔদার্য্যের আলোকে তাদের দুঃখ দুর্দশা মোচনে সচেষ্ট হয়েছেন। সাধারণ মানুষ যুক্তির চেয়ে বিশ্বাসে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করে। বিশ্বাসের শেকড় প্রোথিত মানুষের হৃদয় গভীরে । হৃদয় উৎসারিত গভীর বিশ্বাস থেকেই আধ্যাত্মিকতার সূচনা। আধ্যাত্মিকতা পূর্ণতা পায় ধার্মিকের নির্ভেজাল ধর্মানুশীলনে, বিশ্বাসে, প্রত্যয়ে। ধর্ম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এভাবে তার মতামত ব্যক্ত করেছেন–

> "মানববৃত্তির সম্যক অনুশীলনই ধর্ম; শারিরীক বৃত্তি, জ্ঞানার্জন বৃত্তি, কার্যকারিণী বৃত্তি ও চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি–এই বৃত্তিগুলোর যথাযথ বিকাশ ঘটিয়েই যে মানুষ মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারে এবং মনুষ্যত্ব অর্জনের সাধনাই মানুষের আসল ধর্ম সাধনা। বঙ্কিমের এসব কথাকে বিজ্ঞানসম্মত বলে দাবী করেন অধ্যাপক মোজাফফর হোসেনও। যিনি সমকালীন বৈজ্ঞানিক প্রেক্ষাপটে একজন বিজ্ঞানমনস্ক ও মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন আধুনিক মানুষ বলেই খ্যাত।"[৩]

ধর্ম একদিকে যেমন জীবনপদ্ধতির নিয়ামক অন্যদিকে এটি মানুষকে পরিশীলিত জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করে বিশ্বপ্রগতির সহায়ক হতে সাহায্য করে। এতে সুসংগঠিত হয় মানুষের চিন্তা, কর্ম, ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা । মূলত ধর্ম ও নীতিবিদ্যা হচ্ছে মানব আচরণের আদর্শিক দু'টি অনুষঙ্গ। যার মাধ্যমে মানুষ বেঁচে থাকার নিগুঢ় তত্ত্বের সন্ধান লাভ করে। আর তা হতেই বিকশিত হয় সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক জীবনের সুনিয়ন্ত্রিত প্রবাহ। জীবনের এই মহাযাত্রায় পরিপূর্ণতা প্রদান করে নীতি নৈতিকতা সম্পন্ন গভীর ধর্মীয় অনুশাসন যা মূল্যায়িত হয় মানুষের চারিত্রিক ঔদার্য্যে, পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধনে। মানুষের সেবা করাই হলো ঈশ্বরের সেবা করা। ধর্ম ও নৈতিকতা পরিপূর্ণরূপে অর্থবহ হয় তখনই যখন তা মানুষের মধ্যে ঐক্য, প্রেম, সম্প্রীতি ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালে ভক্ত ও অনুসারীদের অনুরোধে আমেরিকার চিকাগো শহরে বিশ্ব ধর্মসভা ও মহাসম্মেলনে যে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন তার কিছুটা এরকম: "বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয় পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।"[৪] স্বামী বিবেকানন্দ যেমন মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করার প্রচেষ্টায় রত ছিলেন, তেমনি নিবিষ্ট চিত্ত ছিলেন মনীষী বিবেকানন্দেরই অনুসারী দেবতুল্য গোবিন্দ দেবও। লক্ষণীয় আরেকটি বিষয় হলো স্বামী বিবেকানন্দের পিতৃবিয়োগে তিনি যেমন পুরো পরিবারসহ অসহায় হয়ে পড়েন তেমনটি ঘটেছিলো গোবিন্দ দেবের বেলাতেও। প্রাচ্যের এই ক্ষণজন্মা দুই মনীষীর আত্মিক

Dhaka University Institutional Repository

দিক থেকেও সাদৃশ্য প্রচুর। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন জীবন্তসত্তা মানুষকেই ঐশী গুণসম্পন্ন বলে মনে করতেন তেমনি দেবের চিন্তাচেতনায়ও বিবেকানন্দের সুস্পষ্ট প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিলো। আদর্শে, প্রেরণায় দেব সমভাবে উজ্জীবিত ছিলেন বিবেকানন্দের ভাবদ্বারা। ধর্মীয় যাগযজ্ঞ এবং বাহ্যিক আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মগুলিকে বিবেকানন্দের মতো দেবও গৌণ অর্থেই গ্রহণ করেছিলেন। বিবেকানন্দের মানবপ্রেম সর্বজনবিদিত। দুর্বল, নিপীড়িত, দুর্দশাগ্রস্তদের প্রতি বিবেকানন্দ ছিলেন উদারচিত্তের এক মহান ব্যক্তি। দেবের দৃষ্টিভঙ্গিও এর ব্যতিক্রম নয়। তিনি তাঁর *Aspirations of the Common Man* গ্রন্থের ভূমিকায় এভাবে বলেন, "The moorings of my heart, my dreams and visions, if any, that have sustained me through my struggles centre round them."[৫] দেবের এই মানসিক শক্তির প্রচণ্ডতাই তাকে সাধারণ মানুষের একজন করে তুলেছিলো। তদুপরি তিনি সজাগ ছিলেন এ বিশ্বের বিজ্ঞানভিত্তিক অনুশীলনের ভয়াবহতা সম্পর্কে। দেব গভীরভাবে উপলব্ধি করেন, বৈজ্ঞানিক পারমাণবিক যুগে শুধুমাত্র মানবতাবাদ দ্বারা সর্বকুল রক্ষা করা সম্ভব নয়। এর সাথে প্রয়োজন মানবমনের গহীনে লুকায়িত অধ্যাত্মবাদের সংমিশ্রণ। এছাড়া, মানব অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবার সম্ভাবনাই অনেক বেশি। তিনি আশা প্রকাশ করেন, মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষায় অবশ্যই পুরনো আধ্যাত্মিক ঐক্য দর্শনে ফিরে যাবে। কেননা, মানুষ পরিপূর্ণভাবে সফলতা লাভ করে বেঁচে থাকতে চায়। আর বেঁচে থাকার সঞ্জীবনী শক্তি তার শেকড়ের সাথেই সম্পৃক্ত। অন্যথায়, এ জগতে মানুষের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। দেবের চিন্তানুযায়ী অধ্যাত্মবাদ কথাটি নিছক স্বর্গপ্রাপ্তি বা পারলৌকিকতাকে বোঝায় না। তবে, আধ্যাত্মিক ধারণা বুদ্ধ এবং খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদেরও শাশ্বত ঐক্যের চিরন্তন বাণীতে যুগে যুগে বিধৃত হয়েছে। এই শাশ্বত প্রেমের বাণীকেই দেব গ্রহণ করেছেন তাঁর জীবনাদর্শের প্রথম এবং প্রধান হাতিয়ার রূপে। সেখানে প্রেম শুধু হৃদয়াবেগ দ্বারা অন্ধ নয়; প্রেমকে মহিমান্বিত করা হয়েছে সেবার নীতি দ্বারা। ব্যাপকভাবে তা বিশ্বমানের নিরবচ্ছিন্ন মমত্ববোধের এক বিস্ময়কর প্রতিফলন। দেবের বিশ্বাস এ শাশ্বত প্রেমের ধারায় সাধারণের ঐক্য-দর্শনের প্রতিলিপি স্বরূপই মানুষ নিশ্চিহ্ন না হয়ে বেঁচে থাকার সামর্থ্য অর্জন করবে। আর এ সামর্থ্য অর্জনই হচ্ছে দেবের ভাষায় প্রয়োজনের ধর্ম। ডারউইনের 'যোগ্যতমের বেঁচে থাকা' থিওরিতে রয়েছে কোনো না কোনোভাবে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ এক যুদ্ধংদেহি মানবসম্প্রদায়। কিন্তু দেবের যোগ্যতার মানদণ্ডটির প্রেক্ষিত সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি এভাবে বলেন,"আজকের

Dhaka University Institutional Repository

মানবসমাজে যোগ্যতার মাপকাঠি অনিবার্যভাবে ক্ষমতা নয়, দৈহিকশক্তি, উৎপীড়ন নয় বরং প্রেম, অন্তরে সহানুভূতি, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব; মনোমুগ্ধকর আচরণ এবং এসবগুলির শেষ বিশ্লেষণে একটি আধ্যাত্মিক মাত্রা আছে।"[৬] এসব কিছুর সম্মিলিত অভিব্যক্তিই মানুষের বস্তুগত দিকের যথার্থ বিকাশ তথা মানসিক উৎকর্ষ অর্জন করে আধ্যাত্মিক আদর্শবাদ স্বর্গ থেকে মর্ত্যের ধূলিধুসরিত অবস্থানে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

নবযুগের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়ের মতাদর্শের সাথেও দেবের মতাদর্শের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। রাজা রামমোহন রায় ধর্মীয় কুসংস্কার ও গোঁড়ামির অচলায়তন চূর্ণ করে দিয়ে চেয়েছিলেন মানুষের সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে। ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনিও এমন এক আগত বিশ্বের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যার মূলে ছিলো না কোনো রাজনৈতিক কূট-কৌশল, ছিলো শুধু বিশ্বজনীন মানবপ্রেমের অনুপ্রেরণা। ধর্মীয় উন্মাদনাকে তিনি বিনাশ করতে চেয়েছিলেন, কেবল মানবতার কল্যাণে। মানুষের সার্বিক কল্যাণকে সবার উপরে স্থান দিয়ে বিশ্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাই তিনি সেদিন ফরাসি বিদেশমন্ত্রীকে লিখেছিলেন–

> "It is now generally admitted that not religion only but unbaised commonsense as well as the accurate deductions of scientific research led to the conclusion that all mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are only various branches."[৭]

উনিশ শতকের নৈতিকতাবোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে নানান চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ধর্ম তার তথাকথিত ছদ্মাবরণ পরিহার করে বর্তমানে মানবকল্যাণের প্রধান হাতিয়াররূপে পরিগণিত হয়েছে। ধর্মের সাথে নীতিবোধের সংমিশ্রণ সমাজ জীবনে, ব্যক্তিজীবনে, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুগান্তকারী এক মাত্রার সূচনা করেছে। বিশ্বমানবতাবাদের গোড়াপত্তনও হয়েছিলো রাজা রামমোহনের উন্নত চিন্তার পথ ধরেই। তবে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পথ ধরেই রাজা রামমোহন সর্বধর্ম এবং সর্বমত সহিষ্ণুতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে সকল প্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামির কবল থেকে সমাজকে মুক্ত করার প্রত্যয় দিয়ে ব্রাহ্মধর্মীয় চিন্তা-চেতনাকেই স্বাভাবিকতা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে গিয়েছেন। তবে, এরূপ প্রচেষ্টাও যথাযথ সাফল্য লাভে ব্যর্থ

Dhaka University Institutional Repository

হয়। নানান মতবিরোধের মুখে ধর্মজগতে অনৈক্য পরিলক্ষিত হতে থাকে । এসব ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যে দিয়েই উনিশ শতকের নৈতিক চেতনা বিকশিত হয়। "আধুনিক গবেষকদের অনুসন্ধানে দেখা গেছে প্রত্যক্ষভাবে হোক আর পরোক্ষভাবেই হোক বাঙালির চিন্তাধারায় নীতিচর্চার এত প্রধান্যের কারণ হচ্ছে প্রধানত সমকালীন ধর্মবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া। সমকালীন ধর্ম পরিস্থিতিই বাঙালিকে নীতিচর্চায় আগ্রহী করে তুলেছে।"[৮] এক্ষেত্রে দেবের ধর্ম ও নৈতিকতার পরিপ্রেক্ষিত খানিকটা ভিন্ন। দেব নীতিচর্চা এবং ধর্মবোধকে কালোত্তীর্ণরূপে চিত্রিত করার প্রয়াস পান। দেব নৈতিকতা বিষয়টিকে জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডির ভেতরে আবদ্ধ না রেখে বিশ্বজনীন মানবধর্মে পরিণত করেছেন পরিশুদ্ধ, যুক্তিনিষ্ঠ, মননশীল এবং বুদ্ধির পারাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেই। ঐতিহাসিক ধর্মগুলিকে সমানভাবে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে রেখেই শুধুমাত্র তার আঙ্গিক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তার নতুন মতাদর্শকে।

দেব দেখিয়েছেন, ঐতিহাসিক ধর্মগুলো মানুষকে ঐক্যের ধারণা প্রদানে সফলকাম হয়নি। কেননা, ধর্মবোধে উজ্জীবিত সমষ্টিগত জীবনের চিন্তাচর্চায়, আচার-নিষ্ঠায় কেবল এর প্রথাসিদ্ধ বাহ্যিক দিকটিকেই প্রকাশিত করে আত্মিক দিকটিকে বর্জন করে। ফলশ্রুতিতে, তা অকল্যাণের পথকেই প্রশস্ত করে তোলে। সময়ের চাহিদাকে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। দেব তা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতেন বলেই তাঁর দর্শন নতুন নৈতিকতায় বিশ্বমানব কল্যাণের ছোঁয়া দিয়েছেন । মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির মূলেও ছিলো সর্বজনীন মানবপ্রেম। সময় এবং পরিবর্তনের চেতনাকে ধারণ করেই গান্ধী জীবনের দর্শন এগিয়ে গিয়েছে। মনুষ্যপ্রেমে উদ্বেলিত মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে হোসেনুর রহমান লিখেছেন–

> "গান্ধী জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থ পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন এবং প্রয়োজনে সংযোজন। গান্ধী মানুষ, প্রকৃতি, জগৎ ও দেশকে এক অনবদ্য কবিতা বলে বিশ্বাস করেছেন। এবং বার বার বলেছেন, কোন ব্যবস্থা, কোন যান্ত্রিকতা, কোন শিল্প কিংবা রাষ্ট্রবিপ্লব গান্ধীর আরাধ্য দেবতা মানুষের চেয়ে বড় নয়। মহাত্মা গান্ধীর 'হিন্দ-স্বরাজ' এর ইউরোপীয় পাঠকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল একারণে যে, গান্ধী লিখেছিলেন,পাশ্চাত্য সভ্যতা মানুষকে তার যথার্থ মর্যাদা প্রদান না করে মানুষকে স্বার্থান্ধ, স্বেচ্ছাচারী এবং বৃহত্তর মানবসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। গান্ধীর বিচারে তাদের দাবী এরকম– Material

Dhaka University Institutional Repository

progress spells moral progress. And there is taken a sudden jump: what is true of thirty millions is true of the Universe. They forget that hard case make bad law. এবার গান্ধীর যুক্তি অকাট্য। I need hardly say to you how indecorously absurd this diduction would be. No one has ever suggested that grinding pauperism can held to anything else than moral degradation."[৯]

ক্রমবর্ধমান বস্তুগত চাহিদার একক বিস্তারকে মহাত্মা গান্ধী যেমন নৈতিক অধঃপতনের মূল কারণ বলে মনে করেছেন তেমনি দেবও বস্তুগত দিকের একক বিস্তাররোধে সোচ্চার ছিলেন। তবে দেব বস্তুগত দিকটিকে বাদ দিয়েও তার দর্শনালোচনা করেননি। দেব ধর্ম এবং নৈতিকতার ক্ষেত্রে মানুষের ধর্ম এবং তাঁর উর্বর মননের দিকটি যথাযথভাবে উপলব্ধি করার প্রয়াস পেয়েছেন। মৌলিকত্বের আবর্তে ধর্মকে তিনি সব সময়ই সংস্কারপন্থী করে তুলতে আগ্রহী। পুরনো মৌলিক বিষয়গুলিকে নতুনভাবে উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে নতুন পরিবেশের সাথে অভিযোজন করতে চেয়েছেন বারবার। দেব যথার্থই বলেছেন, বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক ঐক্যের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতীত পৃথিবীর কোনো দর্শন, কোনো ধর্ম, কোনো তত্ত্বই তার লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে না। মহাশক্তিধর বিজ্ঞান তার ভৌত ঐক্যের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে ধর্ম ও দর্শনের আধ্যাত্মিক ঐক্যের মাঝে। এবং দেব বিশ্বাস করেন, বিজ্ঞান সম্ভবতঃ নিজের অজান্তেই মানুষের আধ্যাত্মিক ঐক্যের বিষয়টিকে অধিকতর অনুধাবনের প্রেরণা যুগিয়ে গেছে। দেবের এহেন বক্তব্যে জড়সত্তা ও আধ্যাত্মিক ঐক্যের এক সুদৃঢ় মেলবন্ধন প্রকাশিত হয়েছে। যে বাণী ঘোষিত হয়েছে ইসলাম ধর্মে। জ্ঞানের সাধক আল্লামা ইকবালও বস্তু ও আত্মাকে ভিন্ন মনে না করে একই সত্তার এপিঠ ওপিঠ বলে মনে করেছেন। দেবের দর্শন অলংকৃত হয়েছে বিভিন্ন ধর্ম তথা দর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ আর সমন্বয়ের মহা ঐক্যের দ্বারা। মানবমনের গভীরে যে বিশ্বাস লুকিয়ে আছে সেই বিশ্বাসকেই তিনি আঁকড়ে ধরেছেন চলমান জীবনের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে। আদর্শিকতার নিরিখে বৃত্তি বা প্রবৃত্তির ধারক বাহক হলো মানবমনের বিশ্বাস। এটি হলো প্রতিটি মানবজীবনের ভিত্তিমূল। অজান্তেই মানুষের মনে জন্ম নেয় বিশ্বাস। দেব আধ্যাত্মবাদের প্রথম সোপানরূপে এই বিশ্বাসকেই সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গির অর্ন্তনিহিত সুর বলে মনে করেছেন। তবে, পূর্ণতার প্রয়োজনে দেব এর সাথে সংযুক্ত করেছেন মানব মনের সহজাত আরেকটি চাহিদাকে। যা হচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুগত দিকের স্বাভাবিক এবং সর্বপ্রয়োজনীয় চাহিদা। আধ্যাত্মিক জীবনের বিশ্বাস এবং পার্থিব জীবনের বস্তুগত প্রয়োজন উভয়ের মিলনেই কাঙ্ক্ষিত মানবকল্যাণ সাধিত হবে, সুরক্ষিত হবে অগ্রগতির ধারা। দেবের দার্শনিক ধারায় নিহিত ছিল নিপীড়িত-নির্যাতিত জনতার প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধ। মমত্ববোধ, মর্মবেদনা তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে অগণিত সাধারণ মানুষের অতি নিকটে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে দেবের কথা, লিখা, চিন্তা-চেতনা ও মনন-মজ্জায়। দেবের আচরণেও ছিলো তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন। অনুধ্যানী দেব তাঁর দর্শনকে 'সমন্বয়মূলক দর্শন,' 'আলুদর্শন' এসব নামে নামকরণ করেন। দেবের আলোচনার খণ্ড খণ্ড রূপ শুধু নামকরণ সর্বস্বই নয় এসবের বিন্যাসে বিস্তারে ঘটেছে তত্ত্ব, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, সহজ-সরল-সরস উপস্থাপন, ভাব-ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ এক অপূর্ব সমন্বয়সাধন। হাস্যরসপ্রিয় এই প্রাণবন্ত মানুষটি দর্শনকে জীবনদর্শন হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

মানবজীবনের বাঁকে বাঁকে উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের যে ক্লান্তিহীন দোলাচল বিদ্যমান রয়েছে এসবের উন্মাদনা থেকে মানবকুলকে রক্ষার জন্য তিনি উপলব্ধি করেছেন এক সুমহান মধ্যপথের সাধনা। যে সাধনায় সম্মিলন ঘটে ধর্মের সাথে দর্শনের, বিজ্ঞানের সাথে ধর্ম ও দর্শনের, বিজ্ঞানের শক্তির সাথে ধর্ম থেকে পাওয়া প্রেমের এবং সর্বশেষে অধ্যাত্মবাদের সাথে জড়বাদের। তিনি জগৎ ও জীবনকে একদেশদর্শী বা খণ্ডিত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেননি। তিনি দার্শনিক এরিস্টটলের মতো 'সুবর্ণ মধ্যক' (Golden mean) এর সাহায্যে জগৎ জীবনের রূপকল্প তৈরি করেছেন। ধর্মের খণ্ডিত, অনুদার, রক্ষণশীলতাকে বর্জন করে মূল্যবোধ আশ্রয়ী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি ছিলো দেবের গভীর আস্থা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলতে হয় ধর্মের নিহিতার্থ হচ্ছে সর্বজনীন মানব ঐক্য। আর এই মানবসৃষ্টির রহস্য অনুসন্ধান করতে যেয়েই কৌতুহলী মানুষ বিশ্বাসী হয়ে উঠে আদি সত্তার অস্তিত্বে। আদি সত্তার অস্তিত্বের অভ্যন্তরীণ রূপটি মানুষ খুঁজে পায় বিশ্বমানবতার সার্বিক কল্যাণের মধ্যে। যা এক নতুন জীবনাদর্শের মূর্ত প্রতীক। কোনো মত বা কোনো থিওরি মানব জীবনাদর্শের রূপকার নয়। শুধুমাত্র নিরঙ্কুশ প্রেম এবং সংযমের সাধনাই মানুষকে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

দেবের নব্য নৈতিকতায় প্রকাশিত মূল রূপরেখাটি 'শান্তি'। সমগ্র বিশ্বময় শান্তির অমৃত বাণী বেজে উঠবে এমনটিই তাঁর প্রত্যাশা ছিলো। ধর্মে-কর্মেই নিহিত অনাবিল শান্তির অমিয়ধারা। সে ধর্ম হবে লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ বিবর্জিত এক মানবধর্ম। যে ধর্মভাবের পরিচয় মেলে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি কাব্যে–

'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে
সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।'[১০]

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের এমন ভাবের আবেশ উদয়ের পেছনে যে কারণটি ছিল তা হলো, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সমগ্র ইউরোপসহ সারাবিশ্ব এক অজানা আতঙ্কে ডুবে ছিলো। সর্বত্র ক্ষুধা, মৃত্যু, হুঙ্কার, যুদ্ধের দামামা সব মিলিয়ে অস্থির অশান্ত পরিবেশ। এ ভাবনার অবসান কামনায় লেখক ইজাজ হোসেন তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'সংগীত সরোবরে বিভাসিত পদ্মে' বলেছেন–

> "মানুষের লাভ ও লোভের অসংবৃত প্রকাশে, তার ধর্মকামী মনোবৃত্তিতে যুদ্ধংদেহি কঠিন অবয়ব বড়বেশি নগ্ন হয়ে উঠছিল। চিরকালীন শান্তিকামী মানুষের অন্তরাত্মা অজানা আশঙ্কায় মূর্ছিত হয়ে পড়ছিল। সে সময়ে আকুলিত হৃদয়ের উজাড় করা ভগবান-উদ্দিষ্ট নরম বক্তব্যে সবাই সাময়িক শান্তির আবেশ খুঁজে পেয়েছিলেন।"[১১]

রবীন্দ্রনাথের সাথে দেবের সাদৃশ্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ যেমন হৃদয়বৃত্তির গভীরের রসে সিঞ্চিত হয়ে বাহিরের বৃত্তি-প্রবৃত্তিগুলিকে আপনার করে নিয়েছিলেন তেমনি দেবও হৃদয়ের সুগভীরে প্রোথিত মহাঐক্যের বাণী স্বকর্ণে শুনতে পেয়েছিলেন। এই গভীর সত্যটি আরো সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে। তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন এভাবে–

> "এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগতকে বিশেষরূপে আপনার করিয়া লই। যেমন জঠরে জারক রস অনেকের পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকায় বাহিরের খাদ্যকে তাহারা আপনার শরীরের জিনিস করিয়া লইতে পারে না– তেমনি হৃদয়বৃত্তির জারক রস যাহারা পর্যাপ্তরূপে জগতে প্রয়োগ করিতে পারে না, তাহারা বাহিরের জগৎটাকে অন্তরের জগৎ, আপনার জগৎ করিয়া লইতে পারে না।"[১২]

প্রচলিত ধর্মগুলির অনুদার মনোভাব আর রক্ষণশীল কঠোরতা মানুষে মানুষে অনৈক্য এবং বিভেদ সৃষ্টি করেছে। দেবের মতে, ধর্মের মর্মমূলে পৌঁছে তার বহিরাবরণের ক্ষতিকর দিকগুলোকে পরিহার

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারলে মানুষ তার কাঙ্ক্ষিত শান্তির লক্ষ্যে পৌঁছাঁতে পারবে। দেব মনে করেন, ভবিষ্যত ধর্মের ভূমিকা হওয়া উচিত বস্তুকে আধ্যাত্মিককরণ নয় আত্মাকে বস্তুগতকরণও। প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের মধ্যেই রয়েছে অসহায়ত্ববোধ। আর এই বোধ থেকেই জন্ম নেয় বিশ্বাস, অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাস। ঈশ্বর বিশ্বাসী শক্তি মানবমনে অসীম প্রেরণার সঞ্চার করে। মানুষকে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে তোলে। এরূপ বিশ্বাসই জগতের সাধারণ মানুষের বস্তুগত কল্যাণ তথা আত্মিক উন্নতিসাধন করে সামগ্রিক নিরাপত্তা বিধান করে। দেবের নব্য নৈতিকতার মূললক্ষ্য হলো সমগ্র বিশ্বমানবের মধ্যে এক সুসঙ্গতিপূর্ণ ভাব গড়ে তোলা। যাকে তিনি পরমকল্যাণ বা শুভ বলে আখ্যায়িত করেছেন। দেব নব্য নৈতিকতার সাথে অগ্রগতির বা প্রগতির ধারণাকে সংযুক্ত করেছেন। মানব প্রগতির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা উচিত বলে তিনি মনে করেন। আর এ লক্ষ্য অর্জনে তিনি নতুনত্বের আবহ থেকে কুসংস্কার, লোকাচার, আর উচ্ছৃঙ্খলতাকে পরিহার করে জীবনের কষ্টি পাথরে ঘষে নতুনত্বকে প্রাণবন্ত করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ–

> " 'প্রগতি' শব্দটি দ্বারা তিনি বোঝাতে চান মানুষের জীবনের এই পরম ও মৌলিক উদ্দেশ্যকে অধিকমাত্রায় অর্জন করা। এই অর্জনের মাত্রা যত অধিক হবে প্রগতিও তত অধিক হবে এবং এই মাত্রা যত কম হবে প্রগতিও তত কম হবে। দেব তাঁর *Aspirations of the Common Man* গ্রন্থে এই নীতিদর্শনকে 'নব্য নৈতিকতা' বলে আখ্যায়িত করেন।"[১৩]

গোবিন্দ দেবের 'সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা' অনুবাদ গ্রন্থে 'কোন বাস্তব দ্বন্দ্ব নয়' শীর্ষক এ জড়বাদ ও আধ্যাত্মবাদকে কোনো আধ্যাত্মিক কিংবা দার্শনিক মতবাদ না বলে 'বিচিত্র মানবাত্মার সন্তানরূপে' আখ্যায়িত করেছেন। সমগ্র সৃষ্টিকুলের মধ্যে মানব প্রজাতি এক বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি। কখনো এই বিচিত্র মানুষ ঘুমিয়ে থাকা শিশুর মতো মাতৃকোলে আশ্রয় গ্রহণ করে, কখনো বা নজরুলের নটরাজের মতো রুদ্র ভয়ংকর রূপে আত্মপ্রকাশ করে। মানবসন্তান তার চরিত্রের কোনো স্থিরচিত্র খুঁজে পায় না। সৃষ্টির বিচিত্রধারায় প্রকৃতির কোলে সেও নব বৈচিত্র্যের উদ্ভাবক। মনস্তাত্ত্বিকভাবেও মানুষ বৈচিত্র্যের আধার। সাদা-কালোর বিচিত্র তুলিকায় যে ছবি মানবমন এঁকে চলেছে প্রতিনিয়ত তার রং যেমন বৈচিত্র্যে ভরপুর তেমনি তার হৃদয় উৎসারিত আরাধনার প্রকৃতিও বৈচিত্র্যপূর্ণ। দেবের মতে, জড় এবং চেতনের এক জটিল সংমিশ্রণেই তৈরি বিচিত্র মানব প্রজাতি। বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক উভয়

Dhaka University Institutional Repository

দিকেরই যথার্থ মূল্যায়ন ঘটবে তখনই যখন বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মনির্ভর, পার্থিব এবং অপার্থিব এর সমুদয় পার্থক্য দূরীভূত হবে। দেব মনে করেন, ভবিষ্যতের নতুন নৈতিকতায় সংমিশ্রণ ঘটবে এমন এক ব্যাপক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি যার অনুশীলন অব্যাহত থাকবে বৃহত্তর মানব জীবনের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক পরিসরে। সেই ব্যাপক জীবনে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক দিকের মধ্যে সুস্পষ্ট কোনো সীমারেখা না টেনে নৈতিক-আদর্শিক ভাবের সমন্বয় ঘটিয়ে সার্বিক মানবকল্যাণে এর অগ্রযাত্রাকে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে পরিচর্যা করতে হবে। তাহলেই এই 'নব্য নৈতিকতা' পূর্ণাবয়বে বিকশিত হয়ে সভ্যতার অগ্রগতি ও অগ্রযাত্রাকে সুরক্ষিত করতে সহায়তা করবে। দেবের নব্য নৈতিকতায় 'আলুদর্শন' এর আলোচনা একটি সার্থক চটকদার দিক নির্দেশনা। এই বর্ণনায় দেব ধর্ম ও দর্শনের নিরস তত্ত্বকে সরস, সাবলীল ও জনপ্রিয় করে তোলার প্রয়াস চালিয়েছেন। প্রগতির ধারায় আলুদর্শনের সংযোজন এবং এর তাৎপর্য মোটেই কম নয়। গৌতম বুদ্ধ তথা বুদ্ধের প্রায় দু'হাজার বছর পরেও ভারতীয় দর্শনের লম্বা ইতিহাসে কোথাও আলুদর্শনের সাক্ষাৎ মেলে না। দেব 'আলু দর্শনের' নামকরণ প্রসঙ্গে চমৎকার পৌরাণিক ব্যাখ্যা উল্লেখ করে বলেন–

> "নৈমিষারণ্যের ঋষি–সভায় ব্যাস বলেছিলেন কলির শেষের দিকে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার অভ্যুদয়কালে জগতের জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের উপযোগী আমিষ ও নিরামিষভোজীর সমভাবে প্রিয়, গোলাকার ক্ষুদ্রকায় ঈষৎ চর্মাবৃত এক খাদ্যের উৎপত্তি হবে; তার বৈশিষ্ট্য হবে অগ্নি কিংবা বাষ্পযোগে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রারম্ভে নারীরা ও পরবর্তীকালে তাদের অনুচর নরেরা যে সমস্ত সুস্বাদু আহার্য প্রস্তুত করবে তার সবগুলোর ভিতর নিজের স্বতন্ত্র সত্তা হারিয়ে সে তাদের স্বাদবৃদ্ধি করবে। এই অসম্ভব আত্মবিস্মৃতি, এই উদার সমঞ্জসী দৃষ্টি ও গুণগ্রাহিতাই হবে আলু-দর্শনের বৈশিষ্ট্য। অন্ধকারাচ্ছন্ন কলিযুগে এই আলু-দর্শনই হবে দ্বন্দ্ব সমাকুল, দুঃখজর্জরিত মানবতার একমাত্র আলোকবর্তিকা। তাই আলোকের অনুকরণে তার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা হবে 'আলু'। কতিপয় ভ্রান্তমানব এই অদ্ভুত পদার্থের বাহ্য আকারে আকৃষ্ট হয়ে এর নাম দেবে গোল আলু। তারা জানে না গোলাকার পৃথিবীর সব মানুষের কল্যাণের প্রতীক সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই বিধাতা পুরুষ আলুকে গোলাকার রূপ দিয়েছেন।"[১৪]

তবে, আলোচ্য অংশে দেব একথা বলে আশ্বস্ত করেছেন যে, সামঞ্জস্যহীনতা ও উপযুক্ত শব্দের অভাবে 'গোল আলু দর্শন' বলে তিনি মোটেও এর গুরুত্বকে কমিয়ে তো নয়ই বরং তার আদর্শকে

Dhaka University Institutional Repository

যুক্তিযুক্তভাবে বাড়িয়ে তুলেছেন। ইসলাম ধর্মে মধ্যপথ, ভগবদগীতার সমন্বয়ধর্মীতা গৌতম বুদ্ধ ও যিশু খ্রিষ্টের মনেও এরূপ সমন্বয়ধর্মী আবেদন লক্ষণীয়। আর এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে আগামী দিনের প্রবল শক্তিশালী জীবনদর্শন। যা পৃথিবীর প্রতিটি নর-নারীর সুখী-সমৃদ্ধশালী জীবন গঠনে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটিয়ে ফলপ্রসূভাবে বিশ্বভিত্তিতে এই মানসিকতা তৈরি করবে বলে দেব বিশ্বাস করেন। 'আলুদর্শন' ভাষ্য যেন মানব ইতিহাসের আঁকাবাঁকা গতির উত্থান-পতনের এক সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা। আলুদর্শনের প্রতি অনুরাগকে দেব সত্যিকার প্রগতির সোপান এবং বিরূপতাকে পতনের অশনি-সংকেত বলে অভিহিত করেছেন। আলুদর্শনের এরূপ সক্রিয় ঐতিহাসিক গতিময়তাকে দেব অল্প পরিসর ভবিষ্য-পুরাণ বলেও অভিহিত করেন। দেবের আলুদর্শনের আলোচনা অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। মানব ইতিহাসের ক্রমবর্ধমান সংযোজন, বিয়োজন, সমন্বয়ধর্মীতা, সমন্বয়হীনতা এবং সমগ্রসী দৃষ্টিভঙ্গির এক জোরালো ভাষ্য নিহিত রয়েছে দেবের আলুদর্শন বক্তব্যে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যসহ সমগ্র পৃথিবী যেদিন বৈজ্ঞানিক জড়বাদের একতরফা বিধ্বংসী তাণ্ডবে আতঙ্কিত হয়ে পড়বে, জড়শক্তির অব্যাহত অনুশীলনে নগ্ন হয়ে উঠবে বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান ভয়াল-মূর্তি, জনপদের পর জনপদ যেদিন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হবে সেদিনেই মানুষ ফিরে যেতে চাইবে সেই অতি পুরনো অধ্যাত্মদৃষ্টির পথে। নরম্যান সলোমনের ভাষায়–

> "পারমাণবিক শক্তির এমন নিরাপদ বিকাশ পুরো পৃথিবীর জন্য এক বিরাট হুমকি। ইউরেনিয়াম থেকে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে যে বর্জ্য আসে, তা হাজার বছর ধরে ক্ষতিকর হিসেবেই থাকে। এটি প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের নৈতিক বিপর্যয়। হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে যে পারমাণবিক ছাই রয়েছে, তা এখনো উত্তাপ বড়ানোর জন্য দায়ী। (জাপানের সাবেক) প্রেসিডেন্ট ডুয়েট আইজেনআওয়ার এই ভয়ানক পারমাণবিক সংকটের সমাধান খুঁজছেন। তিনি বলেছেন, এর মধ্যমে মানুষ নিজেকে মৃত্যুর কাছে উৎসর্গ করতে পারে না।"[১৫]

তবে, আশার কথা হলো–"নরম্যান সলোমন বলেছেন, ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের থ্রি মাইল আইল্যান্ডের দুর্ঘটনা, ১৯৮৬ সালে চেরনোবিলের দুর্ঘটনা এবং জাপানের সাম্প্রতিক বিপর্যয় করপোরেট তাত্ত্বিকদের নতুন ভাবনার দিকে নিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।"[১৬] বিদ্যমান বিশ্বসভ্যতায় নিউক্লিয়ার প্লান্টের ব্যাপক বিস্তার ও অপ্রতুল রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা বৈশ্বিক পরিবেশকে প্রচণ্ড হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। সারাবিশ্ব আজ ভয়ানক আতঙ্কগ্রস্ত; প্রয়োজন দেবের সেই ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত

Dhaka University Institutional Repository

সম্মোহনী শক্তির সুদৃঢ় আহ্বান। নরম্যান সলোমনের মতো করে আশা করা যায়, বিপর্যস্ত বিশ্ব সত্যিকার অর্থেই সভ্যতা রক্ষার্থে নতুন ভাবনার সংযোজন ঘটাবে। দেব দর্শনের সফলতা এখানেই। দেব যথার্থই বলেছেন–

> ''মানুষ আবার ফিরে যেতে বাধ্য হবে পুরাতন আধ্যাত্মদৃষ্টির পথে– ইহসুখ বিসর্জন দিয়ে নয়, তার ঐহিক কল্যাণেরই সুষ্ঠু সংযত ব্যবস্থার জন্য। তখন হবে দেহাত্মবাদের সঙ্গে আধ্যাত্মবাদের এক গভীর সমঝোতা, যা আলু দর্শনের মূল বক্তব্য। তাতে জাতে জাতে, দেশে দেশে, ধর্মে ধর্মে বিভেদ যাবে চলে; পৃথিবীর সব মানুষ প্রেমে হবে এক। অগণিত জনগণের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার পথ হবে সহজ ও সুগম এবং পৃথিবীতে শান্তি হবে সু-প্রতিষ্ঠিত।''[১৭]

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেব আশা প্রকাশ করেন, এভাবেই অতি পুরনোকে ঘিরে নতুনের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে। এ অগ্রযাত্রা আদর্শিক, কল্যাণকামী, শান্তির সুবিশাল পতাকাতল। নতুনের অগ্রযাত্রায় দেব জ্ঞানের সংযোজনকে প্রাধান্য দিয়েছেন সর্বাগ্রে। দেব প্রজ্ঞা বা জ্ঞানকেই নতুন নৈতিকতার 'আদিনীতি' বলে আখ্যায়িত করেছেন। দেব মনে করেন, প্রজ্ঞার মতো পবিত্র কিছু নেই। একমাত্র প্রজ্ঞা বা জ্ঞানই নৈতিক মূল্যায়নে মৌলিকত্বের স্থিতিস্থাপকতার দাবিকে সুরক্ষা প্রদান করতে পারে।

দেবের নব্য নৈতিকতার মর্মমূলে ছিলো আধুনিক নারী-পুরুষের সম্প্রীতি-সংহতির এক মর্যাদাপূর্ণ পর্যায় আবিষ্কার করা। পদার্থিক জগতের সর্বস্তরে যে এক বড় রকমের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে সেটি সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। সমাজের প্রত্যেক স্তরে, প্রতিটি পর্যায়ে তথাকথিত আধুনিকতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই তিনি উৎকণ্ঠিত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন এর সফল ভবিষ্যৎ নির্নির্মাণে। বিজ্ঞান ঘনিষ্ঠ নব্য-আধুনিকতা ও নব্য নৈতিকতা এই উভয় বিষয়কেই তিনি প্রগতির ইতিবাচক বাহন মনে করেছেন। মানবপ্রগতি কখানো থেমে থাকেনি। অগ্রগতি হয়েছে, পরিবর্তিত হয়েছে, হয়েছে রূপান্তরিতও। প্রগতিকে টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজন সুদৃঢ় বন্ধনের। এমন বন্ধনের প্রকৃতি উন্মুক্ত, যা প্রগতির সহায়ক। জ্ঞানতাপস এই মনীষী তাই বলেন–

> ''নিশ্চিতভাবেই বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ পরিচয় বন্ধন রচনার মধ্যে মানুষের ভবিষ্যৎ নিহিত। ... জীবনকে অর্থপূর্ণরূপে গড়ে তুলতে হলে আমাদের জীবনযাত্রাকে

Dhaka University Institutional Repository

> অবশ্যই সহজ সম্ভব করে গড়ে তুলতে হবে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক জড়বাদী জীবনধারায় স্থায়ী ও সঠিক ঐক্যবোধ ব্যতিরেকে জীবনযাত্রা সহজ সম্ভব নয়। এর অনুপস্থিতিতে আজকের দিনে মানুষের উপযোগী অন্যকোন পূর্বতঃসিদ্ধ বা পরতঃসিদ্ধ নৈতিক মানদণ্ড নেই।"[১৮]

দেব বিশ্বাস করেন, মানুষের ঐক্যবোধ তৈরিতে তাকে অগ্রসর হতে হবে একদীর্ঘ সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুসংগত জ্ঞানীয় স্রোতধারায়। আধুনিক মানুষ এবং তার পরিবেশের জন্য আজ বড় প্রয়োজন জ্ঞানের সাথে বিজ্ঞান, ধর্ম ও নৈতিকতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন এক নৈতিক-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উদ্ভাবন ও অনুশীলন। নতুবা সময়ের চলমান গতিধারায় হারিয়ে যাবে মানুষের নীতি নৈতিকতা ও বিশ্বাস। এ প্রসঙ্গে দেব বলেন–

> "For modern man, the nucleus of knowledge is science and the consistency of morality and religion with knowledge demands that they must be scientific, not in appearance perhaps but in substance. To square his value-consciousness with his scientific knowledge is the great need of modern man, of his age and environment. This is what is really meant when it is said that our age is the age of reason and not that in our age, man is much interested in abstract logical speculations cut off from the means of living life and living it successfully."[১৯]

বিভিন্ন খ্যাতিমান দার্শনিকগণের মতো দেবের দাবি হচ্ছে, তিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি 'বৈজ্ঞানিক নীতিদর্শন'-এর রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন। উক্ত বৈজ্ঞানিক নীতিদর্শনকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন বিজ্ঞানের আপেক্ষিক জ্ঞান এবং আধ্যাত্মবাদের পরম ঐক্যের সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয়ের মাধ্যমে। উভয় ধরনের সমন্বয়ের যথার্থ উপলব্ধি এবং আন্তরিক অনুশীলনের মধ্যেই বিদ্যমান ঐক্যভিত্তিক শ্রেষ্ঠ জীবনপদ্ধতি। অন্ধ হলে যেমন প্রলয় বন্ধ থাকে না; তেমনি বিজ্ঞান বৈজয়ন্তীর অগ্রযাত্রাকে উপেক্ষা করে সভ্যতা তথা মহাকালের যেকোনো ইতিবাচক অর্জন সম্ভব নয়। দেব একথা উপলব্ধি করেছেন অত্যন্ত গভীরভাবে। মানুষের একদেশদর্শী চিন্তা-চেতনায় ব্যাহত হবে বিশ্বসভ্যতার সুমহান আদর্শ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের কল্যাণের পথে বয়ে এনেছে বিস্ময়কর সাফল্য কিন্তু এর

Dhaka University Institutional Repository

মারণী ও ধবংসাত্মক দিক মানুষকে অনিবার্য মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বর্তমান সভ্যজগতের মানুষ পরিস্থিতির সার্বিক মূল্যায়নে দ্বিধান্বিত হচ্ছে। প্রয়োজন পরিপূর্ণ বিকশিত জ্ঞান। আর এই বিকশিত জ্ঞানের স্বরূপটি হচ্ছে বিজ্ঞান-ঘনিষ্ঠ জ্ঞান। বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান প্রভাবিত আধুনিক জীবনযাত্রার প্রতি দেবের ছিল পরিপূর্ণমাত্রার ইতিবাচকতা। তবে দেবের আন্তরিক বিশ্বাস, মানুষের মননে-মজ্জায় যে অধ্যাত্ম-অনুভূতি জাগ্রত রয়েছে একে বিজ্ঞানের ধারালো অস্ত্রে শাণিত করে উভয়ের সমন্বয়সাধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সম্ভব পরিপূর্ণ মানবিক জীবন। "প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক আধ্যাত্মবাদপ্রবণ চরক সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেন জ্ঞানবিমুখ ভীত যুবকের মতো মুদ্রিত চক্ষু জীবনযাপনের চেয়ে বড় পাপ আর নেই।"[২০]

জ্ঞানের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) যিনি অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগেও তাঁর অনুসারীদের সুদূর চীন দেশে গিয়ে জ্ঞান অর্জনের কথা বলেন। দেব মনে করেন, এ বিশ্বে বিরাজিত ধর্ম আজ তার মূলমন্ত্র থেকে সরে এসে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে জনমনে নানা বিভ্রান্তির জন্ম দিচ্ছে। মানুষে মানুষে স্বার্থপরতা আর বিভেদ তৈরিতে এর জুড়ি নেই। এসব ধর্মীয় অপসংস্কৃতির নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে সঠিক আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনকে সুখী-সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তুলতে একমাত্র বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাই হতে পারে শক্তিশালী অব্যর্থ হাতিয়ার। দেবের মতে, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করাই হচ্ছে আজকের আধুনিক নারী-পুরুষের অবশ্য কর্তব্য। দেব বৈজ্ঞানিক নীতিদর্শনের চরম শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন মানুষের বস্তুগত ও অধ্যাত্ম এই উভয় দিকের কৃত্রিম শ্রেণী বিভাজন। যে বিভাজন মানবীয় গুণগুলিকে ধ্বংস করে দিয়ে তার নিজস্ব স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে আয়ত্ত করার লক্ষ্য অর্জনে প্রয়াসী। এই প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিমানুষকে সর্বাংশে যন্ত্রে রূপান্তর করে তাঁর হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনাকে পরিণত করা হয় হাস্যকর উপহাসের চিরচেনা গণ্ডিতে। ফলে, বহু আকাঙ্ক্ষিত যথার্থ জীবনলাভে মানুষ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। শোষণ-পীড়ন, দমননীতি হয়ে পড়ে অসহায় মানুষগুলোর ভাগ্যের লিখন। অথচ দেব মানুষকে অধিকতর মর্যাদাবান করে বলেন, "মানুষকে জড় ও আত্মা–এ যৌগিক শ্রেণীকরণ করলে মানুষকে দু'টি অকার্যকরী অংশে বিভক্ত করা হয়, এবং এ দু'টি বিষয়ের একত্রীকরণ করা না হলে মানুষের কোনো মূল্যই থাকে না। মানুষ হচ্ছে জড় ও আত্মা–এর আঙ্গিক ঐক্যের সমষ্টি।"[২১] অর্থাৎ মূর্তমান মানুষ হচ্ছে জড় ও আত্মার এক বিস্ময়কর সম্মিলন, উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। বিচ্ছিন্নতাবোধ নয়, ঐক্যের মাঝেই নিহিত রয়েছে অর্থবহ সামষ্টিক জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

465966

সোনালি সংকেত। কোনো কিছুর অস্বীকৃতি নয়, সবকিছুর অনুমোদন বা স্বীকৃতিই হচ্ছে দেবের নৈতিকতার মূলতত্ত্ব। এরকম মনোবৃত্তিই মানুষকে রক্ষা করতে পারে সমস্ত পঙ্কিল আবর্তের কবল থেকে তথা কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিষাক্ত ছোবল থেকে। এরূপ নির্মোহ জীবনের আহ্বানের মাঝেই দেবের প্রগতির সুমহান প্রত্যয়টি প্রোথিত। প্রগতির ধারায় ঐক্যের জ্ঞান দ্বারা বৈজ্ঞানিক নৈতিকতায় নতুন মাত্রা সংযোজন করতে হবে। যেটিকে দেব "মানব চৈতন্যের পঞ্চমমাত্রা"[২২] বলে অভিহিত করেছেন।

অবশ্য একথাও আজ স্বীকৃত যে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অবারিত বিকাশে সারাবিশ্বে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তাতে পুরো বিশ্ব আজ একটি গ্রাম বৈ কিছু নয়। যার আধুনিক নামকরণ 'বিশ্বপল্লি'। কিন্তু সেই বিশ্বপল্লি আজ জ্বলে-পুড়ে ছারখার। সর্বত্রই যেন এক মহাশূন্যতা বিরাজ করছে। মাটির মানুষ ক্রমেই দিশেহারা হয়ে পড়ছে। শান্তির সমীরণ সহসাই দাবানলে রূপান্তরিত হয়ে গ্রাস করছে জনপদের পর জনপদ, মৃত্যুপুরীতে মানুষ অসহায় এক প্রাণী ছাড়া কিছু নয়। এই মহাসঙ্কট থেকে বাচঁতে হলে দেবের উচ্চারিত সেই বাণীই শোনাতে পারে শান্তির অমিয়ধারা। তাই তো দেব বলেন, যুগে যুগে মানবধর্মে যে আধ্যাত্মিক ঐক্যের বাণী বিঘোষিত হয়েছে সেই বাণীই শক্তিধর বিজ্ঞানের সাপেক্ষ জ্ঞানকে প্রেমের নিরপেক্ষ জ্ঞানীয় দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিপূরণ করতে পারে। প্রেমের শক্তির চেয়ে বড়ো শক্তি আর নেই। মানুষ প্রেমের শক্তির কাছে দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রকৃতিগতভাবে মানুষের এই দুর্বলতার জন্যই প্রয়োজন পড়ে শক্ত কোনো অবলম্বন। তাই, মানবসত্তা যুগ যুগ ধরে আরাধনা করে আসছে ঈশ্বর, ঐশীসত্তা তথা আধ্যাত্মিক অনুভূতির। প্রেমই হলো এই আরাধনার মূলমন্ত্র। প্রেম থেকে জাগ্রত হয় ঐক্যের অনুভূতি। আর দেবের মতে, এই মহাঐক্যের ধারণাকে অপরিহার্যতা দান করে শক্তিশালী করে তুলবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য শক্তি। তবে, বৈজ্ঞানিক শক্তির বাহ্যিকতা একাকী কখনোই মানবকল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন জ্ঞানের সাথে প্রেমের শক্তির নিরঙ্কুশ সমন্বয়সাধন। দেবের মতে, এখানেই নিহিত রয়েছে নৈতিকতার মৌলিকত্ব। দেবের ভাষায়: "জ্ঞান এবং প্রেমের সমন্বয় নব্য নৈতিকতার কেন্দ্রভূমি হওয়া উচিত, যে নৈতিকতা তার নিজের শান্তি ও প্রগতির এবং আরো তার প্রজাতি হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন। এই ব্যবহারিক দর্শনের উপর নির্ভর করছে তার নতুন নৈতিকতা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি।"[২৩] দেব তাঁর নব্য নৈতিকতায় অধ্যাত্মবাদকে সম্পূর্ণরূপে পারলৌকিক পক্ষপাতিত্ব থেকে চূড়ান্তভাবে মুক্ত রেখেছেন কিন্তু একই সাথে ঈশ্বর ও পরলোকের প্রশ্নকে উন্মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছেন। দেবের

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মিক মতবাদ সম্পূর্ণরূপে জাগতিক তাৎপর্যসম্পন্ন। যদিও ঈশ্বর এবং পরকাল এ ধারণায় তিরোহিত নয়। অধ্যাত্মবাদের সৌন্দর্য নিহিত প্রেম-প্রীতি, মায়া-মমতা-স্নেহ-ভালোবাসা এবং গভীর জ্ঞানীয় দৃষ্টিভঙ্গির ভেতরে। এ দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে মানবীয় উৎকর্ষতায় পরিপূর্ণ। এরকম উপলব্ধি মানুষকে বিশুদ্ধ বস্তুগত জগতকে অতিক্রম করে এক সামগ্রিক পরিপূর্ণ জগতের সন্ধান দিতে সক্ষম। দেবের এই ধারণা নিশ্চিতভাবেই পৃথিবীর মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে সার্বিক গুরুত্ব প্রদান করে। যাতে বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক পরিপূরণের লক্ষ্যমাত্রা যথার্থভাবেই অর্জিত হয়। দেব পারলৌকিকতার প্রশ্নটি উন্মুক্ত রেখেছিলেন বোধ করি এই ভেবে যে, স্পর্শকাতর এ বিষয়টির উন্মুক্তকরণ মানুষকে বন্ধনমুক্তির আস্বাদ প্রদান করবে ফলে এই প্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্যে এক অতুলনীয় অভিজ্ঞতার সৃষ্টি হবে যা তাকে অনাবিল আনন্দ তথা স্বর্গীয় অনুভূতিতে উজ্জীবিত করতে সাহায্য করবে। জগতের অসীমতার ধারণার সংস্পর্শে এলে ব্যক্তি তার আপন সত্তায় আবির্ভূত হবে এবং অতিন্দ্রীয় অনুভূতির সংস্পর্শ লাভ করবে। এভাবে সাধারণ মানুষ বস্তুগত ও অধ্যাত্মজীবনের মধ্যে এক চমৎকার সমন্বয়ের প্রীতিপূর্ণ অনুভূতি লাভে সমর্থ হবে। যে সমন্বয়সাধন মানুষের সমগ্র জীবনকে অর্থবহ করে তুলবে।

দেব তাঁর লেখনিতে যে সত্যটি বারবার ব্যক্ত করেছেন তা হলো, দর্শনের সাথে বিজ্ঞানের আন্তরিক সমঝোতা স্থাপন। তিনি বিজ্ঞানকে কোনক্রমেই খাটো করে দেখার পক্ষপাতী ছিলেন না বরং এরকম ভাবনাকে তিনি 'সত্যের অপলাপ'[২৪] বলে অভিহিত করেছেন। তবে, বিজ্ঞানের অভাবনীয় সাফল্যে সাধারণ মানুষ যেমন উদ্বেলিত দেবের মাঝে সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতা ছিল আতঙ্কের । তাই তিনি বলেন–

> "এমন একদিন ছিলো যখন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বাইরের জগতের মানুষকে দিয়েছিলো মুক্তি, দিয়েছিলো সার্থক জীবনযাত্রার সংকেত। আর আজ সে জ্ঞানই তার হাতে যে প্রচুর শক্তি দিয়েছে তাকে কল্যাণের পথে চালিত করতে না পারাই তার সবচেয়ে বড় সমস্যা । মনীষী রাসেল ঠিকই বলেছেন– বিজ্ঞান আমাদের হাতে যে অপরিমিত শক্তি দিয়েছে, তাকে সুপথে চালিত করার ক্ষমতা না থাকায় মানুষ আজ এক ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন।"[২৫]

দেবের তত্ত্বদর্শনকে মোটেও তাত্ত্বিক দিক থেকে ফলপ্রসূ বলা যাবে না। এই অর্থে যে, তিনি প্রচলিত বা প্রথাসিদ্ধ যুক্তি, চিন্তন, বিশ্লেষণ-দর্শন, মত-পথের অনুসারী ছিলেন না । তিনি যা করতে চেয়েছেন তা হলো দর্শন-বিজ্ঞান-ধর্ম, অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি, সাম্প্রতিক পরিবেশ-পরিমণ্ডল অনুযায়ী বৃহত্তর এবং

Dhaka University Institutional Repository

স্থায়ী মানবকল্যাণের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রণয়ন। একান্ত নিজস্ব এবং গুরুত্বপূর্ণ সে মতবাদ। মানবকল্যাণই তাঁর দর্শনের সারাৎসার এবং তা অত্যন্ত সময়োপযোগী। ক্ষুদ্রস্বার্থ দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হয়ে মানুষে মানুষে পারস্পরিক প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একমুখী বিশ্বজগৎ তথা একক ভ্রাতৃত্ববোধের চিরন্তন এক অনিবার্য বন্ধন তিনি রচনা করতে চেয়েছিলেন। আর তাঁর মতে, দর্শনই এ দুর্গম পথের কাণ্ডারির দায়িত্ব পালনে অব্যর্থভাবে সফলকাম হবে। তাই তো তিনি *ভাববাদ ও প্রগতি* গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেন–

> ''দর্শন যে মানুষের ইতিহাসের এক বড় দান, ব্যক্তির ও মানবগোষ্ঠীর সার্থক জীবনযাত্রার রূপায়ণে দর্শনের দান যে মোটেই সীমিত নয়, এ সত্য আমরা আজ বিস্মৃত। এর ফলেই এ বৈজ্ঞানিক যুগের অভাবনীয় সমৃদ্ধি ও সম্ভাবনার ভেতর মানুষের মনে ভয় ও আতঙ্ক; ইসরাফিলের শিঙ্গার অতর্কিত, অপ্রত্যাশিত হুঙ্কার। বিজ্ঞান ও দর্শনের সুস্থ মিলনের মধ্যে রয়েছে এই পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পথ নির্দেশ।''[২৬]

দেবকে একজন প্রয়োজনবাদী বলেই মনে হয়। কেননা, তত্ত্ববিদ্যক বা অধিবিদ্যক জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহের মাত্রা প্রায় শূন্যের কোঠায়। তিনি পরাবিদ্যক জ্ঞানকে মানবজীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে সমন্বিত করে দেখারই প্রয়াসী। এর প্রমাণ পাওয়া যায় গোবিন্দ দেবের *তত্ত্ববিদ্যা সার* গ্রন্থের 'প্রামাণ্য পরিচয়' শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়ের 'প্রয়োজনবাদ' আলোচনায়। প্রয়োজনবাদ অনুসারে যা মানবজীবনের প্রয়োজন সম্পাদন করতে সমর্থ তাই সত্য। সুতরাং, প্রয়োজন সামর্থ্যই সত্যের ভিত্তিস্বরূপ। গোবিন্দ দেবের মতে, ''প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় এই প্রয়োজনবাদের সমর্থন করেছেন।''[২৭] এক্ষেত্রে দেবের দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজনের তাগিদে সত্যাশ্রয়ী হলেও নৈতিকতার ক্ষেত্রে বিষয়ীগততার পরিচয় বিধৃত হয়েছে। বিষয়ীগত মূল্যের প্রতি অধিকতর ঝোঁক দেবকে প্রয়োগবাদের সীমা ছাড়িয়ে সামষ্টিক জীবনের স্থায়ী কল্যাণধর্মী নৈতিক মূল্যের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। তবে, উভয়ক্ষেত্রেই দেবের মনোভাব আপসমূলক। জ্ঞানের সাথে সত্যতার প্রকাশধর্মীতা এমন একটি মৌলিক বিষয় যা উভয়ের বিশ্লেষণী চরিত্রেই বর্তমান। তবে, দেব একথাও বলেছেন যে, জ্ঞানের ব্যাপকতা বিস্তার লাভ করে বস্তুর প্রকাশের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ, "জ্ঞান মাত্রেই বস্তুকে প্রকাশ করে বলে স্বভাবতঃই সত্য, মিথ্যা নয়।"[২৮] এক্ষেত্রে মতদ্বৈততা না থাকাই স্বাভাবিক।

Dhaka University Institutional Repository

দেবের নব্য নৈতিকতায় উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান পাওয়া যায়। উপযোগবাদ অনুযায়ী 'সর্বাধিক লোকের জন্য সর্বাধিক সুখ' এর প্রত্যাশার বিষয়টি যেমন নীতিগতভাবে কার্যকর তেমনি দেবের নৈতিকতার আদর্শও চূড়ান্ত পর্যায়ে মানবকল্যাণের পথনির্দেশ করে। আর এজন্যই তা প্রকৃতিগতভাবে 'পূর্ণতাবাদ' এবং 'সুখবাদীয়' প্রত্যয় দু'টি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত। দেব মনে করেন, কাজের নৈতিক মূল্য নির্ণীত হয় কাজের যোগ্যতা বা সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। আধুনিক এই জটিল বিশ্বে কাজের সামর্থ্যের প্রকৃতি এমন হওয়া উচিত বলে দেব মনে করেন যাতে করে উক্ত কাজের নৈতিক মূল্য সামর্থ্যের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করে কার্যকরী ভূমিকা প্রদানে সক্ষম হয়। কর্মের অর্ন্তনিহিত সামর্থ্যই মানুষের ঐক্যের বন্ধনকে সুদৃঢ় করে এক সুখী সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মানবাত্মার অভিযোজনকে সুরক্ষিত করে। দেব প্রয়োগবাদীদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করলেও শেষ বিশ্লেষণে তিনি যখন বিষয়ীগত মূল্যে আস্থা স্থাপন করেন তখন তা কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি করে বৈ-কি। তবে তিনি উপযোগবাদীদের 'সুখ' প্রত্যয়টিকে 'শাশ্বত সুখ' দ্বারা প্রতিস্থাপিত করেন। গোবিন্দ দেব 'নব্য নৈতিকতা' এবং 'প্রগতি' এই উভয় বিষয়কে একই সমান্তরাল রেখায় স্থাপন করেছেন। অর্থাৎ, প্রগতিই হচ্ছে নব্য নৈতিকতার একমাত্র লক্ষ্য। প্রগতির অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে প্রযুক্তিবিদ্যা। দেবের মতে, সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের লক্ষ্যে শুধু দর্শন ও ধর্মই নয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার এবং সঠিক দিকনির্দেশনার মাঝেই প্রোথিত রয়েছে আগামী দিনের সুখী-সমৃদ্ধশালী সোনালি ভবিষ্যৎ। দেবের ভাষায়–

> "বিজ্ঞান (প্রযুক্তির আকারে) অত্যাচারীর অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতা সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং বিজ্ঞানের মূল মানবিক দিককে অগ্রাহ্য করে সর্বাধিক মাত্রায় ধ্বংসাত্মক ও হিংস্রভাবে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের জন্য দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে বলে মনে হয়।"[২৯]

দেবের এরূপ সত্যদর্শন তাঁর দূরদর্শীতারই পরিচয় বহন করে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী প্রযুক্তির দানবীয় মূর্তি এবং শক্তি অবলোকন করছে। প্রযুক্তির মাত্রাতিরিক্ত অগ্রগতিতে সমগ্র বিশ্বের মানুষ আজ পারমাণবিক শক্তির ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করছে কীট-পতঙ্গের মতো। বর্তমান প্রজন্ম এক বিরাট নৈতিক বিপর্যয়ের সন্মুখীন। উপরন্তু, উগ্র বস্তুবাদ এবং উগ্র

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মবাদ মানুষের সাধারণ মৌলিক-মানবিক জীবনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে নানান ছলাকলায়। দেব মনে করেন, বস্তুবাদীদের উগ্রতা আজ এমন প্রকট আকার ধারণ করেছে যে, তারা সাধারণ মানুষকে সুযোগসুবিধা প্রদানের নামে চরমভাবে প্রতারিত করে যাচ্ছে। ফলে, মুষ্টিমেয় একশ্রেণীর ভোগবাদী তাদের ক্ষমতার লালসাকে নির্দ্বিধায় বাস্তবায়ন করে চলেছে। সাধারণ মানুষ এসব ভোগবাদীদের নগ্ন প্রবঞ্চনার শিকারে পরিণত হচ্ছে। আর এসব বস্তুগত সুযোগ-সুবিধা অর্জনের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে উন্নত প্রযুক্তিকেই গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, উগ্র আধ্যাত্মবাদীরা দিব্যদর্শনের সাহায্যে দূরের বাদ্য শুনতে পাবার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে সাধারণ মানুষকে স্বাভাবিক জীবন থেকে সরিয়ে নিয়ে নিজেদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার পথ সুগম করে সভ্যতার অগ্রগতিকে চূড়ান্তভাবে বাধাগ্রস্ত করে তুলছে। অধ্যাত্মবাদের এরূপ একপেশে অনুশীলনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অসহায় মানুষগুলো পার্থিব বিষয়াসক্তিকে কৃত্রিমতাভরে জলাঞ্জলি দিয়ে পরিণামে অদৃষ্টবাদী হয়ে উঠে। ফলে, বস্তুগত চাহিদা পরিপূরণের আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেদের নিদারুণভাবে বঞ্চিত করে। পরস্পর বিরোধী দুই মতবাদের উগ্র আবির্ভাব সাধারণ মানুষকে তার প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে শোষণের নিয়ামকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ফলশ্রুতিতে যথার্থ জীবনলাভে সাধারণ মানুষ ব্যর্থ হয়। যে জীবনে তারা লাভ করতে পারতো বস্তুগত সুখ-সুবিধা, সমৃদ্ধি-ঐশ্বর্য আর অন্যদিকে আধ্যাত্মিক জীবনের অনাবিল প্রশান্তির স্বর্গীয় এক মহিমান্বিত জীবন। "এভাবে মানুষের আধ্যাত্মিক দিকের স্বীকৃতি ব্যতীত চরম প্রযুক্তি এবং চরম পারলৌকিকতা সাধারণ মানুষের বস্তুগত চাহিদার সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃতি নিয়ে গঠিত এবং দু'টি মতবাদই নব্য নৈতিকতার জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক।"[৩০]

সংকীর্ণতা এবং ক্ষুদ্রস্বার্থ দ্বন্দ্ব বর্তমান বিশ্বের অগ্রগতির জন্য এক ভয়ংকর হুমকিস্বরূপ। হিংসা-বিদ্বেষ, ধর্মীয় কুসংস্কার, ধর্মের নামে নানামুখী গোড়ামির কঠিন শৃঙ্খলে ক্রমেই আষ্টেপৃষ্টে আবর্তিত হচ্ছে আজকের পৃথিবী। জ্ঞানের দিব্য আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে না মানুষের মন। দেবের অনুভূতি-উপলব্ধিতে এসব চিন্তা-চেতনার উপস্থিতি ছিল বহু পূর্ব থেকেই। দেব মানবপ্রকৃতির বহুমুখী অন্তরায়সমূহের মধ্যে ত্রিভুজাকৃতির অন্তরায়কে মানবসমাজের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর বলে অভিহিত করেছেন। এ কথা সত্যি যে, মনুষ্য সৃষ্ট সংকটের আবর্তে প্রগতি ব্যাহত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। দেবের ত্রিভুজাকৃতির অন্তরায়সমূহের ভূমি সংলগ্ন বাহুটি হচ্ছে সম্প্রদায়গত বৈষম্য। এর অপর বাহু দু'টির

Dhaka University Institutional Repository

একটি হচ্ছে ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং অন্যটি মানব বুদ্ধির চিরন্তন শত্রু হিসেবে চিহ্নিত ঈর্ষাপরায়ণতা। দেব এই তিন ধরনের চরিত্রকে অপবিত্র, ক্ষতিকর এবং প্রগতির সবচেয়ে বড়ো বাধা হিসেবে চিত্রিত করেছেন। দেব মনে করেন, ধর্মীয় গোড়াঁমি এবং ঈর্ষান্বিত মনোভাবই সমগ্র পৃথিবীকে অস্থিতিশীল করে সভ্যতার অগ্রগতি ও সংহতিকে বিরাট এক হুমকির সম্মুখীন করে তোলে, প্রীতিপূর্ণ পরিবেশকে কলুষিত করে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের বীজমন্ত্র ছড়িয়ে একাত্মবোধের অনুভূতিকে ধ্বংস করে দেয়। দেব উল্লিখিত তিন ধরনের শত্রুকে বিষধর সরীসৃপ এবং উন্মুক্ত কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন। দেবের মতে, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীগত বিভক্তি মানবাত্মার মৃত্যু ঘটায়। ধর্মীয় গোড়াঁমি এবং হিংসা-বিদ্বেষ মানুষকে হীনমন্য এবং নিম্ন প্রবৃত্তির জীবে রূপান্তরিত করে মনুষ্যত্ববর্জিত মেরুদণ্ডহীন প্রাণীতে পরিণত করে। তবে, এক্ষেত্রে দেব হতাশ না হয়ে বরং আশান্বিত হন এই ভেবে, বিজ্ঞান প্রভাবিত আজকের বিশ্ব ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে আসছে। নিত্য পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে সতত পরিবর্তনশীল মানবমন অবস্থা এবং প্রেক্ষিতের বাস্তবধর্মীতা স্বীকার করে অচিরেই হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও আদিম মনোবৃত্তির পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে। হৃদয়বৃত্তির ঔদার্য্যে অবগাহন করে সুকুমার বৃত্তির যথাযথ বিকাশের মধ্য দিয়েই সভ্যতার অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে বলে দেব বিশ্বাস করেন। এভাবেই বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অপমৃত্যুর মধ্যে দিয়েই সূচিত হবে দেবের বহুল আকাঙ্ক্ষিত এক বিশ্বরাষ্ট্রের। আত্মিক উন্নয়নের সাধনা সচেতন মানবমনের ধর্ম। মানুষ সে আত্মিক উন্নয়নের ধারাকে ব্যাহত করে পার্থিব লোভ লালসায় পড়ে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানুষের আত্মা। আদর্শ মানবাত্মা সর্বদা অপরের কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত থাকে। প্রতিটি শান্তিপ্রিয় মানুষের প্রার্থনা থাকে নিপীড়ন, শোষণ-বঞ্চনাহীন এক মঙ্গলময় উপযুক্ত পরিবেশ। অন্ধ কুসংস্কারের অনুশাসন থেকে বেরিয়ে বিজ্ঞানের সাপেক্ষ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ধর্মের অধ্যাত্ম অনুভূতির নিরপেক্ষ একত্বের জ্ঞানসাধনা দ্বারাই অর্জিত হবে নতুন এক নৈতিকতা। অর্জিত হবে গণমানুষের কাঙ্ক্ষিত প্রগতি। কল্যাণবাদী দর্শনের অন্যতম প্রবক্তা অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন এভাবে, বিজ্ঞান-দর্শনকে আজ জগতের প্রগতিশীল ধারার সঙ্গে একাত্ম করে শক্তিশালী এক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।[৩১] প্রযুক্তিনির্ভর কর্মময় জীবনই শক্তির মূল উৎস আর এ শক্তির মাধ্যমেই প্রগতি অর্জিত হবে। তিনি কর্মের প্রেরণার সাথে শক্তির সমন্বয় সাধন করে যে পরিবর্তনের রূপরেখা অঙ্কন করেছেন তা প্রকৃতপক্ষেই বস্তুজগতের কল্যাণকামী প্রগতির এক সফল সংকেত। যে বস্তুগতের গতিময়তাকে মানুষ মুহূর্তের

Dhaka University Institutional Repository

জন্যও অবাস্তব বলে অস্বীকার করতে পারে না। বস্তুজগত এবং আধ্যাত্মজগৎ উভয়ের পরিপূর্ণ এবং চমৎকার সমন্বয়ের মধ্যেই নিহিত নৈতিক-মানবিক মূল্যবোধের কাঙ্ক্ষিত সোনালি সোপান। যা পর্যায়-পরম্পরায় ব্যক্ত হয়েছে ড. আমিনুল ইসলামের ভাষায়। তিনি বলেন–

> "আমাদের চারদিকে যে চলমান বস্তুজগৎ, যেখানে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বেচাকেনা, তাকে আমরা কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারি না অলীক অবাস্তব বলে। আর তা নয় বলেই আমরা পারি না বস্তুবাদকে অস্বীকার করতে। সাধারণ মানুষের জরুরি চাহিদার কথা স্বীকৃত বস্তুবাদে। ... তবে বস্তুবাদ কেবল সত্তার এক অংশকে ব্যাখ্যা করতে পারে, পূর্ণাঙ্গ সত্তাকে নয়। বস্তুগত অংশ ছাড়াও সত্তার রয়েছে চেতন বলে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যার ব্যাখ্যা দিতে বস্তুবাদ অক্ষম। অথচ এই চেতন শুধু বাস্তবই নয়, জড়বস্তুর চালিকাশক্তি-স্বরূপ। জৈবিক ও দৈহিক চাহিদার পাশাপাশি মানুষের রয়েছে এক অলঙ্ঘনীয় আধ্যাত্মিক চাহিদা: ন্যায়, সত্য, সুন্দর প্রভৃতি মূল্যবোধের প্রতি আকর্ষণ। কিন্তু বস্তুবাদে এ আধ্যাত্মিক চাহিদা ও নৈতিক মূল্যবোধের কোনো স্বীকৃতি ও ব্যাখ্যা নেই। আর এজন্যই বস্তুনীতির সম্পূরক ও পরিপূরক হিসেবে প্রয়োজন অধ্যাত্মনীতির। সোজা কথায়, বস্তুবাদের পূর্ণতার জন্যই প্রয়োজন অধ্যাত্মবাদের।"[৩২]

দেবের দর্শনে প্রকাশ পেয়েছে যেমন তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, যুক্তি-বিচার-বিশ্লেষণ তেমনি প্রোথিত রয়েছে ভবিষ্যৎ চিন্তাচেতনার গভীর খোরাক। যুক্তির জালবুনে তাঁর নিজস্ব মতামতকে এগিয়ে নেবার সাথে সাথে অসংখ্য চিন্তাকণার অবাধ বিস্তৃতি তাঁর দর্শনচিন্তাকে করেছে আরো সমৃদ্ধ আরো গতিময়-প্রাণবন্ত। আলোচনার পর্যায়-পরম্পরায় তাঁর দর্শনে প্রাধান্য লাভ করে অধিকার ও কর্তব্যের ধারণাটি। যান্ত্রিক ও ভোগবাদী সভ্যতায় মানুষ নিজের অধিকারের বিষয়টি নিয়ে যতবেশি আগ্রহী ঠিক ততটাই উদাসীন অপরের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে। নব্য নৈতিকতা বিকাশে অধিকার অর্জনের পাশাপাশি অপরের প্রতি কর্তব্য পালন সম্পর্কে পূর্ণসচেতন থাকতে হবে। সন্তানের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার, যথাযথ মর্যাদা, সেবা-পরিচর্যা পাওয়া যেমন প্রতিটি পিতামাতার জন্য অনুকম্পা নয়– অধিকার, তেমনি প্রতিটি সন্তানেরও রয়েছে সীমাহীন কর্তব্য। ব্যাপক অর্থে দেব নব্য নৈতিকতা বিকাশে অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে বিদ্যমান দূরত্বকে ঘোচাতে চেয়েছেন। প্রতিটি ব্যক্তি কল্যাণই ধাবিত হয় সামষ্টিক কল্যাণের দিকে। সামাজিক প্রতিকূলতার দ্বন্দ্ব এবং সংঘাতময় পরিবেশে যুক্তিবাদী, প্রবৃত্তিসঞ্জাত প্রেরণা মানুষকে কল্যাণকামী করে তুলবে এমনই বিশ্বাস ছিলো দেবের।

Dhaka University Institutional Repository

একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক যেমন তার মৌলিক অধিকার পাওয়ার দাবিদার তেমনি একজন সচেতন নাগরিকেরও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যবোধে পূর্ণমাত্রায় উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিত। শুধু এভাবেই উভয়ক্ষেত্রে সম্মান ও মর্যাদা অটুট থাকবে। দেবের ভয় হলো, সাধারণ মানুষ 'অধিকার' ও 'কর্তব্যে'র ব্যাপারটিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একতরফাভাবে প্রয়োগ করে থাকে। আর এমন দৃষ্টিভঙ্গি সার্বিক প্রগতির জন্য ক্ষতির কারণ। এক্ষেত্রে ড. হাসনা বেগমের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

> " 'অধিকার' বলতে দেব এখানে উপযোগবাদী এবং মানমুক্তবাদী উভয় প্রকার কর্তব্যের ধারণা থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন বলে মনে হয়। উপযোগবাদী এবং মানমুক্তবাদী 'অধিকার' বলতে যথাক্রমে এমন কর্মকে বুঝায়, যা পরিণামে সর্বাধিক পরিমাণে শুভ আনয়ন করতে পারে এবং যা স্বগুণেই শুভ। এর বাদবাকিটুকু হচ্ছে 'অধিকার'–এর আইনগত ধারণা। দেব 'অধিকার'—এর এই আইনগত ধারণা এবং 'কর্তব্য'–এর নৈতিক ও আইনগত উভয় প্রকার ধারণাকে বুঝিয়েছেন বলে মনে হয়।"[৩৩]

অন্যের প্রতি কর্তব্য পালনে অনীহা মানুষকে স্বার্থবাদী করে তোলে। আত্মস্বার্থবাদী মানুষ নিজ স্বার্থ অন্বেষণে ক্রমেই সমাজ-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আর এই বিচ্ছিন্নতা নব্য নৈতিকতা বিকাশের পথে এক বড়ো অন্তরায়। বিচ্ছিন্নতাবোধ সম্পন্ন মানুষ যেমন অন্যের জন্য ক্ষতিকর, সমাজের জন্য ক্ষতিকর তেমনি ক্ষতিকর তার নিজের জন্যও। নিজের অজান্তেই সে মাকড়সার মতো আপনজালে জড়িয়ে যায়। সুতরাং, একথা বলা যায় যে, নিজ অধিকার আদায়ের প্রতি মানুষের যেমন পূর্ণ সম্মান, স্বাধীনতা এবং সমর্থন থাকে তদ্রুপ অন্যের অধিকার সংরক্ষণ করাও ব্যক্তির কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। 'অধিকার' এবং 'কর্তব্য' সম্পাদনের যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তির নিজের কল্যাণ যেমন সাধিত হয় তেমনি সদগুণাবলীপ্রসূত ব্যক্তিমন সার্বিক কল্যাণের দিকেও ধাবিত হয়। এ প্রসঙ্গে দেব মনে করেন, সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের মধ্যে যেসব নৈতিক বন্ধনের কার্যকারিতা রয়েছে সেগুলির উৎকর্ষ বিধানে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ হলো আধ্যাত্মিক সত্তার চেতনাকে জীবন্ত এবং শাণিত করে তোলা। আধ্যাত্মিক সত্তার সফল প্রতিফলনই ব্যক্তিকল্যাণ তথা বিশ্বমানবতার কল্যাণসাধনে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে।

দেব বিজ্ঞানের কার্যকর পদক্ষেপ এবং ধর্ম ও দর্শনের জ্ঞানের সমন্বয়সাধনে এক উচ্চমানের অধ্যাত্মভিত্তির প্রতি সুদৃঢ় আহ্বান জানিয়েছেন। যেখানে গভীর মমতায় জড়ানো থাকবে

Dhaka University Institutional Repository

মানবাধিকারের বিষয়টি। আধ্যাত্মিক পবিত্রতা ও কর্তব্যবোধে উদীপ্ত প্রত্যয়ই হবে আদর্শ জীবনের উত্তম রূপরেখা। যার উপর নির্ভর করবে মানুষের সত্যিকারের উন্নতি ও কল্যাণ। দেবের মতে–

> "A world ridden with the idea of right and wedded solely to scientific knowledge cannot help lead to tensions. If and when inspired and informed by a sense of abiding love and loyalty to duty and discipline that follows, a right-conscious world guided by scientific knowledge can become an abode of harmony, peace and prosperity."[৩৪]

সেই চিরচেনা মানবমনের সহজাত প্রবৃত্তি স্থায়ী প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিশ্বঐক্য গড়ে তুলতে মহান ভূমিকা রাখবে। দেব স্পষ্টভাবেই বলেন, "প্রবৃত্তি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করবে।"[৩৫] বিজ্ঞানমনস্ক প্রবৃত্তির স্বাভাবগত পরিবর্তনই মানবমনে প্রগতির ধারা অব্যাহত রাখবে। যা ব্যক্তি তথা বৈশ্বিক পরিবেশকে শ্রীমণ্ডিত করে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির উৎকর্ষ ঘটাতে সাহায্য করবে। পুরনো সবকিছুকে যেমন বদলে দিতে নেই, তেমনি বদলানো যাবে না মানুষের সহজাত আবেগিক দিকটিকেও। দেব বিষয়টি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক যুগের আবহে বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে অধ্যাত্ম প্রবৃত্তিকে জাগাতে হবে মননে-মজ্জায়। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত আলেম, সুফী, কবি ও দার্শনিক জালালউদ্দিন রুমি (র:) এর একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। তিনি এভাবে তার মতামত ব্যক্ত করেন:

'আবদার কান্তি, হালাকে
কান্তিয়াস্ত/আল আবদার, জি রে
কান্তি পুণ্ডিয়ামস্ত।'

> "অর্থাৎ, পানি ছাড়া নৌকা চলবে না– এটা সত্য, কিন্তু পানি যদি নৌকার ভেতর ঢোকে তবে এই পানিই নৌকা ধ্বংসের কারণ হয়। এখানে মাওলানা রুমি বোঝাতে চেয়েছেন যে, বৈশ্বয়িক জ্ঞান বা বিষয় (দুনিয়া) ছাড়া জীবন চলবে না, এটা সত্য, কিন্তু যদি এই বিষয় বৈভব পাওয়া মুখ্য হয় বা যদি শুধু এই বৈশ্বয়িক জ্ঞান দিয়েই মাথা পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং আধ্যাত্মজ্ঞান অর্জিত না হয়, তাহলে এই বৈশ্বয়িক জ্ঞান বা দুনিয়াই এ

Dhaka University Institutional Repository

> জীবনতরী ডুবে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই ইহকাল ও পরকালে শান্তির লক্ষ্যে আধ্যাত্মজ্ঞান অর্জন করা উচিত।"[৩৬]

দেবের মতে, নব্য নৈতিকতার লক্ষ্য হচ্ছে প্রগতি। তবে, প্রগতির পশ্চাৎপদতার পেছনে তিনি যে বিষয়টির ইঙ্গিত করেছেন তা হলো মানুষের আচরণগত স্ব-বিরোধিতা। সৃষ্টিকুলের সেরা হয়েও মানুষ তার আচরণগত ত্রুটির জন্যই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়। এর জন্য দায়ী বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা, নীতি নৈতিকতাহীন ভোগবাদী জীবন, দৈনন্দিন জীবনের অসম বস্তুবাদী মানসিকতা। মানুষের কথা এবং কাজের সমন্বয়হীনতা এক বিস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করেছে চলমান পরিস্থিতিতে। সীমাহীন সংকটের আবর্তে মানুষের এই গরমিলে ভরা জীবনব্যবস্থা, সভ্য-সমাজ তথা শান্তি-প্রগতির অন্তরায়।

দেবের দর্শনে সমন্বয়ধর্মীতা এবং সর্বজনীন প্রেমের স্বর্গীয় বাণী নব্য নৈতিকতার উৎকর্ষ বিধানে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। সমন্বয়কে দেব মধ্যপথরূপেই আখ্যায়িত করেছেন। 'প্রেম' হচ্ছে দেবের শর্তহীন সর্ববাদের মূলরূপ। এর লক্ষ্য হলো, এ বিশ্বের সঙ্গে মানবজীবনের প্রেমের এক নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন। প্রাচ্যে এ প্রেমের বিকাশ ঘটেছে সর্বোপরি মানবতাবাদে। মানবপ্রগতি অর্জনে সবচেয়ে সহায়ক এবং কার্যকরী পন্থা হলো বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের মধ্যে এক সুখী সমন্বয়ের পথ অন্বেষণ করা। দেবের মধ্যপথাশ্রয়ী ভাবনার অস্তিত্ব ব্যাপক বিস্তৃত। তবে, এই 'মধ্যপথ' দর্শনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জড়বাদ ও আধ্যাত্মবাদের সুখী সম্মিলন। দেব মনে করেন, "এই মধ্যপথেই প্রকৃত সত্যের সন্ধান লাভ করা সম্ভব এবং এই মধ্যপথেই একদিকে যেমন রয়েছে আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, তেমনি এর মধ্যে রয়েছে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা।"[৩৭] এ কারণেই মধ্যপথকে দেব তাঁর জীবনদর্শনের মধ্যমণি বলে আখ্যায়িত করেন।

দেবের মতে, বিশ্ব প্রকৃতিতে যে ঐক্য বিরাজিত এর মূলে রয়েছে এক অন্তর্নিহিত প্রেমানুভূতি। এই প্রেম শুধু বস্তুজগতের প্রতি ইঙ্গিতবাহী নয়, সমগ্র মানবজীবন তথা ইতর বিশেষে পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বপ্রেমের ধারণায় জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী; তৃণ-লতা, বৃক্ষ, গ্রহ-নক্ষত্র সবই অর্ন্তভুক্ত। এর মূলধারা উৎসারিত হয়েছে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। প্রাচ্যের মানবতাবাদী ধারা বিকাশ লাভ করে

Dhaka University Institutional Repository

মূলত উপনিষদের ব্রহ্মসূত্র থেকেই। জীবমাত্রেই ব্রহ্মের অংশসম্ভূত বলে ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ নির্ণয় প্রসঙ্গে উপনিষদের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার শংকরাচার্য মন্তব্য করেছেন–

'ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা
জীবে ব্রহ্ম পরাপর'

"জীবমাত্রেই ব্রহ্মের অংশ হলে–মানুষে মানুষে তো বটেই এমনকি মানুষ ও মানবেতর প্রাণীর মধ্যেও মৈত্রীর সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।"[৩৮]

যুগে যুগে মৈত্রীর বাণী বিঘোষিত হয়েছে নানান আঙ্গিকে, নানান রূপে। শুধু উপনিষদেই নয়, পরবর্তীকালে মানুষের সাথে মানবেতর জীবের যে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় রামায়ন ও মহাভারতেও। এতে মানবেতর জীবের মধ্যে নৈতিক চেতনার স্ফূরণও ঘটানো হয়েছে–

> "রামায়নের নায়ক রাজা রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন করার জন্য চর্তুদশ বৎসর বনবাস ক্লেশ সহ্য করেন। ছদ্মবেশী রাবণ সীতাকে হরণ করে পুষ্পক রথে রাজধানী লংকাতে গমনকালে শকুনরূপী জটায়ু তার সঙ্গে যুদ্ধ করে সীতাকে মুক্ত করার চেষ্টায় নিহত হয়। বানর সেনার অধিনায়ক সুগ্রীব সর্বতোভাবে রামচন্দ্রকে সাহায্য করেছে।"[৩৯]

দেব শান্তিপূর্ণ একক বিশ্বরাষ্ট্রের যে স্বপ্ন দেখেছেন তার সফল বাস্তবায়নে কোন রক্তাক্ত বিপ্লব কার্যকর নয়। চাই ঐক্য এবং সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ গণতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি। মানবিক মূল্যবোধপুষ্ট পরস্পরিক সহমর্মিতার এক সুদৃঢ় বন্ধন। দেব মহামানব সৃষ্টির লক্ষ্যে মানবিক সহানুভূতির উপরই জোর দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। নির্যাতিত নিপীড়িত জনতার মুক্তির লক্ষ্যে তিনি যে কোনো মত এবং পথকে গ্রহণ বা বর্জন করতেও প্রস্তুত ছিলেন এবং তার প্রমাণও রেখেছেন প্রচুর। মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত ব্যক্তির মধ্যে একদিকে যেমন থাকে ন্যায়পরতা সততার ধারণা অন্যদিকে রয়েছে অপরিমিত সাহসিকতা, দয়া, বদান্যতা, সহমর্মিতা, ধৈর্য্যশীলতা এবং সুশীলতাবোধ যেগুলো সত্যিকার অর্থেই মানুষের অলংকার বলে পরিগণিত। প্রয়োজন চারিত্রিক দৃঢ়তা ও উৎকর্ষ। এসবই একজন ব্যক্তিকে গভীর পরিতৃপ্তির সাথে অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত রেখে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে সহায়তা করে। 'মানবতা' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটি এভাবে বলা যায়,

Dhaka University Institutional Repository

"জীবনের সবচেয়ে বড় ধর্ম মানবতা। সে ধর্ম যখন অস্বীকৃত হয় –তখন সমাজের হয় অধোগতি, জীবন হয় স্পন্দনরহিত।"[৪০]

বাস্তবতা তো এটাই মানুষ আজ সম-অধিকারী না হয়ে কৃপার ভিখারী বনে গেছে। পৃথিবীময় যে ধর্মে ধর্মে, জাতিতে জাতিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পরস্পরের মধ্যে যে অসাম্য ও তিক্ততার স্তূপ জমে উঠেছে তার মূল কারণটিও হচ্ছে বৈষম্য। তিনি বিজ্ঞানের সাথে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণাকে যুক্ত করে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী জগৎ গঠনে আগ্রহী ছিলেন। বিজ্ঞান ও ধর্মভিত্তিক সমাজব্যবস্থা মানুষের কল্যাণ আনয়ন করে বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ রূপ ও ঐশ্বর্য নিয়ে শতদলের মতো বিকশিত হয়ে উঠবে। তখনই মানুষ প্রকৃত অর্থে এ জগতে সুখের সন্ধান পাবে। মানুষের হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ হবে অবারিত। মূর্তমান মানুষ স্বাধীন কর্ম আর আচরিত আদর্শের আলোকে হয়ে উঠবে এক একজন মহামানব। দেবের ভাষায়, "আজকের মানবতার এক নম্বর সমস্যা হচ্ছে এক বিশেষ রকমের চরিত্র সৃষ্টি করা, বিস্তৃত মানবিক সহানুভূতিসম্পন্ন নারী-পুরুষ হওয়া– এক কথায় 'মহামানব সৃষ্টি করা'। মানুষের স্থায়ী স্বার্থে আমাদের বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক প্রগতি সমান তালে চলবে।"[৪১]

দেবের নব্য নৈতিকতার ধারণাটি ঠিক নতুন না হলেও নতুন পুরাতনে মিশ্রিত এক সংস্কারসাপেক্ষ রূপ। এ পৃথিবীতে যা নতুন তাই আবার কালের পরিক্রমায় পুরাতন রূপে চিহ্নিত হয় তবে রেখে যায় তার রেশ। এই অবশিষ্টাংশই আবার নতুনরূপে নতুন আঙ্গিক-অবয়বে বিকশিত হয় সংস্কারিত ধারায়। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রূপের বদল হয় না; ভিন্নরূপে রূপান্তরিত হয় যা দেবের নব্য নৈতিকতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। হৃদয় নিঃসারিত প্রেম আর বস্তুজগতের প্রার্থিত চিরাচরিত চাহিদার এক আত্মিক মিলনই হলো নতুন পুরাতনের মোহময় আবেশ যা চির অম্লান, শাশ্বত। বস্তুবাদী এবং ভোগবাদী প্রয়াসের এ ধারায় সংযুক্ত কেবল পুরাতন চিরচেনা ধর্মাশ্রয়ী আধ্যাত্মিকতা। যা মানুষের দিব্যচক্ষুর স্ফূরণ ঘটায়। বিকশিত করে জ্ঞানের উন্মুক্ত আলোয়, বিবেক বিবেচনাপ্রসূত সুদৃঢ় যুক্তির কষ্টিপাথরে এ আলোর দাবিকে কোনো যুগই অস্বীকার করতে পারে না। সুতরাং,

> "যা নতুন তা চিরকালই নতুন, তবে যুগে যুগে ইহাকে কুসংস্কার ও লোকাচারের আবর্জনা-স্তূপ থেকে উদ্ধার করে জীবনের কষ্টিপাথরে ঘষে পুনরায় করে তুলতে হয় প্রাণবন্ত। এই

Dhaka University Institutional Repository

> হল সংস্কারকদিগের সাধনা, মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান করা। আদর্শের অর্ন্তনিহিত সুরগুলো সর্বকালে একই থাকে, কেবল এই অজগর যুগের রুচি অনুসারে তার ছাল বদলায়, যার জন্য মনে হয়– পূর্বে পৃথিবীতে এটা ছিল না, যেন সম্পূর্ণ নতুন।"[৪২]

দেবের মানবতাবাদী নৈতিকতায় বিকশিত রূপটি কোনো নির্দিষ্ট দেশ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, ভাষাগোষ্ঠী বা ভৌগলিক অবস্থানগত নয়। এটি সর্বজনীন। এসব বাহ্যিক পরিচয়কে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে বহু রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছে, বেড়েছে বৈষম্য, অকল্যাণ হয়েছে বিশ্বমানবতার। এক্ষেত্রে দেবের আহ্বান ক্ষুদ্র ভেদবুদ্ধির জাল ছিন্ন করে মহৎ প্রাণ মানুষের দ্বারা একটি আদর্শ বিশ্বরাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব। দেব তার সমগ্র জীবন প্রেম, মৈত্রী ভাবনা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের শুধু অনুশীলনই করেননি; তাঁর বিভিন্ন বর্ক্তৃতা-বিবৃতি, সভা-সেমিনার, লেখনিতেও এর সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণার ব্যবধান দূর করতে তিনি আমেরিকায় গড়ে তুলেছিলেন, *The Govinda Dev Foundation for World Brotherhood.* বিবেকানন্দের মতো দেবও মনে করতেন, চিরায়ত ধর্ম থেকেই প্রাচ্যের উদার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির শুভ সূচনা। যুগে যুগে এই আধ্যাত্মিকতাই মানব মনে শক্তি, সাহস, প্রেরণা যুগিয়ে চিরমঙ্গলের প্রতি চৈতন্যময় বিবেককে জাগ্রত করেছে। সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের সাধনা দ্বারা জীবনকে মহিমান্বিত করেছে। বিবেকপ্রসূত আহ্বানই মানুষকে চিরকল্যাণের পথের সন্ধান দিয়েছে। অন্যদিকে, পাশ্চাত্যে রয়েছে অগণিত ভোগ্যবস্তু, জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে পরিপূর্ণ প্রসারিত এক জ্ঞানের ক্ষেত্র। তবে, একথা এখন আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নিরেট শুষ্ক জ্ঞানের চর্চা মানুষের সব সমস্যার সমাধান করতে তো পারেই না বরং জ্ঞানের বিকাশমান ধারার গতিরোধ করে সংকটের চোরাবালিতে নিক্ষিপ্ত হয়। দেব অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কল্যাণে যে সুখী সমৃদ্ধশালী জীবন গড়ে উঠেছে তা মানুষকে প্রকৃত মুক্তিদানে সক্ষম নয়। কেননা, বিজ্ঞান প্রভাবিত বিলাসবহুল এবং যন্ত্রনির্ভর জীবন মানুষকে খণ্ডিত মানুষে পরিণত করে। দেব ব্যবহারিক ভোগ্যবস্তুর প্রয়োজনীয়তাকে নিস্প্রয়োজন জ্ঞানে উড়িয়ে দেন না বরং ভোগ্যবস্তুই যে সবকিছু নয় একথা অকপটে স্বীকার করেন। তিনি মনে করেন, শুধুমাত্র বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির দ্বারা এ জগৎ-সংসারের সব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সুতরাং, মানুষের স্থায়ী স্বার্থের জন্য প্রয়োজন প্রাচ্যের চিরায়ত অধ্যাত্মবাদের সাথে পাশ্চাত্যের জ্ঞান গরিমায় সমৃদ্ধ বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অব্যাহত ধারার এক সুখী সম্মিলন। দেবের এমন আশাবাদ সত্ত্বেও, মানববিশ্বে প্রতিমুহূর্তে

Dhaka University Institutional Repository

ধ্বনিত হচ্ছে প্রযুক্তির মারণী প্রবৃত্তির নিষ্ঠুর উল্লাস, মৃত্যুর কাছে যেন আজকের পৃথিবী হার মেনে বসে আছে। মানুষ নিজের তৈরি সভ্যতার কঠিন শেকলে আটকা পড়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। হতাশা, ব্যর্থতা, উদ্বেগে পরিপূর্ণ এ বিশ্বের মানুষ আজ দ্বিধান্বিত। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে বসে মৃত্যুর প্রহর গুনছে অসহায় মানুষগুলো। অন্যদিকে বৈশ্বিক অস্থিরতা প্রতিমুহূর্তে নতুন নতুন অবয়বে আবির্ভূত হচ্ছে। বিক্ষুব্ধ-নির্যাতিত মানুষের হৃদয় কন্দরে আজ মুক্ত হওয়ার প্রত্যয়। কোথাও কোথাও ঘটছে এর সশব্দ প্রতিফলন। বিক্ষুব্ধ জনতা সহিংসতার শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। নতুন মাত্রা পেয়েছে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বৈষম্য দুর্নীতির ভয়াবহ চিত্র। কোথাও সশস্ত্র সংগ্রামরত জনতা, কোথাও বা প্রতিহত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। এসব কিছুই আজ চরম বাস্তবতা। দেব এসব উপলব্ধি করেছিলেন একজন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মতো। এজন্য তাঁর আন্তরিক কামনা ছিলো এক নতুন সভ্যতার, নতুন নৈতিকতার। বর্তমান এ বিশ্বব্যবস্থার পেক্ষাপটে স্বামী বিবেকানন্দের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে জনৈক প্রবন্ধকারের বক্তব্যে। তিনি এভাবে বলেন–

> "প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক শক্তি ও পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী শক্তির পূর্ণ মিলনে এক নতুন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও বিশ্বের সৃষ্টি হবে যা আবহমানকাল থেকে মানুষ কামনা করে এসেছে। এ দু'য়ের মহামিলনে মানুষ হবে না শোষিত, হবে না বঞ্চিত। মানুষ 'মানুষ'-এর পূর্ণ সত্তায় অবগাহন করবে, ভুলে যাবে ভেদাভেদ। এক বিশ্বের পতাকাতলে মানুষ বাস করবে যুগ যুগ ধরে।"[৪৩]

গভীর আত্মবিশ্বাসে আজ সমগ্র বিশ্ব মানবতাকে জেগে উঠতে হবে। নতুন আদর্শে-প্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে সুখী-সমৃদ্ধশালী পৃথিবী গড়ে তোলাই হবে এর প্রধান লক্ষ্য। বিশ্ব-মানবতা আজ মহাসংকটে নিপতিত, দ্বিধাবিভক্ত। এ অবস্থার উত্তরণে প্রয়োজন দেবের নব্য আদর্শিক মতাদর্শের। এ মহান ব্যক্তির মাধুর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, ক্ষমতা, সামর্থ্য, বুদ্ধিমত্তার তীক্ষ্ণতা, বিশ্লেষণী দক্ষতা সর্বোপরি গভীর দূরদর্শীতা সব মিলিয়ে এক সৃষ্টিশীল মানুষ। তিনি সর্বপ্রকার খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে সেই সম্পূর্ণ জীবনদর্শনের প্রতি সবার দৃষ্টি ফেরানোর চেষ্টা করেছেন যে দর্শনে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব প্রয়োজনের বিরোধ নিষ্পত্তি হয়। তিনি বলেন–"আমি জড়বাদকে অধ্যাত্মবাদিক ও অধ্যাত্মবাদকে জড়বাদিতে পরিণত করেছি।"[৪৪] দেব চিন্তা-চেতনা-বিশ্বাস-কর্মে আপাদমস্তক একজন আধুনিকমনা

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ ছিলেন। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী। কৈশোর-তারুণ্যে মিশনারীদের প্রভাব ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের আদর্শের একজন প্রকৃত প্রতিনিধি।

দেব যে সময়ে তাঁর নব্য নৈতিকতার আবিষ্কার, বিকাশ, প্রচার-প্রসার ও আচারের কথা ভাবছিলেন সেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অথবা বিংশ শতাব্দীর পুরো সময় জুড়ে ইউরোপ তথা সারা দুনিয়ায় বিশ্লেষণী চিন্তাধারা দর্শন জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে এগিয়ে যাচ্ছিল। অন্যদিকে গ্রীক-ভারতীয় প্রভাবে তত্ত্ববিদ্যা তার পুরনো ধ্যান-ধারণাকে পুঁজি করে দর্শন জগতের উত্তরাধিকারীর আসনটি বেশ সফলভাবেই আঁকড়ে রাখতে পেরেছিল। দেব এসব ধ্যান-ধারণার প্রতি বিরূপতা প্রদর্শন করে এমন এক নীতির সন্ধান করলেন যেখানে শুধু বুদ্ধির অনুসন্ধিৎসাই নয় অথবা কেবল ভাববাদ বা কেবল জড়বাদই প্রাধান্য পাবে না। এ নীতি হবে এমন এক সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য নীতি যেখানে ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীক সর্বোপরি বৈশ্বিক চাহিদারও এক সফল সন্তুষ্টিলাভ ঘটবে। আর এ দুর্গম পথ পরিক্রমায় দেবকে পাড়ি দিতে হয়েছে উত্তাল ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র। সে সমুদ্রে তিনি একাই নাবিক। তবে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি কখনো। উত্তাল সমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউয়ে তাঁর তরী কেঁপে উঠলেও ডুবে যায় নি।

মনুষ্য প্রজাতি জীবজগতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রবৃত্তিচালিত। দেব একথা নিশ্চিত জেনেই সেই প্রবৃত্তিকেই নাড়া দিয়েছেন হৃদয় গভীর থেকে। প্রবৃত্তির সন্তোষবিধানই ছিল তার নব্য নৈতিকতার অপরিহার্য আদর্শ। বস্তু এবং আত্মিক চাহিদার পারস্পরিক সহাবস্থানই প্রবৃত্তির চরম সন্তুষ্টি। যেটিকে দেব সমন্বয় বলে অভিহিত করেছেন। তার নৈতিকতা একদিকে যেমন ছিল বুদ্ধি সমর্থিত অন্যদিকে ছিল ধর্ম সমর্থিত। তিনি ধর্মীয় এবং নৈতিক ক্ষেত্রে সর্বজাতির ধর্মীয় মূলমর্মবাণীকে কেন্দ্র করে আন্ত ঃধর্মীয় সম্প্রীতি স্থাপনে এবং তা সর্বজনীন বিশ্বকল্যাণের নিমিত্তার্থে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলিম সহিংসতা, নীতিগত অসহিষ্ণুতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি পরিহার করে এক জ্ঞানদীপ্ত আলোকিত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে গিয়েছেন। তিনি 'গরুর আত্মকাহিনী' নামক একটি চমৎকার গল্পের অবতারণা করেছিলেন এবং সে গল্পের শেষাংশের প্রার্থনাটি ছিলো–

> "হে ভগবান, তুমি আমাকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। আমি আমার শক্তি দিয়ে, চামড়া দিয়ে, মাংস দিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

> এমনকি মল-মূত্র দিয়েও মানুষের সেবা করে আসছি। কিন্তু হে ভগবান, আমার প্রয়োজন বোধ হয় ফুরিয়ে আসছে। আমার শক্তির আর প্রয়োজন নেই। আমাকে হাল টানতে হয় না, আবিষ্কৃত হয়েছে ট্রাক্টর। গাড়ি টানতে হয় না, দেশ ছেয়ে গেছে মটরযানে। আমার চামড়ার বিকল্প হিসেবে আবিষ্কৃত হয়েছে সিন্থেটিক। চিরুণির জন্য শিং-এর দরকার নেই, আবিষ্কৃত হয়েছে প্লাস্টিক। গোবরের দরকার নেই, সারের জন্য পাওয়া যাচ্ছে রাসায়নিক সার। আমার প্রয়োজনের মধ্যে একটি প্রয়োজন এখনও রয়ে গেছে সেটি হলো আমার মাংস। আর এই মাংস নিয়ে হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে চলছে প্রচণ্ড সংঘাত। অনেক নিস্পাপ মানুষ শিকার হচ্ছে এ সংঘাতের। হে ভগবান, আমার জন্য সব প্রয়োজন যদি ফুরিয়েই গিয়ে থাকে তাহলে আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নাও। কারণ, আমার মাংসকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানদের সংঘাত আমি আর সইতে পারি না।"[৪৫]

বর্তমান বিজ্ঞান প্রভাবিত ব্যস্ত জীবনে দেবের নব্য নৈতিকতার ধারণা কতটুকু সুফল বয়ে নিয়ে আসবে এটাই ভাববার বিষয়। কেননা, ভোগবাদী বৈজ্ঞানিক পরিবেশে মানুষের পার্থিব প্রয়োজনের গুরুত্বকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। উপরন্তু, আজকের এ বিশ্বে আকাশ সংস্কৃতির উগ্র-আবির্ভাব, তথাকথিত বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব মানুষকে নীতিহীন, মূল্যবোধহীন এক যন্ত্রমানবে পরিণত করেছে। অস্থিরতা বিরাজ করছে দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে। সম্প্রদায়গত বিভক্তির ভয়াবহতা প্রকটরূপ ধারণ করে সভ্যতার ভিত্তিমূলকে দুর্বল করে দিচ্ছে। হৃদয়বৃত্তির আহ্বানকে পদদলিত করে মানুষ উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্যে ছুটে চলেছে। এ রকম অস্থিতিশীল বিশ্ব অবলোকন করে দেব নিজেও তার নব্য নৈতিকতার সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এজন্য তিনি নিজেকে স্বাপ্নিক, ভাববিলাসী বলেও অভিহিত করেন। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আদর্শগত পর্যায়ে দেবের নব্য নৈতিকতার মূল্য অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এর সফল বাস্তবায়ন বর্তমান এই সংকটাপন্ন বিশ্বে অত্যন্ত কঠিন বলেই মনে হয়। কেননা, দেব নিজেকে প্রগতিশীল ধারার বাহক মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে তিনি মৃদু উত্তেজনাভরে প্রতিস্থাপন করতে গিয়ে ঘড়ির কাঁটাকে পেছনের দিকে ঘুরিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাতে করে প্রগতির পথ প্রশস্ত না হয়ে বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সমন্বয়বাদী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যেয়ে দেব প্রাকৃতিক ও বস্তুজগতের সকল প্রকার বিরোধাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটিয়ে পার্থিব সকল প্রকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবসান ঘটাতে চেষ্টা করেছেন যা বাস্তবে মোটেও সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োগপ্রীতির মাধ্যমে দেবের আকাশচারী ভাবনার অসফল বাস্তবায়নই নব্য নৈতিকতার ভিতকে দুর্বল করে তোলে। দেবের নব্য নৈতিকতায় প্রকাশিত মূল প্রত্যয়টি হলো: আত্মিক সত্তার পরিপূর্ণ বোধগম্যতা। অর্থাৎ, মানুষে মানুষে ব্যাপক কোনো পার্থক্য তো নয়ই বরং পার্থিব-অপার্থিব, বস্তু-ভাব, ধনী-দরিদ্র, শোষক-শোষিতের সমন্বয়ে গঠিত অনাবিল আত্মতৃপ্তিতে ভরপুর আত্মসামঞ্জস্যের অভূতপূর্ব কল্যাণকামী এক নীতি। দেবের পাণ্ডিত্য এবং বিচক্ষণতা প্রশ্নাতীত। তদুপরি তিনি অত্যন্ত উদাসীনভাবে আবহমানকাল ধরে মানবসমাজে বিরাজিত শ্রেণীগত বৈষম্যের বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। বিন্যস্ত মানবসমাজের সকল স্তরে সকলের স্বার্থই অভিন্ন এমন ধারণা পোষণ করে প্রকারান্তরে দেব শোষক ও শোষিতের চিরাচরিত দ্বন্দ্বকে আড়াল করার প্রয়াস চালিয়েছেন বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

ধর্ম-বিজ্ঞান পরস্পর বিরোধী জেনেও উভয় মতের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে মানবসমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনের যে চিন্তা তিনি করেছেন তা দেবের কল্পনাপ্রসূত অবচেতনমনের লালিত স্বপ্ন বলেই মনে হয়। দেব মানুষকে বস্তু ও ভাবের জটিলতর সংগঠন বলে মনে করেন। 'বস্তু' এবং 'ভাব' সম্পর্কে দেবের উপলব্ধি এক্ষেত্রে যথার্থ নয়। কেননা, ভাববাদী ও বস্তুবাদী উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে একথা স্বীকৃত যে, মানব সৃষ্টির উপাদান হচ্ছে বস্তু বা জড়। জড়বাদী মতবাদে জড় থেকেই চৈতন্যের উদ্ভব হয়। আর চেতনসত্তা মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত ভাবেই ভাবেরও সঞ্চার হয়। সুতরাং, জড় ও অধ্যাত্ম শক্তির মিলন নয়, পরস্পর পরস্পরের সহায়কশক্তিরূপেই মানবকল্যাণে কাজ করে যাবে। উভয়ে উভয়ের মর্মবস্তুকে উপলব্ধি করে, প্রথাসিদ্ধ নয় চূড়ান্ত নীতিমালাগুলোকে ধারণ-গ্রহণের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজ বৈরী শক্তিকেও প্রতিহত করার আদর্শে উদ্দীপিত হয়ে উঠতে পারে।

বিজ্ঞান যে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত এবং বিজ্ঞান প্রভাবিত শিক্ষার সাথে আধ্যাত্মিক সত্তার সমঝোতা স্থাপন করে বর্তমান সভ্যজগতের মানুষ ভবিষ্যৎ প্রগতি তথা তার অস্তিত্বকে অধিকতর সহজ ও সম্ভবপর করে তুলবে এমন ধারণাই দেবের নব্য নৈতিকতার মূলমন্ত্র। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, দেব নিজেই বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পর দুই বিরোধী মতবাদকে একসূত্রে গ্রথিত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করার মধ্যে দিয়েই ধর্মের অসারতাকে প্রমাণিত সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাস্তবে উক্ত দুই বিরোধী ধারণার সমন্বয় সাধনের প্রয়াস এক অবাস্তব কল্পনাবিলাস বলেই মনে হয়। অপুষ্পক বৃক্ষ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

যেমন ফলপ্রাপ্তির প্রত্যাশা বৃথা তেমনি দেবের ধর্ম-বিজ্ঞানের সমন্বয়ে নব্য নৈতিকতার ধারণারও যৌক্তিক কোনো ভিত্তি নেই। দেবের উপলব্ধিতে যে বিষয়টি ছিলো না তা নয়। তিনিও বোধকরি এমন সমন্বয়ের সুস্পষ্ট কোনো কাঠামো প্রদানে ব্যর্থ হয়ে হাতড়ে বেড়িয়েছেন প্রথাসিদ্ধ প্রাচীন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির আনাচে-কানাচে। দেব তাঁর নব্য নৈতিকতায় প্রাকৃতিক নিয়মের মৌলিক দিকটির প্রতিও যত্নবান ছিলেন না। আমরা জানি, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি অমোঘ এবং অপরিবর্তিত। এর ব্যত্যয় ঘটে না সচরাচর। প্রকৃতিও নিয়মের বিকাশ ঘটায় জ্ঞান নিরপেক্ষভাবেই। প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় বিধানে যেমন উত্তম-অধম, সাদা-কালো, ধনী-নির্ধন, বস্তু-ভাব, দিন-রাত্রি, কার্য-কারণ, স্বর্গ-মর্ত্যের ধারণার মতো অসংখ্য বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয় তেমনি জ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রকৃতির সম্পূরক-পরিপূরক প্রত্যয়সমূহ মানবমনের কোনো ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভরশীল নয়। এক্ষেত্রে দেব প্রকৃতির বিধানের মতো বাস্তবকে মেনে না নিয়ে প্রকারান্তরে ভাববাদী আসরেই তিনি তাঁর আসনটি পাকাপোক্ত করে নিয়েছেন। যুগ-চেতনায় বিদ্যমান ভাববাদীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে নতুনরূপে সংস্কারের মাধ্যমে টিকিয়ে রাখার প্রতিজ্ঞাই ব্যক্ত হয়েছে দেবের নৈতিকতায়।

বৈজ্ঞানিক যুগে বিজ্ঞানের শক্তির সফলতা-ব্যর্থতা নির্ণীত হবে ব্যক্তিমানুষের চাহিদার ক্ষেত্রটি যেভাবে রচিত হয়। এই ব্যক্তিমানুষের প্রত্যাশার কথাই দেব তাঁর *Aspirations of the Common Man* গ্রন্থ থেকে শুরু করে সব রচনাতেই ব্যক্ত করেছেন। বেঁচে থাকার সংগ্রাম মানুষের সহজাত চাহিদার গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। আর সমাজের বিকশিত ধারায় শোষণনীতি মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হিসেবেই পরিগণিত। সে কারণেই সার্বিক কোনো নৈতিক নিয়ম মানবসমাজে স্থায়ীরূপ পেতে পারে না। কেননা, ব্যক্তিমানুষ প্রত্যেকেই ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক। শ্রেণী শোষণের দ্বন্দ্বের শেকড় যেমন সমাজ থেকে সমূলে উপড়ে ফেলা যাবে না তেমনি বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির দিকটিকেও স্বাগত না জানালে সভ্যতার সংকটে পড়বে সমগ্র মানবসম্প্রদায়। সুতরাং, বিজ্ঞানের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, মৌলিক-মানবিক গুণের যথার্থ প্রতিফলন ঘটানোর লক্ষ্যে এবং বিশ্বমানবের সোনালি ভবিষ্যৎ রচনার সোপান হিসেবে নৈতিক আদর্শের সর্বজনীন রূপ পরিবর্তিত হতে থাকবে অনন্তকাল। উল্লিখিত কারণেই এমনটি ভাবা অসঙ্গত হবে না যে, দেবের নব্য নৈতিকতার রূপরেখাটি তাঁর আদর্শায়িত স্বপ্নেরই সফল বাস্তবায়ন।

Dhaka University Institutional Repository

তদুপরি দেবের মৈত্রী বন্ধন এবং বিশ্ব ধারণার চেতনা সমগ্র মানবজাতিকে আলোকিত পথের সন্ধান দেবে, গড়ে উঠবে এক কল্যাণময় এবং মঙ্গলময় পৃথিবী। জ্ঞানে, ধর্মে, কর্মে, বিজ্ঞান সাধনায় উজ্জীবিত মানুষ যুক্তির কষ্টিপাথরে আপন সত্তার সাবলীল বিকাশে মহিমান্বিত হয়ে উঠবে। বিশ্বমানবতা গৌরবান্বিত ও স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে আপন আলোয় উদ্ভাসিত হবে। কল্যাণের পথ হবে চির উন্মুক্ত, প্রসারিত। তাত্ত্বিক পর্যায়ে দেবের এমন ভাবনার উন্মেষ সুদূরপ্রসারী হলেও প্রায়োগিক পর্যায়ে এবং বঞ্চনাহীন, শোষণমুক্ত সমাজ তথা বিশ্বঐক্য তৈরিতে এরূপ আদর্শিক প্রয়াস নিঃসন্দেহে সফলতার দাবিদার। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে দেবের নব্য নৈতিকতার সার্থক প্রতিফলন মুক্তিকামী মানুষকে নব উদ্যমে পথ চলতে সহায়তা করবে। বিশ্বায়নের কল্যাণে মানুষ অভাবিতরূপে সময়কে জয় করেছে, অতিক্রম করেছে কুসংস্কারের দীর্ঘমেয়াদি অন্তর্জাল তবে, বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব বর্জন করে বিজ্ঞান-ঘনিষ্ঠ পৃথিবী দেবের নব্য নৈতিকতার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে অবিমিশ্র কল্যাণের পথে এগিয়ে যাবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। কালের পদযাত্রায় সদা জাগ্রত থাকুক মুক্তির এ আহ্বান। স্ফূরণ ঘটুক মানুষের হৃদয়বৃত্তির স্বরতন্ত্রীতে। বিজয় ঘটুক নতুন নৈতিকতার, নতুন আদর্শের। উদ্যমে-অগ্রগতিতে বিকশিত হউক দেবের দর্শনের জয়ের এ ধারা। দেবতুল্য এই মহামনীষীর প্রত্যাশিত জীবনাদর্শ অনন্তকাল এ পৃথিবীর আত্মভোলা মানুষের মাঝে প্রেরণা যুগিয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূচি

১. মোহাম্মদ নূরনবী অনুবাদিত, মূলঃ ড. জি.সি. দেব, *সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা*, গ্রীন বুক হাউস লিঃ, ১৯৮৩, পৃ. ২৭

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

৩. *দৈনিক প্রথম আলো*, বিজ্ঞানমনস্ক মোজাফ্ফর হোসেন, স্মরণ, যতীন সরকার, শিক্ষাবিদ, লেখক, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, ১০ জানুয়ারী ২০১১, পৃ. ১২

৪. মহাজীবন, স্বামী বিবেকানন্দঃ ভারতের মানবতাবাদী দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক নেতা, *ভারত বিচিত্রা*, বর্ষ তেত্রিশ, পৌষ-মাঘ ১৪১২, জানুয়ারী ২০০৬, পৃ. ৩৫ (J,050, BHB)

৫. Hasan Azizul Huq (ed), *Works of Govinda Chandra Dev,* Vol.1, Bangla Academy, Dacca, 1980, p. 435.

৬. মোহাম্মদ নূরনবী অনুবাদিত, মূলঃ ড. জি.সি. দেব, *সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা*, গ্রীন বুক হাউস লিঃ, ১৯৮৩, পৃ. ২৪

৭. কাজী নূরুল ইসলাম ও প্রদীপ কুমার রায় সম্পাদিত, *দর্শন ও প্রগতি*, ১৪শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, ১৯৯৭, গোবিন্দদেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ.১২২

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০

৯. হোসেনুর রহমান, গান্ধী জিজ্ঞাসা, *ভারত বিচিত্রা*, বর্ষ একত্রিশ, পৌষ-মাঘ ১৪১১, জানুয়ারী ২০০৫, পৃ. ৩ (J.B.050 BHA)

১০. ইজাজ হোসেন, 'সংগীত সরোবরে বিভাসিত পদ্ম', *ভারত বিচিত্রা*, বর্ষ বত্রিশ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, মে ২০০৫, পৃ. ২০ (J. 050, BHB)

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

১২. শ্রী রমা প্রসাদ চন্দ, 'গৌড়ার কথা' ও 'শেষের কবিতা', *সচিত্র মাসিক বসুমতী*, ১১শ বর্ষ, দ্বিতীয় খন্ড, কার্ত্তিক ১৩৩৯, ১ম সংখ্যা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, পৃ. ২৩৬।

১৩. ড. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস সম্পাদিত *"জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ গোবিন্দচন্দ্র দেবঃ জীবন ও দর্শন"*, অবসর প্রকাশনা, জুলাই ২০০৮, পৃ. ১১৪

১৪. পূর্বোক্ত, ২০১

১৫. গোলাম সরোয়ার সম্পাদিত, *সমকাল পত্রিকা*, পরমাণু নিয়ে পাগলামি, নরম্যান সলোমন, ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাকুরেসির প্রেসিডেন্ট এবং রুট্স অ্যাকশনের ফেলো গোয়ার্নিকা থেকে ভাষান্তর বিভূতিভূষণ মিত্র, ১৭ মার্চ, ২০১১ পৃ. ৪

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

১৭. ড. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস সম্পাদিত *"জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ গোবিন্দচন্দ্র দেবঃ জীবন ও দর্শন"*, অবসর প্রকাশনা, জুলাই ২০০৮, পৃ. ২০৩

Dhaka University Institutional Repository

১৮. Hasan Azizul Huq (ed), *Works of Govinda Chandra Dev,* Vol.1, Bangla Academy, Dacca, 1980, p. 481

১৯. Ibid., p. 486

২০. মোহাম্মদ নূরনবী অনুবাদিত, মূলঃ ড. জি.সি. দেব, *সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা*, গ্রীন বুক হাউস লিঃ, ১৯৮৩, পৃ. ৬০

২১. ড. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস সম্পাদিত *"জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ গোবিন্দচন্দ্র দেবঃ জীবন ও দর্শন"*, অবসর প্রকাশনা, জুলাই ২০০৮, পৃ. ১১৫

২২. মোহাম্মদ নূরনবী অনুবাদিত, মূলঃ ড. জি.সি. দেব, *সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা*, গ্রীন বুক হাউস লিঃ, ১৯৮৩, পৃ. ৬১

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

২৫. ড. প্রদীপ রায় সম্পাদিত ও সংগৃহীত, *"গোবিন্দ চন্দ্র দেব, অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা"*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৮৫

২৬. হোসনে আরা আলম অনুবাদিত, *ভাববাদ ও প্রগতি*, মূলঃ ড. জি.সি. দেব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮,পৃ. উনিশ

২৭. মালবিকা বিশ্বাস, "গোবিন্দ দেবের দৃষ্টিতে গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর দর্শন", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা ৮৮, জুন ২০০৭, আষাঢ়, ১৪১৪, পৃ. ৮

২৮. হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত, *আমার জীবন-দর্শন, গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলী,* (তৃতীয় খণ্ড) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ১৭০

২৯. G.C. Dev, *Aspirations of the Common Man*, Dacca University, Dacca, 1963, p.82

৩০. ড. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস সম্পাদিত *"জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ গোবিন্দচন্দ্র দেবঃ জীবন ও দর্শন"*, অবসর প্রকাশনা, জুলাই ২০০৮, পৃ. ১১৭

৩১. আমিনুল ইসলাম, *গোবিন্দচন্দ্র দেবঃ জীবন ও দর্শন*, সূচীপত্র প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৬৮

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ.৫৩

৩৩. ড. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস সম্পাদিত *"জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ গোবিন্দচন্দ্র দেবঃ জীবন ও দর্শন"*, অবসর প্রকাশনা, জুলাই ২০০৮, পৃ. ১১৭

৩৪. Hasan Azizul Huq (ed), *Works of Govinda Chandra Dev,* Vol.1, Bangla Academy, Dacca, 1980, p. 493

৩৫. মোহাম্মদ নূরনবী অনুবাদিত, মূলঃ ড. জি.সি. দেব, *সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা*, গ্রীন বুক হাউস লিঃ, ১৯৮৩, পৃ. ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. সালমা ইসলাম সম্পাদিত, *দৈনিক যুগান্তর*, *জ্ঞান* মানুষকে বিনয় দান করে, আব্দুর রাজ্জাক চিশ্‌তী নিজামী, উত্তর কমলাপুর, ঢাকা, ২৫ মার্চ, ২০১১,পৃ. ৫

৩৭. মালবিকা বিশ্বাস, "গোবিন্দ দেবের দৃষ্টিতে গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর দর্শন", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা ৮৮, জুন ২০০৭, আষাঢ়, ১৪১৪, পৃ. ৭

৩৮. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ভারতে মানবতাবাদ উৎপত্তি ও বিকাশ, *ভারতবিচিত্রা*; অষ্টমবর্ষ দশম সংখ্যা, মার্চ ১৯৮১, পৃ. তিন ।

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. তিন-চার

৪০. অধ্যাপক কল্যাণনাথ দত্ত, রবীন্দ্র নাটকে মানবতা, *ভারতবর্ষ*, ৪৩শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৩৬২-৬৩, পৃ. ৭৪

৪১. মোহাম্মদ নূরনবী অনুবাদিত, মূলঃ ড. জি.সি. দেব, *সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা*, গ্রীন বুক হাউস লিঃ, ১৯৮৩, পৃ. ৬৯

৪২. আলাউদ্দিন আল-আজাদ, মানবতার রূপ-কল্পনা, *সওগাত*, জ্যৈষ্ঠ-১৩৫৪, ২৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃ. ৬৩৪

৪৩. ড. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস সম্পাদিত *"জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ গোবিন্দচন্দ্র দেবঃ জীবন ও দর্শন"*, অবসর প্রকাশনা, জুলাই ২০০৮, পৃ. ১৬৪-১৬৫

৪৪. হোসনে আরা আলম অনুবাদিত, *ভাববাদ ও প্রগতি*, মূলঃ ড. জি.সি. দেব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮,পৃ. চৌত্রিশ

৪৫. অধ্যাপক ড. প্রদীপ রায় সম্পাদিত, *প্রাণ প্রবাহ*, ড. জি.সি. দেব জন্মশতবার্ষিকী স্মারক সংকলন সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন, জুলাই ২০০৮, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

গোবিন্দ দেবের দর্শনে নব্য নৈতিকতার প্রভাব

Dhaka University Institutional Repository

গোবিন্দ দেবের দর্শনে নব্য নৈতিকতার প্রভাব

সক্রিয় মানবজীবনে গতিশীলতা নিরবচ্ছিন্ন এক অব্যাহত প্রক্রিয়া। এ ধারাকে অক্ষুন্ন রেখেই বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ সমাজজীবনে টিকে থাকার জন্য সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলার চেষ্টা করে। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে মানুষ বেঁচে থাকার তাগিদে স্বভাবসুলভভাবেই লালন করে আসছে ভালো-মন্দ, সত্য-সুন্দর ও মঙ্গলের ধারণাকে। জন্মগতভাবে মানুষের মধ্যে বিরাজিত রয়েছে আবেগপ্রবণতা, ভালো-মন্দ নির্ধারণ করার জন্য বুদ্ধিমত্তার স্বাভাবিক অনুশীলন, চর্চা ও বিকাশ। মানবসভ্যতার এ বিকাশধারায় উদ্ভব হয়েছে নানান জাতি-গোষ্ঠীর। আবার নিত্য পরিবর্তনশীল সভ্যতার স্বাভাবিক স্রোতধারায় নিজের অযোগ্যতা প্রমাণ করে বিলীনও হয়েছে এসব জাতি গোষ্ঠী। পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখেই মানুষ ভালো থেকে অধিকতর ভালো, শুভ থেকে অধিকতর শুভ-তে উত্তরণের লক্ষ্যে তার মন-মানসিকতাকে বিন্যস্ত ও প্রসারিত করে চলেছে। মানবিক গুণাবলী বিকশিত হয়েছে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের ধারণাকে ক্রমাগত লালনের মাধ্যমে। এসব মানবিক গুণাবলী উৎসারিত ধারণাসমূহই মানুষকে নৈতিকতা ও নীতিবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে। মানুষ সচেতন বা অবচেতন মনে নিজের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ব্যক্তিসত্তার উন্মেষ ঘটায়। দেবের 'নব্য নৈতিকতা' বিশ্বসমাজের প্রতি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত এক নৈতিক-জাগতিক চিরন্তন আহ্বান। দেব এই নব্য নৈতিকতার বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন গণমানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সর্বোপরি ধর্মীয় পরিমণ্ডলে। পরিবর্তনশীল এই বিশ্বব্যবস্থায় দেবের নৈতিক জাগতিক গুণাবলী সমৃদ্ধ 'নব্য নৈতিকতার' চির প্রকাশিত রূপ শাশ্বত এবং চিরন্তন। সৌহার্দ, সহনশীলতা এবং সম্প্রীতির অটুট বন্ধনে সমগ্রবিশ্বকে একসূত্রে গাঁথার এক মহতী প্রয়াস ব্যক্ত হয়েছে দেবের নতুন নৈতিকতায়। মানব প্রয়োজনের বিভিন্ন দিকের উন্মোচন ঘটিয়েছেন তাঁর বিশ্লেষণী ধারার নিগুঢ় তত্ত্বের পর্যায়-পরম্পরায়। সমাজ এগিয়ে চলে বিদ্যমান যুগের চিন্তা, চেতনা, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক কৃষ্টিকে গ্রহণ ও ধারণ করে। প্রতিফলিত হয় সময়ের সৃষ্টিশীল ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ড। দেব এর ব্যত্যয় ঘটান নি কোথাও। তিনি পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক ভাবধারা এবং প্রাচ্যের ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক ভাবের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর দর্শনচর্চা তথা মানবজাতির জাগতিক নৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টিভঙ্গি। পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক ভাবনার প্রেক্ষাপটে দেব প্রতীচ্যের তত্ত্ব, দর্শন, বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে মানবজীবনের বাস্তব প্রয়োজনকে আদর্শিকতার মানদণ্ডে দাঁড় করিয়ে একটি সুখী এবং সমৃদ্ধশালী বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। 'তত্ত্ব'-কে আশ্রয় করেই দেবের দর্শনচর্চার প্রথম হাতেখড়ি এবং তার পরিচয় মেলে দেবের যুগান্তকারী রচনা *Idealism and Progress* গ্রন্থটিতে। গ্রন্থটি দেবের রচনার মৌলিক দিকটিকেই বিধৃত করে। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি যুক্তি-বিচার-বিশ্লেষণের কঠিন বলয় থেকে মুক্ত হয়ে সাধারণ মানুষের কাতারে এসে দাঁড়ান। কেবলমাত্র শুষ্ক তত্ত্বের আলোচনা জীবনকে একঘেয়ে এবং মরুময় করে তোলে। দেব উপলব্ধি করেছিলেন, তত্ত্বের সাথে প্রয়োগের সমন্বয়সাধন জরুরি এবং এ ধরনের সমন্বয়ই বাস্তবজীবনে মানুষকে পরিপূর্ণতা প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে। সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আদর্শে উজ্জীবিত এ মহামনীষী অকপটে স্বীকার করেছেন তাঁর জীবনে যেসব মহাপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটেছিলো তাদের কথা। সে সব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ ছিলেন, ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সকলের মূল্যবান সম্পদ। এসব মনীষীদের সম্পর্কে দেব বলেন "তাঁদের জীবন ও বাণী সব সংকীর্ণতার, জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বহু উর্ধ্বে–তাঁদের বাণী, জীবন সব দেশের সব মানুষের সম্পত্তি। পৃথিবীর অগণিত সাধারণ মানুষেরই একজন আমি, সে বাণীতে আর দশজনের মত আমারও সমান অধিকার।"[১] দেবের জীবনে এসব মহামনীষীর প্রভাব অনস্বীকার্য। উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী দেব দর্শনের তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করেছিলেন শুধুমাত্র মানবকল্যাণ ও মানবমুক্তির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে। মানবতার আদর্শে উৎকর্ষিত দেবের তাত্ত্বিক দর্শন সফল জীবনদর্শনেরই এক অব্যর্থ সাংকেতিক নিদর্শন। মানবতাবাদের মধ্যে দিয়েই দেবের দর্শন বিকশিত হয়েছে। দর্শন ও মানবকল্যাণ জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলেই তা জীবনের ন্যায় বিশাল এবং বিন্যস্ত। দেবের বাল্য-কৈশোরের অনুকূল-প্রতিকূল পরিবেশ তাঁর জীবনে এক মহাক্রান্তিকাল বলে বিবেচিত হলেও সে সময়গুলি ছিল দেবের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। নতুবা বিদ্যমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিত বিচারে তার দর্শন-ধর্ম-বিজ্ঞান ও মানবকল্যাণের মতো জীবনঘনিষ্ঠ বিষয় সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সাদামাটাই থেকে যেতো। জীবনের উত্থান-পতনের এ মহাযজ্ঞে দেব দর্শনকে মানব ইতিহাসের এক বড়ো দান বলে অভিহিত করেছেন। তিনি মনে করেন, দর্শনের যথাযথ অনুশীলনই ব্যক্তি তথা মানবগোষ্ঠীকে সার্থক জীবনযাত্রায় অগ্রণী ভূমিকা পালনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। একটি বিষয়

Dhaka University Institutional Repository

এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, দেবের দর্শন ভাবনা গতিশীলতা লাভ করে বিংশ শতাব্দীতে নীতিদর্শনের ক্ষেত্রে সমকালীন নীতিবিদ্যার প্রবর্তন ও আবির্ভাবের প্রতিক্রিয়া হিসেবে। সমকালীন নীতিবিদ্যা মূলত নৈতিক পদ বা ধারণার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর গুরুত্বারোপ করে থাকে। সেক্ষেত্রে দেব প্রাচ্য-প্রতীচ্য ধারার সংমিশ্রণ ও বিশ্লেষণ করে দর্শনের যে সামগ্রিক চিত্র প্রদান করেছেন তা মানবসমাজের বাস্তব প্রয়োজনের বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই। সমাজবিজ্ঞান ও সমাজদর্শন উভয়ই সমাজস্থিত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার মুখপাত্র হিসেবে তার সময় ও কালের কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন ঘটায়। প্রতিটি সমাজের সমস্যা, সংকট, নৈরাশ্য এবং প্রত্যাশা-প্রাপ্তির যে সহজাত চিত্র পরিলক্ষিত হয় দেবের দর্শন তার অন্বেষণ-অনুসন্ধানপূর্বক সমন্বয়ের মাধ্যমে এসব সমাধানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। মূলত ব্যক্তি যে সময় ও সমাজের প্রতিভু তার সংকট ও সম্ভাবনা যেমন তাকে তাড়িত করে তেমনি সমাধানের নিরন্তর প্রচেষ্টায় তার সৃজনশীল মনোভাবেরও অভিব্যক্তি ঘটে। দেবের দার্শনিক মনোভাবের বিকাশ ঘটেছিলো সমাজ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র, ধর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা সবকিছুরই বিষয়-বৈচিত্র্যে। এতে সাধারণ মানুষের জাগতিক চাহিদা ও আত্মিক ক্ষুধা পরিপূরণের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। এজন্যই দেবের দর্শন হয়ে উঠে জীবনদর্শনেরই এক সার্থক প্রতিচ্ছবি। তিনি মনে করেন, জীবনের প্রয়োজনবোধ থেকেই সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে যে দর্শনের জন্ম হয়েছিলো তাকে ব্যবহারিক জীবনে অনুশীলন ও যথাযথ চর্চার মধ্য দিয়েই বৃহত্তর পরিসরে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মানবজীবনের মৌলিক মানবিক দিকের উন্মেষ ঘটিয়ে সুষ্ঠু দর্শনচর্চার মধ্যে দিয়েই মানবকল্যাণ নিশ্চিত হবে বলে দেব আশা প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে স্বীকার্য সত্য হচ্ছে, দেব দর্শনের গোড়াপত্তন হয় চিরায়ত ভাববাদের হাত ধরে। তবে, প্রচলিত এ ভাববাদকে ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করে দেব সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে, নতুন কৌশলে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। দেব ভাববাদের সাথে আধুনিক বিশুদ্ধ জড়বাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে জীবনের জন্য প্রেরণাদায়ী এক নতুন দর্শনের সূত্রপাত করেন। আর এরূপ সংমিশ্রণকেই দেব 'সমন্বয়' বলে অভিহিত করেন। দেবের সমন্বয়ী ধারণা একটি ন্যায়পর আদর্শ সমাজের ভিত্তিভূমি রচনা করতে সর্বতোভাবে সমর্থন যোগাতে সক্ষম। এতে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়টিও যথার্থভাবে বিধৃত হয়েছে। তিনি বলেন, আদর্শিক ভাববাদ জড়বাদীয় শক্তির প্রতি ভীত নয় বরং সঙ্গতিহীন হয়ে উঠে সত্তার অভিন্নতার সাথে জড়ের আদর্শহীন অমূলক বাস্তবায়নে। দেবের মতে, সত্তার একত্ব ও সমতাসম্পন্ন সর্বোচ্চ ভাববাদ বিশুদ্ধ জড়বাদীয়

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির দাবির প্রতি সোচ্চার ও যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। বাস্তবজীবনের সমস্যাগুলি সমাধানের লক্ষ্যে দেব ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক এবং নিষ্ঠাবান। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, মানবজীবনের এসব সমস্যার সমাধান শুধুমাত্র তত্ত্বালোচনায় সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষ তত্ত্বের চেয়ে প্রয়োগের প্রতিই অধিক আগ্রহী । ব্যবহারিক জীবনাদর্শের অবদানকে সাধারণ মানুষ অতি আগ্রহের সাথে ধারণ, গ্রহণ এবং অনুশীলন করে। দেবের সমন্বয়বাদীতা বহুদিক থেকেই বিতর্কের উর্ধ্বে। তাঁর সমন্বয়ের ধারায় তাত্ত্বিক দিক থেকে যুক্ত হয়েছে ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা, স্বজ্ঞা, জড়বাদ, ভাববাদ এবং ধর্ম, বিজ্ঞান ও দর্শনের অন্যদিকে প্রায়োগিক দিকের সাথে যুক্ত করেছেন সাধারণ মানুষের জৈবিক-আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব কল্যাণ-অকল্যাণের সাথে মানবমুক্তির বিষয়টি। সমন্বয়ের মূল চেতনাকে তিনি নৈতিকতার চিরন্তন বাণীর মধ্যে সুরক্ষিত ও সংহত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। দেবের এ নৈতিকতা ঐতিহ্যবাহী চিরন্তন মধ্যপথের সাধনাকেই উৎসাহিত ও প্রতিকায়িত করে। বস্তুত "তাত্ত্বিক দিক থেকে শ্রী অরবিন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দ এবং প্রয়োগের দিক থেকে গৌতম বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় তাঁর (দেবের) দীক্ষা এতই প্রাথমিক চূড়ান্ত ও সুদূরপ্রসারী যে সমন্বয়ী দর্শন গড়ে তোলার সময় তিনি এক রকম নিজের অজ্ঞাতসারেই এঁদের চিন্তাধারার অনুগামী হয়ে পড়েন।"[২] দেবের সমন্বয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের মৌলিকত্ব খুঁজে পাওয়া যায় সর্বজনস্বীকৃত জ্ঞানের সঙ্গে অনুভব উৎসারিত প্রেমের সংযোগ সাধনে। বিশ্বমানবতার স্থায়ী কল্যাণসাধনের উপায় হিসেবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং সংকীর্ণতাবর্জিত প্রেমের অনুশীলন একান্ত জরুরি বলে দেব মনে করেন। আধ্যাত্মিক প্রেমে উজ্জীবিত ধর্মকে দেব ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে অভিহিত করেছেন। নব্য নৈতিকতায় এক উদার বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের অবিস্মরণীয় আহ্বান তাঁর দর্শনের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি করেছে। সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ মানুষকে সংকুচিত করে তার সার্বিক প্রগতির পথ রোধ করে দাঁড়ায়। একবিশ্বরাষ্ট্র গঠনে প্রয়োজন প্রেম ও ঐক্যবোধে উজ্জীবিত এক উদারনৈতিক মনোদৃষ্টির। যেটাকে দেব 'একজগৎ' গঠনের উন্নততর রূপ বলে অভিহিত করেছেন। দেবের এমন প্রত্যাশাই প্রমাণ করে সমকালীন সমাজব্যবস্থায় তিনি এক নিবেদিতপ্রাণ প্রবাদপুরুষ। এই মানবপ্রেমী দার্শনিক সমগ্র মানবসমাজকে একজাতি হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের দুঃখ-দুর্দশা, বেদনা-ব্যর্থতাকে আপন মনের আঙ্গিনায় ঠাঁই করে দিয়েছেন। সাধারণ মানুষই দেবের দর্শনের অন্যতম সারবস্তু। তাই তিনি এসব মানুষের জন্য স্থান-কাল-

Dhaka University Institutional Repository

নির্বিশেষে একই জীবনব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। দেব ভীত ছিলেন বিজ্ঞানের ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে। তিনি বলেন, বিজ্ঞানের এমন একতরফা আবির্ভাবে ধ্বংসের প্রচণ্ডতা যদি বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে মানবসভ্যতা একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে বিজ্ঞানের শক্তিকে ধ্বংসের পথে না নিয়ে মানবকল্যাণের পথে নিয়োজিত করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে চিরায়ত ধর্ম উৎসারিত আধ্যাত্মিক প্রেমের সমন্বয়সাধন। পরিদৃশ্যমান জগতের বাহ্যিকতা থেকে বেরিয়ে আত্মিক সম্পর্কের উপর দেব যথাসাধ্য জোর দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, উনবিংশ শতাব্দীতে ঘটে যাওয়া দুটি বিশ্বযুদ্ধ মানুষের অস্তিত্বকে নানাদিক থেকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। দেব মনে করেন, বৈজ্ঞানিক শক্তির ভয়াবহতা যে হারে বেড়ে চলেছে সে হারে মানুষের নৈতিক-নান্দনিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটছে না। বিজ্ঞান মানুষকে যে অপরিমিত শক্তির অধিকারী করে তুলেছে সে শক্তির প্রচণ্ডতাকে মানুষ নিজের আয়ত্তে আনতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে, সমাজজীবনে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে হিংসা-বিদ্বেষ, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, গণরোষ এসব ব্যাপক বিধ্বংসী সব কার্যকলাপ। তবে এক্ষেত্রেও দেব আশাবাদী–তিনি বলেন, "বিজ্ঞানের অপব্যবহারের দোষ বিজ্ঞানের কাঁধে চাপানো নিরর্থক। বৈজ্ঞানিক শক্তির সদ্ব্যবহার করার মত মনোবৃত্তি আমাদের সৃষ্টি করতে হবে। তবেই বিজ্ঞান আমাদের নিয়ে যাবে অবিমিশ্র কল্যাণের পথে।"[৩] দেব মনে করেন, এজন্য সবরকম সংকীর্ণতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে মানুষের ভেতর প্রেমভাব জাগ্রত করতে হবে। যা মানুষে মানুষে ঐক্যবোধ জাগিয়ে তুলে কর্মমুখর শুভ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ এক সভ্যসমাজ গড়ে তোলার প্রতি বদ্ধপরিকর হবে। মানুষের ব্যাপক ও স্থায়ী কল্যাণের লক্ষ্যেই ধর্ম-বিজ্ঞান-দর্শনের মধ্যে সুসমন্বয় প্রয়োজন। ধর্মে প্রচারিত ঐক্যবোধ ব্যাপক জীবনে মানুষকে প্রদান করবে নিশ্চিত-নিরাপদ জীবনের দিক নির্দেশনা এবং সুস্থ মানবিক জীবনে বয়ে আনবে প্রশান্তির অমিয়ধারা। ধর্মের ছদ্মাবরণে বিশ্বময় জাতিগত, সম্প্রদায়গত সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় যে নৃশংসতা পরিলক্ষিত হয় তা ক্ষমতারোহণকারীদের নীতিহীন উগ্র উচ্চাভিলাষ বলেই মনে হয়। দেব তাঁর *Aspirations of the Common Man* গ্রন্থে খণ্ডিত আঞ্চলিকতাবাদকে সংকীর্ণ এবং অনুদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি মনে করেন, মানুষের সফল ভবিষ্যৎ রচনা করতে হলে এসব খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক সংস্কারসাধন জরুরি। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেব দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন জীবনাদর্শকে বিস্তৃত পরিসরে প্রয়োগের সদিচ্ছা

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে দেব বলেন– "It should be practiced world wide and cannot be bottled up for select areas, for certain approach is unpsychological, unphilosophical, irreligious and against sound counsels of human history."[4]

দেবের দৃঢ় বিশ্বাস, মানবসংস্কৃতি সমৃদ্ধিলাভ করে পরস্পরের ভাবধারার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাৎপর্যের দিক থেকে মৌলিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র পৃথিবীতে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানভিত্তিক এক জাতীয় সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে। উক্ত সংস্কৃতিতে ক্ষুদ্র আঞ্চলিকতাবাদ এবং অঞ্চলভিত্তিক রাজনীতি ও সরকারের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতানীতি দ্রুত অকার্যকর প্রতীয়মান হচ্ছে। এসবের প্রেক্ষাপটে দেব একটি কার্যকর অর্থনৈতিক, নৈতিক ও অধ্যাত্মিক ভাবধারার একজাতীয় বিশ্বসংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। মানুষে মানুষে ঐক্য, সংহতি সর্বোপরি ব্যক্তি অস্তিত্বের প্রয়োজনে সমগ্র বিশ্বে আজ এক উদার বিশ্বসংস্কৃতি অপরিহার্য। বিশ্ব সংস্কৃতির এ চেতনা বিশ্বমানবের ভবিষ্যৎকে করবে নিরাপদ ও নিশ্চিত। গড়ে উঠবে প্রগতিশীল সুখী-সমৃদ্ধশালী নতুন এক বিশ্ব। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যথার্থ এবং অব্যাহত অনুশীলনের মাধ্যমে এ বিশ্বসমাজ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে। দেব মনে করেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখার মধ্যে অর্ন্তনিহিত ঐক্য এবং এর সর্বাজনীনতার প্রতি মনোযোগী হলে সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এমন এক নব দিগন্তের সূচনা হবে যা বিছিন্ন কোনো দেশ, জাতি বা সমাজের অনুভূতি-উপলব্ধির মাধ্যম হিসেবে শুধু সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সংস্কৃতির বহুমুখীনতা বিস্তার লাভ করবে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে। বাহ্যিক আচার-আচরণ, বেশ–ভূষায়, সভ্যতা-মানবিকতায় আজকের বিশ্বব্যবস্থা সবদিক থেকেই যেখানে এক হতে চলেছে সেখানে ভাষাগত, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় এবং স্থানীয় আঞ্চলিক প্রত্যয়সমূহ দ্বারা মানুষকে বিভক্তিকরণ শুধু বিপর্যয়ই নয় বরং মানুষের অনাগত ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করে তুলবে। সে লক্ষ্যেই দেব এমন একটি বিশ্বব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেন যেখানে পৃথিবীর সব ধর্ম, সব জাতি সব সংস্কৃতি মিলে এক আদর্শ-চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে তাদের মৌলিক, মানবিক ও বৈষয়িক চেতনার উন্মেষ ঘটাবে। তিনি মনে করেন, ভাষাগত বৈসাদৃশ্য থাকা সত্বেও একক এবং বিশ্বমানসিকতা গড়ে তোলা সম্ভব। কেননা, বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নতা থাকবেই। বৈচিত্র্যহীন মানবজীবন নিরানন্দ এবং একঘেয়েমিতে পরিণত হয়। বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের যে বিকাশ সেটিই জীবনকে পরিপূর্ণতার পথে চালিত করে। এ প্রসঙ্গে দেব

Dhaka University Institutional Repository

বলেন, "যদি অন্তরের মাঝে সত্যিকারের ঐক্যের অনুভূতি থাকে তবে সে অনুভূতি তার সমানুপাতিক দেশাচার এবং ঐতিহ্যের মাঝে প্রকাশিত না হয়ে পারে না।"[৫]

ক্ষুদ্রস্বার্থ সম্বলিত আঞ্চলিকতাবাদের রাহুগ্রাস থেকে বেরিয়ে ব্যক্তিকে বিশ্ব মানুষের ধারণায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে। ব্যক্তিসত্তার মাঝে 'আমিত্ব' বোধের চেতনাকে শাণিত করার প্রত্যয়ই ব্যক্ত হয়েছে দেবের দর্শনে। দেব একথা উপলব্ধি করেছিলেন যে, ব্যক্তির 'আমিত্ব' বোধের প্রকৃত চেতনাই তাকে বিজ্ঞান প্রভাবিত পরিবেশের সাথে সমন্বিত করে বিশ্বব্যবস্থায় সুসভ্য এবং সহানুভূতি সম্পন্ন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে। জীবন সম্পর্কে দেবের দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই খণ্ডিত ছিলো না। অখণ্ড মানবতাবাদ এবং মানবকল্যাণই ছিলো তাঁর দর্শনের নিহিতার্থ। দেবের সংস্কৃতি ভাবনার বৈচিত্র্য এবং এর ক্রমোৎকর্ষতার পরিচয় মেলে তাঁর রচিত 'একটি টিকেট চেকার থেকে আন্তর্জাতিকতার শিক্ষা' শীর্ষক শিরোনামের মাধ্যমে। এখানে দেব সেই নির্দোষ টিকেট চেকারকে উদ্দেশ্য করে যা বলেছিলেন তা হলো, "হে প্রিয় বন্ধু! আমার চেহারা তৃতীয় শ্রেণীর কিন্তু আমার টিকেট দ্বিতীয় শ্রেণীর।"[৬]

দেবের এহেন তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি প্রমাণ করে উক্ত টিকেট চেকার দেবকে প্রকারান্তরে আন্তর্জাতিকতাবোধ সম্পন্ন মানসিকতার প্রতিই ইংগিত প্রদর্শন করেছিলো। সুতরাং খণ্ডিত দৃষ্টি পরিহার করে অখণ্ড, উদার মানসিক দৃষ্টির অনুশীলন করা যথার্থ অর্থেই সময়ের দাবি। দেব বিশ্বাস করেন, পুরনো ধর্ম ও দর্শন যা মানবঐক্যের বিষয়টিকে আলোকিত করে এসেছে বহুপূর্ব থেকেই। এ দিকটির প্রতি বিমূর্ত ভাবাপন্নতার মানসিকতাও পরিলক্ষিত হয়েছিলো। তবে বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এ সত্যটিকে নানা দিক থেকেই মূর্ত করে তুলেছে । এ প্রসঙ্গে দেব তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে বলেন,

> "Judged from this perspective the physical unity is as it were the body of the spiritual unity, and the spiritual unity, its soul. In this soul-body union on a collective scale, in the spiritualisation of science and the materialisation of religion and philosophy lies the key to the prosperity of the common man."[৭]

Dhaka University Institutional Repository

আসলে জীবন বিবর্জিত দর্শনচর্চা ও ধর্মীয় সাধনা মানবকল্যাণে কোনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম নয়। প্রয়োজন দর্শন ও ধর্মের আন্তরিক মিলন যা দেব তাঁর দর্শনে নানাভাবে নানা আঙ্গিকে ব্যক্ত করেছেন। দেব সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাচ্য-প্রতীচ্য ধারার মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পান না। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং ভাবাদর্শগত যে সব বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় তাকে আঞ্চলিক স্বার্থ রক্ষার অজুহাতে মানুষকে খণ্ডিত মানসিকতা সম্পন্নরূপেই গড়ে তোলা হয়। গোষ্ঠীগত এবং আঞ্চলিক সংস্কৃতি মানুষের মাঝে বিভেদের সৃষ্টি করে। যা পরিণতিতে বিপ্লব ও সাংঘর্ষিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়। এ লক্ষ্যেই দেব গোষ্ঠীগত ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির ক্ষতিকর দিকটি বর্জন করে সবচেয়ে ভালো দিকটিকে গ্রহণ করার পক্ষে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দেব অর্থনৈতিক এবং সমন্বয়ের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। তিনি মনে করেন, আগামী দিনের বিশ্বসংস্কৃতির আদলে গণসংস্কৃতির চর্চাই হবে প্রগতির মূল প্রতিপ্রাদ্য। এই গণসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হবে অর্থনৈতিক মুক্তি, নারীর প্রতি যথাযথ মর্যাদা প্রদান এবং বর্ণবাদ বিরোধী মনোবৃত্তি। এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান তাঁর 'গোবিন্দ দেবের সংস্কৃতি–ভাবনা' শীর্ষক শিরোনামে বলেন–

> "দেবের মতে সমস্ত মানুষ এবং বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিরাজিত একটি অর্ন্তনিহিত ঐক্যের অনুভূতি হচ্ছে আগামী দিনের বিশ্বসংস্কৃতির জ্ঞানগত ভিত্তি। আর এর থেকে উৎসারিত যে সমন্বয়ধর্মী দার্শনিক মতবাদ–সমন্বয়ী ভাববাদ (Synthetic idealism) –সেটি হচ্ছে এ সংস্কৃতির দার্শনিক বুনিয়াদ।"[৮]

দেবের দর্শন সব ধরনের খণ্ডিত আঞ্চলিকতা এবং সাম্প্রদায়িকতার বহু উর্ধ্বে উঠে এক মহান সমন্বয়ের মন্ত্রে দীক্ষিত। দেবের বিশ্বসংস্কৃতিতে বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়া তার দর্শনকে অলংকৃত করেছে। দেব জীবন ও জগতকে একদেশদর্শী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন নি। তাঁর দর্শনে উঠে এসেছে সনাতন ধর্মের উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত অন্যদিকে ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ কোরান-হাদীসের আলোচনা। বৌদ্ধধর্মের গৌতম বুদ্ধ, খ্রীষ্টান ধর্মের যিশুখ্রিষ্টসহ নানা মত পথের সাধকদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে তার সংস্কৃতির অপূর্ব ভিত্তিভূমি। দেবের সৃজনশীল মনোভাবের পরিচয় মেলে এসবের প্রকাশ-বিকাশের অনুসন্ধান ও অভিনবত্বে। দেবের অনুসন্ধিৎসু মন সর্বদাই বিশ্বকল্যাণের নতুন ধারার সংযোগ সাধনের প্রতি আগ্রহী ছিলো। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আদান প্রদানের বিষয়টির আলোচনায় দেব দেখান যে, সুদূর অতীতেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এরূপ সংযোজন-সংমিশ্রণ

Dhaka University Institutional Repository

ঘটেছে। দেব ইতিহাস উল্লেখপূর্বক দেখাতে চেষ্টা করেন খ্রিষ্টপূর্ব যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে কেবল সংস্কৃতির যোগাযোগই ছিলো না বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাচ্য সংস্কৃতি পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে প্রভাবান্বিতও করেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি ইজিয়ান সাগরস্থ ক্রিটি দ্বীপের সংস্কৃতি–সভ্যতার উদাহরণ প্রদান করেন এবং বলেন, কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের বহুপূর্ব থেকেই মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকার সাথে প্রাচ্য সভ্যতা-সংস্কৃতির যোগাযোগ ও আদান-প্রদান অব্যাহত ছিলো। দেব আনন্দিত এই ভেবে যে, বর্তমান সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তাতে করে জগৎটা কেবল ছোট হয়ে যাচ্ছে না বরং অবসান ঘটতে যাচ্ছে বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদাত্মক সংস্কৃতিরও।[৯]

দেবের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ইতালিয়ান সাহিত্যের মানববাদ যেমন আলোচিত হয়েছে তেমনি ফরাসি বিপ্লবসহ আমেরিকার গৃহযুদ্ধ এবং দাসপ্রথার আলোচনাও সতর্কতার সাথে তুলে এনেছেন। মধ্যযুগ ও আধুনিকযুগের সমাজ সংস্কারকগণও ছিলেন দেবের দর্শনালোচনা তথা সংস্কৃতির মূল উপাত্ত।

ধর্ম, সংস্কৃতি, সমাজচিত্রকে স্থানিক-কালিক গণ্ডির মনন–মানস সংগঠনের সাথে আধুনিক সময়ের ধ্যান-ধারণাকে সমন্বিত করে এক মহামৃত্যের সন্ধান করাই ছিলো দেবের বিশ্বসংস্কৃতি তথা গণসংস্কৃতির রূপায়িত আদর্শ। তিনি এক বিশ্বপতাকাতলে সমবেত করতে চেয়েছেন নানা গোষ্ঠী, গোত্র, সম্প্রদায়, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী নির্বিশেষে প্রেম ও ঐক্যের বন্ধনে সুসমন্বিত করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন শোষণ-বঞ্চনাহীন, নিপীড়ন–নির্যাতনবিহীন সার্বজনীন আদর্শ বিশ্বসংস্কৃতি।

'বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিম দার্শনিকদের দান' প্রবন্ধে দেব সংস্কৃতির এক সুমহান বার্তা তুলে ধরেছেন। তিনি মুসলিম দার্শনিক তথা দর্শন সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেন তা হলো, শুধু বুদ্ধির কসরৎ দিয়ে নয়, তিনি তাঁর হৃদয়ের গভীর অনুরাগ দ্বারা এ দর্শনকে আপনার করে নিয়েছেন। কেননা, দর্শনের কোনো জাত বা কোনো দেশ নেই। দর্শন সব দেশের সব মানুষের সার্বজনীন সম্পত্তি। মানুষ এ সম্পত্তিকে আপন হৃদয়ের অনুরাগ দ্বারা আপনার করে নেবার কৌশল আয়ত্ত করতে ব্যর্থ হয়। মুসলিম দার্শনিকেরা নিজেদের স্বকীয়তার গুণে রেনেসাঁর বহু পূর্ব থেকেই স্বাধীন চিন্তাধারা ও বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে দর্শনের ক্ষেত্রে সার্বজনীনতার পরিচয় দিয়ে গেছেন।[১০] ধর্ম প্রভাবিত মধ্যযুগীয় চার্চের নির্বিচার বিশ্বাসের প্রতিবাদ থেকেই ইউরোপীয় আধুনিক দর্শনে স্বাধীন চিন্তার উৎপত্তি। তখন

Dhaka University Institutional Repository

থেকেই শুরু হয় আধুনিক দর্শনে মুক্তচিন্তার বিকাশ ও অগ্রগতি। কালের পরিক্রমায় বৈজ্ঞানিক শক্তির প্রভাবে মুসলিম দার্শনিকেরা নিজেদের চিন্তা, চেতনাকে সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে বিজ্ঞানঘনিষ্ঠ পরিবেশের মধ্যেই স্বাধীন চিন্তার অনুকূল একটি পরিবেশ তারা সৃষ্টি করেছিলেন। এভাবে মুসলিম দার্শনিকেরা ধর্মীয় গোড়ামি এবং অযৌক্তিক ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নতুন পরিবেশে স্বাধীন বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্বসংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। দেবের সংস্কৃতি বিকাশের ধারা আরো সমৃদ্ধি লাভ করেছে আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-র উদার ও মননধর্মীতার সংস্পর্শে এসে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হিন্দু-মুসলমানদের ভেতর সমঝোতা ও ঐক্য সাধনের প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন বিভিন্ন সভা-সমিতি, বর্ক্তৃতা-বিবৃতি এমনকি দৈনন্দিন আলাপচারিতার মধ্যে দিয়ে। সেসব আলাপচারিতার রসাস্বাদন থেকে দেবও বাদ পড়েন নি। এ প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মহিম্ন স্তবের এক তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোক উদ্ধৃত করেন যাতে বলা হয়, "সব জল যেমন শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে পৌঁছে তেমনি তোমার সঙ্গে মিলনেই হবে সব সাধনার শেষ।"[১১] সেজন্য প্রয়োজন আন্তরিকতার সাথে মতৈক্যের অনুশীলন। দেবের সংস্কৃতি বিষয়ক ভাবনার সারমর্ম হলো দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে বিশ্বসংস্কৃতির সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি সাধন। তিনি মনে করেন, আজকের এই জটিল পরিস্থিতিতে বিজ্ঞান ও শিল্পকলা নিজ প্রয়োজনেই মানব ঐক্যের দাবিকে জোরালোভাবে সমর্থন করছে। তেমনি, ধর্মীয় অধ্যাত্মবাদে মানব ঐক্যের যে সুর ধ্বনিত হয় তা নিছক কোনো স্বপ্নবিলাস নয় বরং বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত। আর বিজ্ঞান নির্ভর মানব ঐক্য সাধারণ মানব প্রয়োজনেরই চর্চা করে বলে দেব মনে করেন।

দেব দর্শনে সমন্বয়ের বিষয়টি বহুদিক থেকেই বিন্যস্ত হয়েছে। তিনি মনে করেন, মানবজাতির সফল ভবিষ্যৎ তথা প্রগতি নির্ভর করে দ্বন্দ্বে নয় সমন্বয়ে, সংঘর্ষে নয় শান্তিতে, মতভেদে নয় মতৈক্যে। 'জড়' ও 'ভাব' এর দ্বন্দ্ব চিরন্তন। দেব এই দুই মতের সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে সমাজের ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র, সাদা কালোর মেলবন্ধনে সামাজিক স্থিতিশীলতার প্রতি আস্থাশীল হয়ে উঠেছিলেন। নিপীড়িত-বঞ্চিত সাধারণ মানুষের প্রতি দেবের ছিল প্রগাঢ় ভালোবাসা। সমাজের উঁচু তলার মানুষ হয়েও দেব ছিলেন একজন সাধারণ মানুষেরই মতো। আর্ত-মানবতার প্রতি তার সহানুভূতি-সহমর্মিতা, অন্যের বিপদে এগিয়ে আসা এসবই তার কোমল মনের পরিচয় বহন করে। ধর্মের প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

গভীর আত্মবিশ্বাস থেকেই জন্ম নিয়েছিলো সাধারণ মানুষের প্রতি দেবের ভালোবাসা। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই মানবমনে ধর্মীয় বোধ জাগ্রত হয়েছিলো। পৃথিবীতে বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং ধর্ম রয়েছে। ধর্ম মানবসত্তার অর্ন্তনিহিত দিকের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করে থাকে। দেব মনে করেন, ধর্ম হলো বহিঃসত্তার এমন এক অভিজ্ঞতা মানববুদ্ধি যাকে ব্যাখ্যা বা বুঝে উঠতে পারে না। বোধগম্যহীন এ পর্যায়টি হচ্ছে ধর্মের মণিকোঠা মূল সুর। দেব বিভিন্নভাবে দেখিয়েছেন পরমসত্তাকে জানার আগ্রহ মানুষের চিরন্তন বাসনাগুলির মধ্যে অন্যতম। এ লক্ষ্যেই দর্শনে উদ্ভব হয়েছে বিভিন্ন মত-পথের। এগুলির কোনোটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন আবার কোনো কোনোটি অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন। দেবের মতে, ধর্ম মানুষের ভালোত্বের প্রতিটি দিকের উন্মোচন ঘটায়। মানুষের নৈতিক অস্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়ে পরমসত্তার সাথে ঐক্যের অনুভূতি গড়ে দেয়। প্রজ্জ্বলিত ও প্রসারিত করে তোলে আধ্যাত্মিক চেতনার গভীরতম অনুভবকে। মূলত ধর্মের মূললক্ষ্য হলো প্রত্যাদিষ্ট বিষয়ের প্রতি পূর্ণসত্তায় বিশ্বাসস্থাপন যাতে অর্ন্তভুক্ত থাকে ঐশী সত্তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন, প্রার্থনা, আনুগত্য এবং প্রকৃতির নিয়মের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা। ধর্মে আস্থাশীল মানুষ তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস-কর্ম সবকিছুকেই এমনকি জগত-জীবন সম্পর্কেও ঐশী সত্তার সাথে একাত্ম হয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ সাধন করে। দেবের মতে, মৌলিক-মানবিক গুণ দ্বারা ধর্মকে লালন করতে হবে, যেথায় 'প্রেম' হবে ধর্মের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বন্ধন। প্রেমের স্থায়ী বন্ধন এবং আত্মসত্তার গভীর থেকে যে বাণী মানবমনে উচ্চারিত হবে এই শাশ্বত আহ্বানকেই দেব 'আধ্যাত্মিক ঐক্যের চেতনা' বলে দাবি করেন। এ প্রসঙ্গে দেব বলেন, "ব্যক্তি স্বীয় অন্তর নিভৃতে যা করেন তাই ধর্ম।"[১২] দেবের ধর্মীয় চেতনার মূলে ছিলো একক পরমতত্ত্বের স্বীকৃতি। এই পরমতত্ত্বই জগতের যাবতীয় বস্তু ও ঘটনার মূল কারণ। এই পরমসত্তা জগতে বিভিন্নভাবে বিভিন্নরূপে নিজেকে প্রকাশিত করে চলেছে। এই একক সত্তাই রূপ নেয় কখনো বহুর আবার বহু তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করে একক সত্তার মাঝে। বহুর এই অর্ন্তনিহিত ঐক্যের মাঝেই দেব জগৎ এবং জীবনকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। দেবের মতে, এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, জাতিতে জাতিতে সর্বোপরি বিশ্ব বৈচিত্র্যের মাঝে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলীভূত এই একত্ব নীতির মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন দর্শন ও ধর্মের, বিজ্ঞান ও দর্শনের, শক্তি ও প্রেমের সর্বোপরি আধ্যাত্মবাদের সাথে জড়বাদের মিলনের সূত্র।[১৩] দেব ধর্মকে দেখেছেন জীবনদর্শনের অন্যতম মূলচালিকাশক্তি রূপে। যার মধ্যে জাতি, ধর্ম,

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণ, সম্প্রদায় সবকিছুরই এক সুসমঞ্জস সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। মানুষের প্রগতি এবং অগ্রগতির ধারাও সুরক্ষিত হয়। নিশ্চিত হয় মানবকল্যাণের সেই মহিমান্বিত আদর্শ। দেব বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মবাদকে একই সত্তার দু'টি দিক বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, মানুষের বৈষয়িক চাহিদার পাশাপাশি রয়েছে অলঙ্ঘনীয় এক আধ্যাত্মিক চাহিদা। আধ্যাত্মিক তৃপ্তির পর্যায়টি প্রকাশিত হয় ব্যক্তির উন্নত নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষতার মাঝে। নৈতিকতার প্রকাশ এবং বিকাশ সাধন জড় জগতের বৈষয়িক চাহিদা দ্বারা নির্ণীত হতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন নৈতিক নান্দনিকতাবোধ ও মানুষের ব্যক্তিগত অভিরুচির পরিশীলিত মনন-মানস। মানবজীবনে এর মূল্য অনস্বীকার্য। মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল এই সত্যটিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই নৈতিকতাকে বিজ্ঞানোচিত মনোভাবের বেড়াজালে আবদ্ধ না করে বরং মানবজীবনের ব্যাপক কল্যাণে একে নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন। দেব ধর্ম ও নৈতিকতাকে মানুষের ব্যাপক কল্যাণ ও প্রগতির ধারাকে সুরক্ষিত করার শক্তিশালী হাতিয়ার বলে মনে করেন। দেব একথাও বলেছেন, আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত ঐক্যের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতীত মানুষের ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক এবং দার্শনিক দিকের যথার্থ বিকাশ সম্ভব নয়। তিনি মনে করেন, বিজ্ঞানের ভৌত ঐক্য তার পরিপূরক অংশকে ধর্ম ও দর্শনের আধ্যাত্মিক ঐক্যের বিশালত্বের মাঝে উন্মোচিত করে। বিজ্ঞানের সাথে ধর্মবোধের যথাযথ মিলনই পারে ব্যাপক মানবজীবনে প্রশান্তির পরশ বুলাতে। মানবসত্তার মহত্ত্বের প্রতিনিধি হিসেবে তার আত্মবিকাশ ও আত্মপরিচর্যার পর্যায়টি প্রোথিত রয়েছে বিজ্ঞান-ধর্ম- নান্দনিকতার মেলবন্ধনে। এ প্রসঙ্গে ড. আমিনুল ইসলাম ব্রাডলি-র *Appearance and Reality* গ্রন্থের ভূমিকার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "বস্তুর দাসত্বে শৃঙ্খলিত হয়ে মানুষ যেদিন তার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলবে, যেদিন নবারুণ ও গোধূলির রক্তিম রাগ তার মনকে আর স্পন্দিত করবে না, এক কথায় মানুষ যেদিন তার শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়ে পাশবিক পর্যায়ে অধঃপতিত হয়ে যাবে, সেদিনই কেবল তার পক্ষে পরিহার করা সম্ভব হবে মানবিক মূল্যবোধের চর্চা ও অনুশীলন।"[১৪] ধর্মের ক্ষেত্রে দেব মানবিক মূল্যমানগুলোকে যুক্তি, বুদ্ধি, বিশ্বাস, সৌন্দর্য, স্বজ্ঞা প্রভৃতি প্রত্যয়গুলি দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উপলব্ধি করা প্রয়োজন বলে মনে করেন। ক্ষতিকর কঠোর মনোভাবকে পরিহার করে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সমঝোতার আদর্শকে সমুন্নত রেখে স্থায়ী মানবকল্যাণকে সুরক্ষিত করতে হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, দেবের ধর্মচেতনা এবং মানবঐক্যের ধারণা প্রভাবিত হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ, গৌতম বুদ্ধ এবং যিশুখ্রিষ্টের মহান প্রেমের বাণী দ্বারা। ধর্মের ক্ষেত্রে মধ্যপথের ধারণা

Dhaka University Institutional Repository

যে নতুন কিছু নয় এ সত্যটি তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তদুপরি মধ্যপথই যে মুক্তির আসল পথ এ বাণী প্রচার এবং আচার করে গিয়েছেন সারাজীবন। মধ্যপথের নির্দেশ ব্যক্তির মনে এক ধরনের নিরাসক্তির ভাব জাগিয়ে তুলে মানুষকে মানবকল্যাণ তথা মুক্তির পথনির্দেশ করে। জীবনদর্শনের সাথে ধর্মের অপূর্ব সম্মিলন দেব দর্শনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য একটি দিক। মানুষের সেবার মাধ্যমে ঈশরের সেবা করার যে মহিমত্ব প্রকাশ পায় দেব তাঁর দর্শনে সেটি অকৃপণভাবে দেখিয়েছেন। নিরহংকার এ মনীষী তাই খুব সহজ করেই বলতে পেরেছেন, "আমার জীবনদর্শনের সঙ্গে ব্যক্তিগত অহমিকার সংযোগ অবাঞ্ছনীয় এবং অনাবশ্যক। চাঁদের আলোর মতোই এ দর্শন সবারই সম্পত্তি।"[১৫] দেব ধর্মের মৌলিকত্বকে প্রচলিত প্রথাসিদ্ধ চিন্তাধারা থেকে বহু উর্ধ্বে রেখে এর বিশুদ্ধতার চিত্রটি তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। ধর্মের একক আধ্যাত্মতত্ত্বের শক্তিই মানুষের মধ্যে ঐক্য, প্রেম, সম্প্রীতি, সমঝোতা স্থাপন করে জীবনকে অর্থপূর্ণরূপে গড়ে তুলতে পারে। এতেই মিটবে মানুষের বৈষয়িক চাহিদা এবং আত্মিক ক্ষুধা। ধর্মের মধ্যে দিয়ে যে প্রেম জাগ্রত হয় তা মানবহৃদয়কে কলুষমুক্ত করে ঐক্যের বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। তবে দেব একথাও বুঝেছিলেন, ধর্মীয় আধ্যাত্মবাদকে পুঁজি করে একশ্রেণীর ধর্মব্যবসায়ী তাদের নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করে চলেছে। ফলে সাধারণ মানুষ স্বর্গপ্রাপ্তির মোহময় আবেশে পড়ে পার্থিব জীবনের চাওয়া পাওয়াকে নিস্প্রয়োজন জ্ঞানে বর্জন করে। দেব, এসব ধর্ম ব্যবসায়ী তথা শোষক শ্রেণীর কবল থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। ধর্মীয় প্রেম এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমন্বয়ে সাধারণ মানুষের জন্য মুক্তির মঞ্চ রচনা করতে তাঁর সমগ্র সাধনা নিয়োজিত করেছেন। আপামর সাধারণ মানুষই দেবের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের মূল প্রতিপাদ্য। জ্ঞানে, প্রেমে, বিশ্বাসে, অভিলাষে জীবন্ত এ মানবসত্তার জয়গানই তার দর্শনকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। সর্বভালো আর সর্বজনবিদিত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার সমন্বয়ই ছিলো দেবের সারাজীবনের স্বপ্ন।

খ্যাতিমান রাজনীতিক হিসেবে দেবের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় ছিলো না। তবে, সচেতন নাগরিক হিসেবে সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কিভাবে নির্ধারিত হলে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী অর্থনৈতিক মুক্তিসহ সব ধরনের মুক্তি পেতে পারে; এসব বিষয়ের আলোচনা অত্যন্ত গুরত্বের সাথে দেবের বিভিন্ন রচনায় ঠাঁই পেয়েছে। আধুনিক মানবসভ্যতায় রাজনীতি হচ্ছে একটি বৃহত্তর জাতি-গোষ্ঠীর মূলচালিকাশক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

একটি সভ্য দেশের সরকার ও রাষ্ট্র পরিচালিত হয় সাংবিধানিকভাবে প্রণীত নির্দিষ্ট রাজনৈতিক নিয়মকানুনের মাধ্যমে। দেব সক্রিয় কোনো রাজনীতিবিদ ছিলেন না যে অর্থে বিদ্যমান সমাজব্যবস্থায় কাউকে রাজনীতিবিদ বলে আখ্যায়িত করা হয়। তদুপরি, রাজনীতির গুরুত্ব এবং এর গতি-প্রকৃতি সম্পর্কিত মৌলিক ভাবনার প্রতি দেবের ছিলো প্রগাঢ় আগ্রহ এবং শ্রদ্ধা। 'রাজনীতি' এবং 'ক্ষমতা' এ দু'টি বিষয় একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ক্ষমতার প্রতি মোহ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিরই এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। ক্ষমতার মোহ দেবের ছিলো না এমন কথা হয়তো বলা যাবে না তবে তিনি মনে করতেন সাধারণ মানুষের জন্য ব্যাপকভাবে ভালো কিছু করতে হলে অর্থনৈতিক সামর্থ্যের পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষমতাও জরুরি। দেব মানবকল্যাণে রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার করে মানবতাবাদী ধারাকে আরো সুদৃঢ় করতে আগ্রহী ছিলেন। দেবের বক্তব্য এ বিষয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তিনি বলেন–

> "অন্ততঃ এ যুগে স্থায়ী মানবকল্যাণ সম্ভব নয় যদি দর্শন, ধর্ম, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি এবং রাজনীতিকে একিভূতকরণের মাধ্যমে একটি সাদৃশ্য পিণ্ডে পরিণত করা না হয় এবং একদিকে জাগতিক শান্তি ও নিরাপত্তা এবং অন্যদিকে সাধারণ মানুষের প্রগতির জন্য নিশ্চিতভাবে একই উদ্দেশ্যে একে প্রয়োগ করা না হয়। সার্জনের ছুরি-কাঁচির আঘাতে এগুলিকে বিভক্ত করার চেষ্টার মধ্যে লুকিয়ে আছে মহাবিপদ। দৃষ্টিভঙ্গির এই একতা অবশ্যই প্রকাশ পাবে একটি সার্থক যন্ত্র মাধ্যমে যা মানুষের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে অর্থাৎ সরকারের মাধ্যমে।"[১৬]

দেবের রাজনৈতিক দর্শন তথা রাজনৈতিক বিশ্লেষণের অসাধারণ ক্ষমতা রাষ্ট্রবিষয়ক চিন্তা-চেতনাকে নানাদিক থেকেই সমৃদ্ধ করেছে। প্রথিতযশা কোনো রাজনৈতিক হিসেবে নয়, ষাটের দশক থেকে একাত্তর পূর্ববর্তী সময়ের উত্তাল রাজনৈতিক অঙ্গন, অস্থির রাষ্ট্রযন্ত্র এবং অস্থিতিশীল পরিবেশের প্রেক্ষিত বিবেচনা করে দেশ-মাতৃকার প্রতি গভীর অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে দেবের রাজনীতি বিষয়ক-রচনা এবং চিন্তা-চেতনায়। মূলত তাত্ত্বিক এবং ভাববাদী পরিমণ্ডলে যার বিকাশ এবং বিস্তৃতি সেই দেবের চরিত্রের বিশেষায়িত দিকটি হচ্ছে রাজনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা। জগতকে দেব সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। "তিনি তত্ত্বের এক relational whole বা সমন্বিত সমগ্ররূপের ভাবনা উপস্থাপিত করেছেন।"[১৭] ন্যায়, সত্য, সুন্দর ও

Dhaka University Institutional Repository

মঙ্গলময়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কল্যাণধর্মী রাজনীতির যৌক্তির বিচার বিশ্লেষণে দার্শনিকসুলভ প্রেমের নীতি থাকলেও তত্ত্বগত কোনো ত্রুটি থাকতে পারে না। এ লক্ষ্যেই তিনি ব্রতী হয়েছিলেন, বৃহত্তর মানবসমাজের মুক্তির জন্য বিশেষ করে তাদের সামাজিক, রাষ্ট্রীক, ধর্মীয়, নৈতিক তথা শিক্ষাসংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির দর্শন উপযোগী মৌল প্রকৃতির বিশ্লেষণ ও ভিত্তি উদ্‌ঘাটনে। তিনি রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়াবলী যেমন- শাসনতন্ত্র, সরকার পদ্ধতি, আইনসভা, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ এবং এসবের খুঁটিনাটি বিচার বিশ্লেষণেও তিনি কখনো মনোযোগী হন নি।[১৮] তবে দেবের বিশ্বাস হলো, গণমানুষের সত্যিকার মুক্তির জন্য রাজনীতি ও সরকার অবশ্যই প্রয়োজন। এছাড়া, মানবজীবনের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিকসহ যে কোনো ধরনের ভাবাদর্শই ফলপ্রসূ হবে না। দেবের রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিভূমিও প্রোথিত রয়েছে তাঁর সমন্বয়ী ভাববাদে। এই সমন্বয়ী ভাববাদের একদিকে বস্তুবাদী ধারা অন্যদিকে ভাববাদী ধারা পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য এ অভিসন্দর্ভে এ প্রসঙ্গে আলোচনা পূর্বেও রয়েছে। তদুপরি, প্রসঙ্গক্রমে তা না বললেই নয়। দেবের ভাববাদী দর্শনের আবর্তন-বিবর্তন যথাসম্ভব উল্লিখিত প্রত্যয় দু'টিকে কেন্দ্র করেই।

দেবের সমন্বয়ী দর্শনের মূলভিত্তি সাধারণ মানুষের ভাবনারাজির মধ্যেই নিহিত। মানুষ, সমাজ এবং রাষ্ট্র যেহেতু বিচ্ছিন্ন কোনো সত্তা নয় সেক্ষেত্রে সমন্বয়ী ভাবনা দেবের রাজনৈতিক দর্শনসহ অন্যান্য ভাবনারাজিরও মূলভিত্তি তৈরি করে। সাধারণ মানুষের প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধের তাগিদেই রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি দেবের প্রত্যাশা ছিলো যাতে করে এ ধরনের মানুষ তাদের জীবনকে সুখময় ও যাপনযোগ্য করে তুলতে সক্ষম হয় সেদিকে মনোযোগী হওয়া। গোবিন্দ দেব সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও আঞ্চলিকতাবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। আঞ্চলিকতাবাদের উগ্র বিভক্তিকরণ মানুষের ভৌগলিক বৈশ্বিক সীমারেখাকে সংকুচিত করে সাংঘর্ষিক মনোবৃত্তিকে অনুপ্রাণিত করে। দেব এরূপ সাম্প্রদায়িক বিভক্তিকরণকে 'মহাবিপদ' বলে উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন, এ ধরনের মহাবিপদ থেকে উত্তরণের উপলব্ধি হলো 'মহাদমন' নামক সর্বজনবিদিত প্রতিষেধক। যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত এবং বিজয়ীর মনোভাব পরিবর্তনের সদিচ্ছার অভিব্যক্তিই বিশ্ববাসীর জন্য স্থায়ী শান্তির আবাসন গড়ে দেবে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ঘটে যাওয়া দু'টি বিশ্বযুদ্ধকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির অকার্যকর

Dhaka University Institutional Repository

পরীক্ষা বলে দেব মনে করেন। তিনি আরো মনে করেন, মানবতার মুক্তি এ ধরনের কোন রাজনৈতিক পরীক্ষা দ্বারা সম্ভব নয় বরং এর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে বিশ্ব উপলব্ধি তথা স্থায়ী কার্যকর আন্তর্জাতিক সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায়।[১৯] দেব যথার্থই একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মতো উপলব্ধি করেছেন, রাজনৈতিক আদর্শ অর্জন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর নির্ভরশীল নয়, অর্থনৈতিক সুষম বন্টন ব্যবস্থার উপরও নির্ভরশীল। দেব তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করণের পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রসারতা এবং উদারনীতির সমর্থন করে গিয়েছেন। উপনিবেশবাদকে দেব জাতীয়তাবাদী ধারার সফল ফসল বলে মনে করতেন। তিনি মনে করেন, সংকীর্ণ মানসিকতাসম্পন্ন চিন্তাধারা মানুষে মানুষে কৃত্রিম বিভাজন তৈরি করে। শ্রেণী-বৈষম্যের ভিতকে উৎসাহিত করে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারকে জিইয়ে রাখে। শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বকে দীর্ঘসূত্রিতার অর্ন্তজালে জড়িয়ে রেখে মানবকল্যাণের পথকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। এ জন্য দেব এক বিশ্বসংস্কৃতির মাধ্যমে সুষ্ঠু রাজনৈতিক দর্শনের দ্বারা পরিচালিত একজগৎ মানসিকতা তৈরির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। দেব তাঁর রাষ্ট্রদর্শনে একটি শোষণহীন সমাজের বাস্তব চিত্র এঁকেছিলেন। রাজনীতিকে তিনি আদর্শিকতার আদলে তাঁর দর্শনে বাস্তবায়নের উপায় হিসেবে গণ্য করেছেন, কখনোই লক্ষ্য হিসেবে নয়।

> "এ জন্য আদর্শহীন, লক্ষ্যহীন, গণমানুষের কল্যাণে নিয়োজিত নয়-এমন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তিনি যেমন ছিলেন বিরোধী ঠিক তেমনি শুধু তত্ত্ব বা বিশ্বাস আছে কিন্তু বাস্তবে সে তত্ত্ব বা বিশ্বাসকে রূপায়িত করার কোন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি নেই এমন তত্ত্বচিন্তা বা বিশ্বাস–ব্যবস্থা (system of belief)- কেও তিনি গুরুত্ব দেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি ধর্মের মূলবাণীর সাথে রাজনীতিকে যুক্ত করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।"[২০]

দেবের সমন্বয়ী ভাবনার সাথে রাজনৈতিক দর্শনের সুবিন্যাস্তকরণ, ভবিষ্যৎ রাজনীতি ও সরকারের রূপরেখা প্রণয়ন এবং প্রগতিপন্থী এক বিশ্বরাষ্ট্র তথা একজগৎ গড়ে তোলার যে প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে তা দর্শনের ইতিহাসে শক্তিশালী মাইলফলক বলেই চিহ্নিত হবে। দেবের সমন্বয়বাদী নৈতিকতার ধারণায় সম্পৃক্ত রয়েছে তাত্ত্বিক-প্রায়োগিক দিকের এক অপূর্ব সম্মিলন। তাত্ত্বিক পর্যায়ের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় বহুত্বের ভেতরে একত্বের বুদ্ধি জাগ্রত করার মাধ্যমে। পরিদৃশ্যমান জগতের বৈচিত্র্যের

Dhaka University Institutional Repository

পেছনে যে একক তত্ত্বের স্বীকৃতি রয়েছে এটাকে নিছক থিওরি সর্বস্ব যারা মনে করেন তারা বিভ্রান্তির ধূম্রজালে নিপতিত হন। বৈচিত্র্যের মাঝেই পরমসত্তা মূর্ত প্রকাশিত। জগতের বৈচিত্র্য যেহেতু পরমাত্মার চিরন্তন প্রকাশিত রূপ সেক্ষেত্রে ব্যক্তির সাথে সত্তার একাত্মতা কেবল পূর্ণতার নিম্নতর পরিমাণ গঠনে সহায়ক। চূড়ান্ত উৎকর্ষ সাধিত হয় পরমাত্মার সাথে অভিন্ন হওয়ার পরও ব্যক্তির অনবরত মুক্তির প্রচেষ্টার মাধ্যমে। আধ্যাত্মিক শক্তির প্রচণ্ডতা ব্যক্তি আত্মাকে জয় করার মধ্যে দিয়ে সূচিত করে অনন্ত প্রশান্তির স্বর্গীয় সোপান। তবে ব্যক্তি আত্মার সর্বোচ্চ প্রশান্তি লাভের বিষয়টিতে দেব মরমীবাদের প্রতি সমর্থন যুগিয়ে গেছেন বলেই মনে হয়। মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল আধ্যাত্মবাদের প্রতি চরম বিরাগভাজন সত্ত্বেও অস্তিত্ববাদী দার্শনিক নীটশে'র 'শ্রেষ্ঠমানব' এর ধারণা এবং গৌতম বুদ্ধের সাম্য-মৈত্রীর বাণীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। নীটশের 'শ্রেষ্ঠমানব' এর চরিত্রে পরিলক্ষিত হয় শক্তি, সাহস ও ইচ্ছাশক্তির অপূর্ব সমন্বয়। সমন্বয়ের এসব প্রেক্ষিত বিবেচনায় দেবের সমন্বয়বাদিতার প্রত্যয়টি এক উঁচুমানের শাশ্বত আদর্শকেই প্রতিকায়িত করে। বিশ্বপ্রেমের শাশ্বত চেতনার কল্যাণকামী আদর্শের বাস্তবায়ন দর্শনের মূলপ্রেরণা। জাগতিক ঐক্যের অস্ফুট অনুভূতির সে চেতনা অভিব্যক্ত হয় অনাবিল প্রেমের অকৃত্রিম ধারায়। প্রকৃতিতে এবং মনোজগতে ঐক্যের ধারণার প্রতি মানুষের যে আসক্তি সেটি হতে পারে বাহ্যিক অথবা আত্মিক উভয়ক্ষেত্রে দেব প্রেমের নীতিকেই সর্বোচ্চে স্থান দিয়েছেন। প্রেমের চিরন্তন নীতির স্থায়ী প্রতিচ্ছবি প্রকৃতিই মানুষের মধ্যে এঁকে দিয়েছে বলে দেব বিশ্বাস করেন। এজন্য তিনি বলেন, "এই শতকের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন তাই বলেছেন প্রকৃতির নিয়মতান্ত্রিকতায় বিশ্বাসই বিজ্ঞানের মূলকথা এবং এটাই তাঁর মতে ধর্মেরও মূল কথা।"[২১] বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষ আজ প্রকৃতির অনেক রহস্য যেমন উদ্‌ঘাটন করেছে তেমনি বিপুল শক্তি করায়ত্ত করে মানুষ শক্তিশালী হয়েছে নানাভাবে। এই একপেশে শক্তি অর্জনই আবার মানুষের জীবনে অস্থিরতা-অনিশ্চয়তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জ্ঞান ও শক্তির এরূপ অনির্ধারিত অপঃপ্রয়োগে মানুষ আধ্যাত্মিক সত্তার চেতনাকে বিসর্জন দিয়েছে। দেবের মতে, যারা মনে করেন, অধ্যাত্মবাদে বৈষয়িক চাহিদা পরিপূরণের কোনো কার্যকরী অবলম্বন নেই তারা বাস্তবিকই ভুল করে থাকেন। কেননা, আদিসত্তা বলে যে পরম চৈতন্যের ব্যাপকতা মানুষ অনুভব করে সেই চৈতন্যই বিশ্বের মূলীভূত সমস্ত শক্তির আকর ও উৎস। সেই কল্যাণরূপী চেতনসত্তা থেকে মানুষ প্রেরণা পায় সার্বিক কল্যাণসাধনের। দেব মনে করেন, আধ্যাত্মিক সত্তার অনুভূতি ব্যক্তির

Dhaka University Institutional Repository

জীবনে বিশ্বাসকে জাগ্রত করবে আর একনিষ্ঠ বিশ্বাসবাদ থেকেই মানবমনে ঐক্যের ধারণা জন্ম নেবে। তিনি মনে করেন, এসবের মাঝেই নিহিত রয়েছে বিশ্বমানবের সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণ। দেব বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ইতিবাচকতাকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করেছেন কিন্তু বিপরীতভাবে বিজ্ঞানের নেতিবাচক প্রভাব তাঁর মনে সভ্যতা-প্রগতি সম্পর্কে আশংকার সৃষ্টি করেছে। দেব তাই অক্ষেপ করে বলেন–

> "কিন্তু আমাদের এমনি কপাল, বিজ্ঞান আমাদের শুধু শিখিয়েছে আমরা একজন আর একজন থেকে আলাদা, একজনের স্বার্থ আর একজনের স্বার্থ থেকে আলাদা। তাই স্বার্থের বিনিময়েই আমাদের সমঝোতা, সকলে আমরা পরের তরে, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে– এই নীতির পেছনে যে আত্মিক যোগ বিজ্ঞান তা আমাদের দেখাতে পারে নি। এজন্যেই এমন অফুরন্ত সুখের সম্ভাবনা মানুষকে দেখিয়েও বিজ্ঞান তার ভবিষ্যৎ নস্যাৎ করে দেবার জোগাড় করেছে। এটা যে মানুষেরই দোষ, বিজ্ঞানের নয়, তা বলাই বাহুল্য। তবে বিজ্ঞানের কল্যাণেই যে এই মারণযজ্ঞের প্রস্তুতি তাও অনস্বীকার্য।"[২২]

বিজ্ঞানের শক্তির উগ্র আবির্ভাবকে কল্যাণধর্মী করে তুলতে প্রয়োজন বিজ্ঞানের জ্ঞানের সাথে প্রেমের সামঞ্জস্যবিধান। দেব বিজ্ঞানের শক্তির সাথে ধর্মীয় নীতির সামঞ্জস্য বিধান করে বিশ্বে মানুষে মানুষে এক মহাঐক্যের সন্ধান করেছেন। প্রকৃত শিক্ষার দ্বারাই মানুষের মধ্যে একত্ববোধের অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে হবে বলে দেব বিশ্বাস করেন। তিনি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করে জীবন উপযোগী, প্রেরণাদায়ী এবং কল্যাণমুখী এক শিক্ষাব্যবস্থার সুপারিশ করেছেন। দেবের নব্য নৈতিকতা তাঁর শিক্ষা-দর্শনেরই সংস্কারিত এক নতুন রূপ। তবে তাঁর শিক্ষাদর্শন প্লেটোর আদর্শরাষ্ট্রে বর্ণিত শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দেবের শিক্ষাব্যবস্থার ধরন জীবনকেন্দ্রিক, জীবনকে প্রগতির পথে ধাবিত করার এক মহান প্রয়াস। আজকের দিনের শিক্ষাব্যবস্থার কথা উঠলেই মনে পড়ে সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধের ভৌগলিক পরিমণ্ডল, অনুপযোগী শিক্ষা পরিবেশ এবং উগ্র কালচারের একতরফা অহমিকায় পরিপূর্ণ এক সামঞ্জস্যহীন ব্যবস্থাপনা। সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় নিজস্ব শিক্ষানীতি তথা সমগ্র বিশ্বকে ভালোভাবে জানতে হলে নিজের কালচারের চর্চা যেমন জরুরি তেমনি ভিনদেশীয় কালচারের প্রতি আগ্রহ এবং অনুশীলনও অতি আবশ্যক। মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো শিক্ষার সবচেয়ে মূল এবং মহৎ উদ্দেশ্য। মধ্যযুগীয় চার্চের ধর্মীয় অনুশাসনে ব্যক্তির

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিত্বের বিকাশের নামে চাপিয়ে দেয়া হতো নিয়ম-শৃঙ্খলার ভারী জগদ্দল পাথর। ফলে, ব্যক্তিত্বের বিকাশ বস্তুগত প্রয়োজনের নিরিখেই নির্ণীত হতো যা ব্যক্তিকে তার পূর্ণসত্তায় বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিলো। মধ্যযুগের অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তি তথা পারিবারিক জীবনকে করে তুলেছিলো বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত। দ্বন্দ্ব-সংঘাত, জটিলতা, ধর্মীয় গোড়ামি, অপসংস্কৃতির আগ্রাসন এসবের প্রভাবে মানুষে মানুষে তৈরি হয় বিভেদ, বৈষম্য। ত্বরান্বিত হয় রক্তাক্ত বিপ্লবের মতো ভয়াবহ পরিস্থিতি। এ প্রসঙ্গে দেব বলেন–

> "ব্যক্তিত্বের বিকাশ বন্ধ করে, জাতীয়তাকে পিষে ফেলে, কালচারের তফাৎ উঠিয়ে দিয়ে সারা দুনিয়ার মানুষকে এক নিশ্বাসে, একরঙা ও একচোখো করার প্রস্তাব আমি করছি না। তবে আমার মনে হয়, মানুষের নিজের ব্যক্তিত্বের, জাতীয় সংস্কৃতির ও বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন যেমন আজকের দিনের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রচুর, ঠিক তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে সব মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার , সব মানুষের জীবনদর্শনের, সব মানুষের কালচারেরও প্রতিফলন তাতে থাকা উচিত।"[২৩]

কারণ, দেব মনে করেন এই বিশ্বসমাজে মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই। সবার স্বার্থ একই নিয়ম নিগড়ের প্রতিফলন। এই একত্ববোধ ব্যক্তির মধ্যে জাগাতে না পারলে অতি অল্প সময়ের আনবিক যুদ্ধে এ বিশ্ব চুরমার হয়ে বিশাল ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবে। সময়ের এ ক্রান্তি লগ্নে শিক্ষার পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যেখানে গোড়ামি, অন্ধতা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত এসবের উর্ধ্বে উঠে দৈন্যতা-ব্যর্থতা-হতাশা থেকে পরিত্রাণের জন্য বৃহত্তর মানবিক জীবনে জ্ঞান ও প্রেমের সমঝোতার প্রচেষ্টা চালানো। বিজ্ঞান প্রভাবিত আজকের শিক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্য হচ্ছে নৈতিক-মানবিক মূল্যবোধ এবং অন্তসারবর্জিত এক অপূর্ণ মানুষ তৈরি করা। বিজ্ঞানের জ্ঞানে ভারী জীবনতরী সুশিক্ষার অভাবে কালের গতির মতোই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। স্বার্থের দ্বন্দ্ব এমন চরমে পৌঁছেছে যে মানবহিতকামী প্রত্যয়গুলো নিছক প্রবাদবাক্য ছাড়া আজ আর কিছু নয়। প্রাচীনকালে এবং মধ্যযুগেরও বেশি সময় ধরে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো তা মূলত ধর্ম এবং বিশ্বাসকেন্দ্রিক। এর অর্ন্তমুখী দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে তুলেছিলো সবদিক থেকেই। ফলে, প্রকৃত শিক্ষালাভের মহান আদর্শ থেকে ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং অপূর্ণ মানুষ হিসেবে মানবসমাজের প্রতি তার উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে আধুনিক বিজ্ঞান প্রভাবিত শিক্ষাব্যবস্থা ব্যক্তির বর্হিদৃষ্টিকে প্রসারিত করে

Dhaka University Institutional Repository

অর্ন্তদৃষ্টির প্রতি বিমুখীনতার ভাব জাগিয়ে তোলে। দেবের মতে, শিক্ষাক্ষেত্রে উভয় দৃষ্টিভঙ্গি একপেশে এবং মানবকল্যাণের পরিপন্থী। দেব উভয় দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়সাধন করে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন এক দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। দেবের প্রবর্তিত শিক্ষানীতি তার নব্য নৈতিকতার ধারণায় নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। শিক্ষানীতির যথাযথ অনুশীলন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে তার সামগ্রিক চরিত্র-মাধুর্যকে ঐক্য এবং সংহতির সর্বোত্তম আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করে নাগরিক হিসেবে সামাজিক দায়িত্ববোধে সমৃদ্ধ করে তুলবে। দেবের শিক্ষাদর্শনেও জীবনদর্শনের প্রভাব রয়েছে প্রচুর। দেব বিশুদ্ধ জীবনদর্শনের অনুসন্ধান প্রসঙ্গে খানিকটা রসাস্বাদ করে বলেন–

> "Perhaps in a synthesis of the dynamism of hell and the pacifism of heaven lies the new philosophy of life that can afford to give us joy of life and sense of security, rid us of soul-killing tensions in human relations and lead us to durable progress. This will, I am sure, give us a new philosophy of education in whose practical application lies in a very sense our future as a new nation and also the future of man at this crisis of history."[২৪]

দেবের স্বর্গ-নরকের প্রতীকী রূপ সম্ভবত মানবসমাজের বিরোধী প্রত্যয় সমূহের প্রতিই ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। সময় প্রবাহের নিরন্তর গতিময়তায় হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধের অনুসন্ধানই হতে পারে দেবের শিক্ষাদর্শনের তথা সব নৈতিকতার মূল উপজীব্য। একুশ শতকের বিচিত্র ঘটনা সমৃদ্ধ বর্তমান সময় আজ গভীর সংকটের আবর্তে নিমজ্জিত। দেবের ঐক্য এবং সংহতি, জ্ঞান এবং প্রেম, শক্তি এবং ভালোবাসার সমন্বয়ের মধ্যেই সম্ভবত লুকায়িত আছে ভবিষ্যৎ মানবের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি। যথার্থ শিক্ষার লক্ষ্য মানুষের মগজের ভেতর হরেক রকম খবরের জগাখিচুড়ি তৈরি করা নয় বরং জীবনকে সার্থক এবং সুন্দর করাই এর আসল উদ্দেশ্য। দেবের শিক্ষাদর্শনে যথার্থ জ্ঞান হচ্ছে সৃষ্টির এক অনবদ্য আশীর্বাদ। আপন স্বার্থসিদ্ধির বশবর্তী হয়ে মানবসম্প্রদায় জ্ঞানের স্বাভাবিক গতিময়তাকে কলুষিত করে নিজেদের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করছে। দেব তাঁর In Search of a New Philosophy of Education শীর্ষক প্রবন্ধে আদমের স্বর্গ চ্যুতির ঘটনায় জ্ঞানের প্রবাদপ্রতীম নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল গ্রহণ করাটাকে অবিমিশ্র আশীর্বাদ হিসেবে সমীচীন মনে করেন না। কেননা, ঐ

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানকে সঠিকভাবে বহুত্বের মান নির্দেশক বলে মনে করা হয়। এরূপ বহুত্বের জ্ঞান জগতের মৌলিক ঐক্যের চেতনা বর্হিভূত যা সাধারণভাবে উৎসাহিত করে প্রথাগত ধর্ম এবং দর্শনকে। তবে জ্ঞানের ক্ষেত্রে সচেতনতার পর্যায়টি মানবসমাজে এভাবেই অন্তর্ভুক্ত হয় বলে দেব মনে করেন। মানবপ্রজাতি নিজ অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে বৈরী পরিস্থিতি মোকাবিলায় ঝুঁকিপূর্ণ এবং সংগ্রামী জীবনকে বরণ করে নেয়। ফলতঃ সফলতার জন্য এমন সংগ্রামই পরিপূর্ণ জীবনবোধের আস্বাদন এনে দেয়। এ প্রসঙ্গে দেব বলেন–

> "This sense of separation, this consciousness of separate individuality does not work in the complex technological set-up of today and in the old idea of the basic unity of man and creation must be sought the escape out of this dilemma. In it lie hidden the outlines of a new philosophy of life and new philosophy of education that follows from it."[২৫]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে দেবের দর্শন প্রভাবিত হয়েছে তাত্ত্বিক প্রায়োগিক দিকের বিভিন্ন পর্যায়-পরম্পরায়। তবে দেবের শিক্ষাদর্শনেই তাঁর নব্য নৈতিকতার প্রভাব প্রতিফলিত হয় সবচেয়ে বেশি পরিমাণে। দেব নৈতিকতায় তাগিদ অনুভব করেছেন এক আদর্শ জীবনবাদী শিক্ষাদর্শনের। যে শিক্ষা সামাজিক সংহতিকে সমুন্নত রেখে ব্যক্তির চরিত-মানসের ইতিবাচক পরিবর্তনে সহায়তা করবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য অপরিহার্যভাবেই অসংখ্য ক্ষুধার্ত উদর সৃষ্টি করার মাধ্যমে বেকারত্বের অভিশপ্ত জীবনকে সানন্দে গ্রহণ করা নয়। বর্তমান সময়ের বিজ্ঞান প্রভাবিত শিক্ষাকে দেব বিশুদ্ধ উপযোগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই বিবেচনা করেন। এ যুগের একজন বিখ্যাত আদর্শবাদী শিক্ষা সম্পর্কিত তাঁর মতামত ব্যক্ত করে বলেন, "অধিক জ্ঞান প্রদান করা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য নয়, যা আমাদের মস্তিষ্কে বিদ্রোহ পরিচালনা করবে। বরং জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার লক্ষ্যে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে সফল জীবন দান করা।"[২৬] এরিষ্টটল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *অধিবিদ্যায়* জ্ঞানের প্রভূত প্রশংসা করেছেন এবং জ্ঞানীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে উপযোগবাদীতার বহু উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। মিশরীয় ধর্মযাজকদের কাছে এরিষ্টটল দর্শনের উৎপত্তিকে আরোপিত করেছেন 'জ্ঞানের স্বার্থে জ্ঞানের' সর্বোচ্চ নমুনা হিসেবে। প্রাচীনকালে খ্রিষ্টধর্ম প্রভাবিত যাজকগণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বলে প্রাপ্ত ব্যাপক

Dhaka University Institutional Repository

অবসর সময়কে উপভোগ করতেন তাত্ত্বিক সমস্যাসমূহের সমাধানকল্পে। দেব অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে লক্ষ্য করেন, আজকের এই যন্ত্রশাসিত পরিবেশে 'জ্ঞানের জন্য জ্ঞান' এই নীতির খুব অল্প আবেদনই পরিলক্ষিত হয়। জ্ঞান আবশ্যিকভাবেই মানুষের শক্তি ও নৈপুণ্য বাড়িয়ে তোলে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সাফল্যের এই অভাবনীয় উন্নতির পরিবেশে জ্ঞানের যথার্থতা অনুধাবণের ব্যর্থতা আমাদের ঐ ধরনের কোনো দক্ষতাই দান করতে পারে না, যা সফলতার সর্বোচ্চ নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে। বরং মানুষকে পরিচালিত করে হতাশার ব্যাপক ধ্বংসস্তূপে। শিক্ষার বিশুদ্ধ উপযোগবাদী ধারণাকে দেব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপরিহার্য ফল বলে মনে করেন। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অব্যাহত অগ্রগতি শুধু দুনিয়ার চেহারাই পাল্টে দেয়নি বরং বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে মানুষের মনোদৈহিক জগতেও। আজকের বিশ্বে শিক্ষাদর্শনের লক্ষ্য হওয়া উচিত কর্মের ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তা এবং গতিশীলতা অর্জনের পাশাপাশি হৃদয়বৃত্তিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উভয় দিকের পরিস্ফুটন ঘটানো। জীবনের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে সমঝোতা আনয়নের ক্ষমতাকে অগ্রাধিকার জ্ঞানে অনুশীলন করা। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে কর্মের উপর গভীর মনোনিবেশকে দেব জড়বাদীয় শক্তির মুখপাত্র বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বৈধ অনুসিদ্ধান্ত বলেও মনে করেন। দেব মনে করেন, মানুষ তার সহজাত আবেগিক ক্রিয়াকে বর্জন করে গতিশীল বিশ্বের অন্তঃসারশুন্য বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের প্রতি অধিক মাত্রায় আগ্রহী হয়ে উঠেছে। ফলে, মানুষ আত্মিক দিক থেকে অসহায়ত্বকে আলিঙ্গন করছে নিজের অজান্তেই। মানব অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে যে যান্ত্রিক-জাগতিক বহুমুখীনতা রয়েছে সে দিকটিকে দেব এড়িয়ে যাননি। বরং বৈচিত্র্যের বহুমুখী বিকাশ ধারায় সত্তার একত্বের সন্ধান করার মাঝেই শিক্ষার এবং নৈতিকতার সুমহান আদর্শ প্রোথিত রয়েছে বলে দেব মনে করেন। জড়বাদ উদ্ভুত বিজ্ঞান-প্রযুক্তির মহাসমারোহে হৃদয়ানুভূতি উৎসারিত আধ্যাত্মিক প্রেমের সফল সমন্বয়সাধনই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুখী-সমৃদ্ধশালী এক বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের প্রেরণা যোগাবে। এরূপ আকাঙ্ক্ষাই দেবকে তাঁর দর্শনালোচনায় অব্যাহতভাবে প্রেরণা যুগিয়ে গেছে। মহাকালের অনন্ত এ যাত্রাপথে শিক্ষার রূপ পরিবর্তিত হতে হতে মানবসমাজ বিজ্ঞান প্রভাবিত শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরেছে অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে। আজকের বিজ্ঞান প্রভাবিত শিক্ষাদর্শনের মূললক্ষ্য হচ্ছে সফলভাবে বেঁচে থাকার কৌশল আয়ত্ত করা যাতে বৌদ্ধিক এবং আত্মিক কোনো যোগসূত্র নেই। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি প্রভাবিত শিক্ষাব্যবস্থা আজকের সভ্যসমাজে এতটাই তার শেকড় বিস্তৃত করেছে যে মানুষ ভীত এই ভেবে, দর্শনচর্চা পাছে না

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিকে অপার্থিব জগতের প্রতি পরিচালিত করে। আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ তথা শিক্ষানীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রতি এতটাই উৎসর্গীকৃত যে শিক্ষা প্রসঙ্গ থেকে দর্শন শিক্ষাকে ঝেড়ে ফেলে দিতেও দ্বিধাবোধ করেন না। দেব শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এরূপ অযাচিত গুরুত্ব আরোপের বিষয়টিকে মানব সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রচলিত মানসিক চাপ বলে অভিহিত করেন। এ প্রসঙ্গে দেব বলেন–

> "My personal reaction to such an undue emphasis on science and technology in our philosophy of education apart, it has considerably been responsible for prevailing tension in human relations. Such extremism is indeed considerably responsible for the plight of modern man perpetually in search of security and peace."[২৭]

সভ্যসমাজের তথাকথিত আলোকিত বিশ্বে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির এরূপ মাত্রাতিরিক্ত অগ্রযাত্রা সাধারণ দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের চিরন্তন নিশ্চয়তা ও শান্তিলাভের পথে ব্যাপক অন্তরায় সৃষ্টি করবে বলে দেব মনে করেন। বিজ্ঞান প্রভাবিত কর্মময়জীবনের অসফল গতিশীলতা, এই অযোগ্য অগ্রগণ্যতা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে, ব্যক্তিসত্তার উন্মেষ-বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় এবং মানবমনে বিচ্ছিন্নতাবোধ জন্মলাভ করে। বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিক নর-নারীকে যথাযথভাবে প্রশিক্ষিতকরণের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে তুলে জীবনের সফলতার দ্বার-প্রান্তে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। কিন্তু কার্যকরভাবেই এমন শিক্ষা তাদের মধ্যে ভালোবাসা এবং সমঝোতা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। বৈজ্ঞানিক বিষয়াসক্তি এ যুগের মানুষের মধ্যে চরম উন্মত্ততার ভাব সৃষ্টি করে মানুষকে এক ধরনের প্রতীকী ভাষার প্রতি উৎসাহিত করে। যে ভাষা তাদেরকে হৃদয়ের ভাষা থেকে বঞ্চিত করে। দেব আধুনিক বিজ্ঞানবাদী চিন্তা-চেতনার দ্বারা উজ্জীবিত নারী-পুরুষকে 'ব্যাবেল অব টাওয়ারের' নিশ্চিন্ত বাসিন্দা বলে উল্লেখ করেন। তবে ঐ সব মানব-মানবী নিজেদের জন্য এরূপ বৃহৎ অবকাঠামো তৈরি করতে ব্যর্থ হয় কেননা তারা পরস্পরের হৃদয়ের ভাষা বুঝতে পারে না। দেব শিক্ষাক্ষেত্রে ভিন্ন সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত শিক্ষাব্যবস্থাকে নিরুৎসাহিত করেননি বরং এর ভ্রান্ত প্রয়োগ যেন বর্ধিষ্ণু সভ্যতার ক্ষেত্রে কোনো নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সেজন্য উদ্বিগ্ন

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন। কেননা, আধুনিক সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে ভালো-মন্দের রহস্যাবৃত এক মহাসমন্বয় অথবা অন্যভাবে বিশৃঙ্খল এবং উদ্বিগ্নতার জটিল জগদ্দল পাথরের উপর। সমসাময়িক যুগে ব্যক্তিক সফলতা এবং যান্ত্রিক সংঘাতের সামনে অপেক্ষমাণ এক ভয়ানক সংকট।

মানুষের অধিকারে বিজ্ঞান যে প্রবল ক্ষমতাকে আজ হাজির করেছে তার বহুবিধ অপব্যবহার মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যু পথেরই নির্দেশনা প্রদান করছে। এ রকম পরিস্থিতি দেবের 'আগামী দিনের শিক্ষাদর্শনে' বর্ণিত লাজারাসের কাহিনীকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। পৌরাণিক যুগের লাজারাস এবার স্বগৃহে না ফিরে যদি স্বদেশে সত্যিই ফিরে আসেন তাহলে তিনি (লাজারাস) আত্মপ্রসাদ লাভের বদলে মোহময় ইন্দ্রজালে পড়ে আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আজকের সময়ের দাবি, এরূপ ইন্দ্রজালিক পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটিয়ে মানবকল্যাণ নিশ্চিত করা। সে লক্ষ্যেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং বিভাজনের ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করে সমন্বয়ের অনুভূতিকে যত্নসহকারে লালন ও ধারণ করতে হবে। তবেই মুক্তিকামী জনতা মুক্তির আস্বাদ-গ্রহণ করে সোনালি ভবিষ্যৎ রচনা করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ, দুর্দশাগ্রস্ত সাধারণ মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও স্বাধীনতার ধারণাকে সুরক্ষিত করার প্রেক্ষাপটে রচিত হয় শিক্ষাদর্শনের মতো মহতী প্রয়াস। দেব বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থায় মনে করেন, তাঁর শিক্ষাদর্শনে, "ঐক্যের অনুভূতি বিচ্ছিন্নতাবোধের অনুভূতির উপর জয়লাভ করবে, বিভাজিত ইচ্ছার উপর সার্বিক মানব ইচ্ছা পরিপূরণের এবং ক্ষমতার উপর ভালোবাসা জয়লাভ করবে।"[২৮] বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে উইলিয়াম জেমস 'কর্মক্ষমতার' প্রত্যয়ের ভিত্তিতে ধর্ম এবং বিজ্ঞানের মধ্যে একটা সেতুবন্ধন খুঁজে পান। ধর্মকে জেমস বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মতোই মূল্যবান মনে করেন, যতক্ষণ তা মানবজীবনে সক্রিয় থাকে এবং যতক্ষণ তা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে মানুষকে একটা ফলপ্রসূ পরিণতির দিকে ধাবিত করে। এ প্রসঙ্গে প্রয়োগবাদী দার্শনিক জেমস বলেন, "মানুষ তার অমূল্য ইচ্ছাশক্তির সার্থক প্রয়োগ করে সামাজিক ও নৈতিক অন্তরায়ের মূল উৎপাটন করে এক সুস্থ ও সমঝোতাপূর্ণ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে পারে।"[২৯] এদিক থেকে দেবের প্রয়োগধর্মী তথা কল্যাণধর্মী দর্শনের সাথে জেমসের প্রয়োগবাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও দেব নিজেই খানিকটা আপত্তি উত্থাপন করেন এবং মনে করেন, জেমস আধুনিক বিজ্ঞানের গতিশীলতার দর্শন দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। একইসাথে দ্বৈততা এবং পার্থক্যের নীতিতে 'কর্মক্ষমতার' মূলসূত্র খুঁজে

Dhaka University Institutional Repository

পেতে চেয়েছিলেন। দেব আশা প্রকাশ করেন, দ্বৈততার এবং পার্থক্যের নীতির পুরনো অনুর্বর ভূমিতে সমন্বয়ের বীজ বপন করতে হবে। যাতে করে শান্তি এবং প্রীতিপূর্ণ বন্ধুত্বের বিশাল মহীরূহ অচিরেই জন্মলাভ করতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এটাই প্রমানিত হয় যে, দেব তার দর্শনে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক তথা শিক্ষানীতির আলোচনার আলোকেই সমাজভাবনার ভিতকে সমৃদ্ধ করেছেন। সমাজ বিচ্ছিন্ন কোনো সত্তা বা ধারণা নয়। মানবসমাজের ক্রমোৎকর্ষতার ইতিহাস হাজার বছরের ইতিহাস। সুতরাং কালের বিবর্তনে সমাজ সুসংগঠিত হয় আবার অনির্ধারিত দুর্বিপাকে সামাজিক অবকাঠামো থেকে শুরু করে মূল্যবোধ-মূল্যমানগুলো হারিয়ে যেতে থাকে। তবুও মানুষের সাথে সমাজের সম্পর্ক তার আত্মার সম্পর্কের মতোই একান্ত ব্যক্তিগত। দেব এই সমাজেরই একজন মানুষ। তাঁর চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, ইচ্ছা-অভিলাষ সবকিছুই সমাজস্থিত মানুষকে ঘিরেই। এজন্যই তাঁর দর্শনালোচনার পর্যায়-পরম্পরায় পরিলক্ষিত হয়েছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, নৈতিক এবং শিক্ষা ভাবনার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি। দেব সমাজ বলতে বিচ্ছিন্ন কোনো মানবসমাজকে না বুঝে বিশ্বসমাজের মৌলিক অর্ন্তনিহিত নীতির প্রতি সমর্থন যুগিয়ে গেছেন। সমাজে বিকাশ ঘটে বিভিন্ন নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর। এদের মন-মনন,আচার-আচরণ, জীবনাচরণে বিভিন্নতা এবং বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। এসব বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নতার অবসান ঘটিয়ে সমাজের অস্থিতিশীল পরিস্থিতিকে সৌহার্দ-সম্প্রীতির বন্ধনে উদ্বুদ্ধকরণ তথা বিশ্বসমাজকে প্রগতিপন্থী করে তোলার প্রত্যয়ই দেবের সমাজভাবনার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। একদেশদর্শী বিমূর্ত কোনো বিষয়ের আলোচনা দেবের অধিবিদ্যা এবং জ্ঞানবিদ্যা বিষয়ক আলোচনায় পরিলক্ষিত হয় নি। বরং সমাজস্থ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সাথে একাকার হয়ে জীবনঘনিষ্ঠ এবং জীবনবাদী এক সমাজজীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর দর্শনে। জীবনের জটিল এবং মৌল সমস্যাদি আলোচনা-পর্যালোচনার পাশাপাশি এসবের সমাধানপূর্বক মূল্যায়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে সুরক্ষিত করে জীবনকে কিভাবে সার্থক ও সুন্দর করে গড়ে তোলা যায় সে প্রয়াসই লক্ষ্য করা গেছে দেবের সমগ্র কর্ম এবং জীবনাচরণে। জীবনকে সর্বতোভাবে মহিমান্বিত করে তোলার প্রতিজ্ঞাই ছিলো তার আজীবন দার্শনিক প্রেরণার উৎস। এভাবেই তার দর্শন হয়ে উঠে সার্থক এক জীবনদর্শন। দেবের সমাজদর্শনের ভিত্তিভূমি

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে রূপায়িত হয়েছে একক বিশ্বচৈতন্যের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং গভীর অনুভূতি। এক্ষেত্রে একত্বনীতি ও ঐক্যের চেতনা তাঁর দর্শনকে সমৃদ্ধ এবং অলংকৃত করেছে। একত্বনীতির অবিনাশী সে চেতনাই শাশ্বত সত্তা রূপে জগতের ভেতরে ও বাইরে মানবসত্তার মুক্তির দিশারী হিসেবে অবিরামভাবে নিজেকে প্রকাশ করে চলেছে। দেব মনে করেন, মানুষের স্থায়ী শান্তি ও প্রগতিকে সুরক্ষিত করতে হলে "কোনো ধরনের কুসংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন না হয়ে সাধারণ লোকের সাধারণ কল্যাণে উৎসাহি সংযত নারী-পুরুষের একটি নিরাপদ ভিত্তির উপর বিশ্ববোধ সৃষ্টির জন্য কঠোর পরিশ্রম করা উচিত।"[৩০] দেবের বস্তুনীতি এবং আধ্যাত্মনীতির যৌক্তিক ভিত্তিটি সমগ্র মানবসমাজের ঐক্য-সম্প্রীতি-অগ্রগতি-প্রগতির ধারাকে সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত করার লক্ষ্যেই রচিত।

চলমান বিশ্বব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে দেবের আগ্রহ, ইচ্ছা এবং অনুভূতি মিশ্রিত সমাজদর্শনের যে রূপরেখা চিত্রিত করা হয়েছে তাতে করে সার্বিক সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে তিনি এক সফল রূপকার এবং ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হিসেবেই মানবসমাজে পরিচিতি লাভ করেছেন। দেব সে সময়কার উত্তেজনাপূর্ণ এবং বিধ্বংসী পরিবেশ পরিস্থিতি অবলোকন করেও চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি ছিলেন আশাবাদী। তিনি মনে করেন, বিজ্ঞান আবিষ্কৃত সাম্প্রতিক সময়ের কিছু মারণাস্ত্রের ভয়াবহতা অনিবার্যভাবেই মানুষের ধ্বংসের পথকে প্রশস্ত করে তোলে। এবং ফলে, মানবজীবন পরিপূর্ণরূপে উপভোগ্য এবং সন্তোষজনক হয়ে উঠে না। তবে, ঐক্য এবং সমষ্টিগত চেতনার দ্বারা উজ্জীবিত সমন্বিত প্রয়াসের মধ্যেই উত্তরণের সফল সম্ভাবনা নিহিত বলে দেব বিশ্বাস করেন। এ প্রসঙ্গে দেব রচিত Better World Promised through Work of UN শীর্ষক শিরোনামে জাতিসংঘের প্রতি তাঁর দৃঢ় আস্থা ব্যক্ত করতে দেখা যায়। তিনি মনে করেন, জাতীয় স্বার্থ সব দেশের সব রাষ্ট্রের জন্যই সমান গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় স্বার্থকে আজ আর সার্জনের ছোরা দিয়ে কেটে বিভক্তির ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ করা যাবে না। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সৌহার্দ এবং ভ্রাতৃপ্রতীম মনোভাবের বিকাশ ঘটিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে পাশাপাশি এগিয়ে নিয়ে যাবার মধ্যেই জাতিসংঘের গুরুত্ব নিহিত। তবে মানবকল্যাণের হাতিয়ার বলে চিহ্নিত 'মানবতাবাদের' প্রত্যয়টিকে আরো শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে হবে। সার্বিক মানবতাবাদ সব ধর্মের, সব মতের, সব পথের। মানবতার কল্যাণমূলক দিকটিকে সর্বান্তকরণে হৃদয়ের গভীর এবং স্থায়ী আবেগ দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে হবে। একথা আজ আর অস্বীকার করা যাবে না যে, বিজ্ঞান

Dhaka University Institutional Repository

সারা বিশ্বকে বাহ্যিকভাবে এক করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর সীমারেখা অতিক্রম করে পৃথিবীর বাইরেও বিভিন্ন গ্রহে তার পদচারণা সম্প্রসারিত করেছে অত্যন্ত সফলভাবেই। এই অব্যাহত সফলতাকে বাস্তবায়ন করার জন্য অবশ্যই আজ হৃদয়ভিত্তিক ঐক্যের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। যা সমন্বিত সুখের সাধারণ গন্তব্যে পৌঁছার দিগন্তকে প্রসারিত করবে। জীবন ও জগতের স্থায়ীকল্যাণের স্বার্থে দেবের দর্শনের কাঙ্ক্ষিত মিলন ও সমন্বয় ঘটানো জরুরি। এ প্রসঙ্গে দেব বলেন, "মানবতার কল্যাণকামী প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তিরই আজ ক্ষুদ্র ভেদবুদ্ধি ও রেষারেষি বিস্মৃত হয়ে অবিলম্বে একটি বিশ্বরাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠার মহৎ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা উচিত।"[৩১] দেবের সামগ্রিক রচনার প্রেক্ষাপট যুগান্তকারী এবং তাৎপর্যপূর্ণ। বক্তব্যের অস্পষ্টতা বা অসংলগ্নতা নেই কোথাও । এ পৃথিবীর মানুষের প্রতি তার হৃদয় উৎসারিত দায়বদ্ধতা থেকেই আপনমনে এসব সাধারণ মানুষদের কল্যাণে তার দর্শনালোচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। শ্রেণী-বৈষম্যহীন 'একজগৎ' গড়ে তোলার মহতী উদ্যোগ তার দর্শনকে অলংকৃত করেছে। মানবমুক্তির একনিষ্ঠ সাধক হিসেবে সাধারণ মানুষের মুক্তি এবং কল্যাণ কামনাতেই দেব তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি, শ্রেণীদ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস, আত্মকলহ, সংঘাত-সংঘর্ষময় পরিস্থিতিকে তিনি মোকাবিলা করতে চেয়েছেন উদার, নৈতিক, সহনশীল এবং প্রেমের চিরন্তনী শক্তির সহযোগিতায়। তিনি মনে করেন এভাবেই গড়ে উঠতে পারে বিশ্বজনীন দার্শনিক ও মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন এক আদর্শ বিশ্ব। দেবের এ প্রত্যাশা কোনো স্বপ্ন বা কল্পনাবিলাস নয়। সত্যিকার অর্থেই মানবীয় এবং হৃদয়নিঃসৃত আবেগের চরম বহিঃপ্রকাশ। তিনি মহাঐক্য এবং সম্প্রীতির বাণীকে ধারণ করেছিলেন মানবকল্যাণের মূলমন্ত্র হিসেবে। প্রথাসিদ্ধ শৃঙ্খলার সীমা অতিক্রম করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবজাতির জন্য নিশ্চিত-নিরাপদ এবং কল্যাণমূলক এক বিশ্বরাষ্ট্রেরই প্রত্যাশা ঘোষিত হয়েছে দেবের লেখনীতে। দেবের 'নব্য নৈতিকতা' তথা সমগ্র দর্শনালোচনার সফল বাস্তবায়ন আজ সময়ের দাবি। এ দাবি প্রতিটি মানুষের প্রাণের চাহিদা। তবে, এর বাস্তবায়নের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির ভার দেব তাঁর ভাবী উত্তরসূরীদের উপরই ন্যস্ত করেছেন। তবে মুক্তিকামী সাধারণ মানুষের কাছে দেব দর্শনের আবেদন থাকবে চিরকাল।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূচি

১. হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত, *আমার জীবন-দর্শন, গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলী*, (তৃতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ২১

২. পূর্বোক্ত, পৃ. উনত্রিশ

৩. ড. প্রদীপ রায় সম্পাদিত ও সংগৃহীত, "*গোবিন্দচন্দ্র দেব, অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা*", বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৯

৪. Hasan Azizul Huq (ed), *Works of Govinda Chandra Dev,* Vol.1, Bangla Academy, Dacca, 1980, p. 2

৫. মোহাম্মদ নূরনবী অনুবাদিত, মূলঃ ড. জি.সি. দেব, *সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা*, গ্রীন বুক হাউস লিঃ, ১৯৮৩, পৃ. ১১৫

৬. পূর্বোক্ত, ১১৬

৭. Hasan Azizul Huq (ed), *Works of Govinda Chandra Dev,* Vol.1, Bangla Academy, Dacca, 1980, p. 515-516

৮. ড. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস সম্পাদিত "*জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ গোবিন্দচন্দ্র দেবঃ জীবন ও দর্শন*", অবসর প্রকাশনা, জুলাই ২০০৮, পৃ.১৪৭

৯. পূর্বোক্ত, ১৪৬-১৪৭

১০. ড. প্রদীপ রায় সম্পাদিত ও সংগৃহীত, "*গোবিন্দচন্দ্র দেব, অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা*", বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ২৫

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০

১২. মোহাম্মদ নূরনবী অনুবাদিত, মূলঃ ড. জি.সি. দেব, *সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা*, গ্রীন বুক হাউস লিঃ, ১৯৮৩, পৃ. ৫০

১৩. আমিনুল ইসলাম, *গোবিন্দচন্দ্র দেবঃ জীবন ও দর্শন*, সূচীপত্র প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৫২

১৪. ড. আমিনুল ইসলাম, *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন*, মাওলা ব্রাদার্স, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯

১৫. হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত, *আমার জীবন-দর্শন, গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলী*, (তৃতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ৯

১৬. মোহাম্মদ নূরনবী অনুবাদিত, মূলঃ ড. জি.সি. দেব, *সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা*, গ্রীন বুক হাউস লিঃ, ১৯৮৩, পৃ. ১১৮

১৭. কাজী নূরুল ইসলাম ও প্রদীপ কুমার রায় সম্পাদিত, "*দেব স্মারক বক্তৃতামালা, ১৯৮১-১৯৯৯*",গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জুলাই ২০০১, পৃ. ২৫৮

১৮. ড. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস সম্পাদিত "*জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ গোবিন্দচন্দ্র দেবঃ জীবন ও দর্শন*", অবসর প্রকাশনা, জুলাই ২০০৮, পৃ. ১৫২

১৯. মোহাম্মদ নূরনবী অনুবাদিত, মূলঃ ড. জি.সি. দেব, *সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা*, গ্রীন বুক হাউস লিঃ, ১৯৮৩, পৃ. ১২০-১২২

Dhaka University Institutional Repository

২০. ড. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস সম্পাদিত *"জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি: গোবিন্দচন্দ্র দেব: জীবন ও দর্শন"*, অবসর প্রকাশনা, জুলাই ২০০৮, পৃ. ১৫৫

২১. ড. প্রদীপ রায় সম্পাদিত ও সংগৃহীত, *"গোবিন্দচন্দ্র দেব, অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা"* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১১

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪-৮৫

২৩. হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত, *আমার জীবন-দর্শন, গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলী*, (তৃতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ.৭২

২৪. ড. প্রদীপ রায় সম্পাদিত ও সংগৃহীত, *"গোবিন্দচন্দ্র দেব, অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা"*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ২৯৫

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৫

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৫

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৬

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৭

২৯. Bertrand Russell, *"Logical Atomism"* in J.H. Muirhead, Contemporary British Philosohpy (First series). London, George Allen and Unwin, 1924. p. 380

৩০. মোহাম্মদ নূরনবী অনুবাদিত, মূলঃ ড. জি.সি. দেব, *সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা*, গ্রীন বুক হাউস লিঃ, ১৯৮৩, পৃ. ১৩০

৩১. Hasan Azizul Huq (ed), *Works of Govinda Chandra Dev,* Vol.1, Bangla Academy, Dacca, 1980, p. 540

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতীয় উপমহাদেশে যেসব চিন্তানায়ক জন্মেছিলেন গোবিন্দ দেব তাদেরই একজন। সে সময় শিক্ষা-দীক্ষা, দর্শনচর্চার জগতে এক প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়। পৃথিবী দেখতে পায় তার নতুন উন্মেষ, নতুন জাগরণ। প্রচলিত সমস্ত শাস্ত্রীয় ও কুসংস্কারকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বস্তুধর্মী তথা নৈতিকতার সাহায্যে ঘটনাবলীর বিচার-বিশ্লেষণ এবং নতুন আঙ্গিক-অবয়বে ধারণ গ্রহণের যে প্রগতিশীল ও অগ্রসরধর্মী মানসিকতা পরিলক্ষিত হয় তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় গোবিন্দ দেবের রচনায়, চিন্তায় ও কর্মে। মূলত কোনো দার্শনিক, কোনো সাহিত্যিক কোনো চিন্তানায়ককে তাঁর বিশেষ সময়ের নিরিখেই বিচার করা বাঞ্ছনীয়। আলোচ্য এ অভিসন্দর্ভে দেব দর্শনের যে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

প্রথম অধ্যায়ে গোবিন্দ দেবের জীবন ও কর্ম আলোচনায় তাঁর পারিবারিক, শিক্ষা, কর্মজীবন, কর্মক্ষেত্র আলোচনার মাধ্যমে দেবের যশ-খ্যাতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেবের দার্শনিক পটভূমিতে ধর্ম, বিজ্ঞান এবং দর্শন কীভাবে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে আলোচিত-সমালোচিত এবং সর্বশেষে দেবের নিজস্ব মতামতের মাধ্যমে এ ধারাকে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। ধর্মের ক্ষেত্রে দেব দেখিয়েছেন হৃদয়বৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ত আহ্বানের মধ্য দিয়ে যে ধর্মভাব মানবমনে জাগ্রত হয় সেই ধর্মরূপী আলোকবর্তিকাই মানুষের বাস্তব প্রয়োজন মিটিয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তুলে 'একজগৎ' গড়ার প্রেরণা যোগায়। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, দেবের সর্বজনীন ধর্মীয় চেতনা প্রভাবান্বিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ এবং গৌতম বুদ্ধের সাম্য-মৈত্রীর চিরন্তন বাণী দ্বারা। সামগ্রিক শাশ্বত চেতনাই দেবের মতে জগৎ সৃষ্টির মূল কারণ, নৈতিকতার চরম ও পরম আদর্শ এবং তা আধ্যাত্মশক্তিরও মূল কেন্দ্রবিন্দু। ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় মানবমনের সহজাত আবেগিক দিকটির প্রতিও তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় শ্রদ্ধাশীল। এ ধরনের ধর্মীয় অভিজ্ঞতা পরিণতিতে সার্বিক সত্তায় পরিব্যাপ্ত হয় বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন। ধর্মের অর্ন্তনিহিত প্রেমানুভূতি থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সকল মানুষ এক পরম প্রেমময় পরিপূর্ণ সত্তার মূর্ত প্রকাশিত রূপ।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম-বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস দেব দর্শনের মৌলিক ও অর্ন্তহিনিত একটি দিক। সমন্বয়ের ঐক্যের ভিত্তিতে দেব বিজ্ঞান, শিক্ষা, দর্শন, ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর প্রতি আলোচনায় মনোযোগী হয়েছেন এবং এসব বিষয়কে মানবকল্যাণে অন্ত র্ভুক্তিকরণেরও সুপারিশ পরিলক্ষিত হয় তাঁর দর্শনালোচনায়। বিজ্ঞানকে তিনি মানবসভ্যতার আর্শীবাদ বলে চিহ্নিত করেন এবং বলেন, বিজ্ঞানের দেয়া জ্ঞান এবং ধর্মে উৎসারিত প্রেম উভয়ের সমঝোতার মাধ্যমেই কর্মমুখর শুভ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ নতুন সভ্যতা বিকাশ লাভ করবে। এ প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, ''সুতরাং, দর্শন ও বিজ্ঞানের মিলন মানুষের ব্যাপক ও স্থায়ী কল্যাণের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন।''[১]

তবে দেব আশংকা প্রকাশ করেছেন এই ভেবে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের এরূপ বলগাহীন অগ্রগতি, সংযমহীনতার অশুভ মানসিকতা মানুষকে না আবার ধ্বংসের ক্রমবর্ধমান স্তুপে নিক্ষিপ্ত করে।

আলোচ্য এ অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে 'দেবের দার্শনিক তত্ত্ব' শিরোনামে অধিবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা এবং দেবের শিক্ষাদর্শন আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, দর্শন চর্চার প্রাথমিক পর্যায়ে দেব তত্ত্বের উপরই সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ অধ্যায়ে তিনি প্রজ্ঞা, স্বজ্ঞা এবং সত্তার ধারণাকেই আলোকিত করে গেছেন। তবে, লক্ষণীয় বিষয় হলো তিনি স্বজ্ঞাকেই সত্তা লাভের একমাত্র উপায় বলে চিহ্নিত করেছেন। যদিও ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির গুরুত্ব-কে তিনি কখনোই ছোট করে দেখেন নি। ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির সহযোগে যুক্তিউর্ধ্ব স্বজ্ঞায় সত্তার ধারণার যে উত্তরণ ঘটে এ পর্যায়টিকে দেব জ্ঞেয়তার দিকে ক্রমবর্ধমান সফল অগ্রযাত্রা বলে মনে করেন। সত্তার ধারণা গঠনে ইন্দ্রিয়, প্রজ্ঞা এবং স্বজ্ঞার সম্মিলিত ক্রিয়াশীলতা অপরিহার্য। এক্ষেত্রে একত্ব জ্ঞানের প্রতীতি আবশ্যক এবং সঙ্গতকারণেই অপরিহার্য। আধ্যাত্মিক সত্তার প্রীতিপূর্ণ একত্বজ্ঞানই সত্তার নিরঙ্কুশ ধারণা গঠনে সহায়তা করে থাকে। এ প্রসঙ্গে দেব হেগেলের চিন্তনক্রিয়ার একমাত্রিকতাকে দুর্বলবোধের বহিঃপ্রকাশ জ্ঞানে পরিহার করেন। তিনি মনে করেন, নির্ভুল তত্ত্ববিদ্যা গঠনে ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিসঞ্জাত জ্ঞানই শুদ্ধসত্তার রহস্য উদ্‌ঘাটনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

Dhaka University Institutional Repository

দেবের জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা সমৃদ্ধিলাভ করেছে চিরায়ত ভাববাদী দর্শনকেই কেন্দ্র করে। ধ্বংসপ্রায় চিরন্তন ভাববাদকে নতুন মাত্রা প্রদান করে এ বিষয়ের আলোচনাকে তিনি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। এক্ষেত্রেও সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়, দেব ভাববাদের চিরাচরিত বিরোধাত্মক মনোভাবের বিপরীতে সমন্বয়ের দিগন্তকে প্রসারিত করেছেন। ভাববাদকে তিনি অর্থনৈতিক মুক্তির শক্তিশালী হাতিয়াররূপে চিত্রিত করে মানবমুক্তির অন্যতম উপায় বলে অভিমত প্রকাশ করেন। অধিবিদ্যা এবং জ্ঞানবিদ্যা পর্যায়ের আলোচনায় দেব ভঙ্গুর, অস্থিতিশীল দর্শনকে পুনরায় জাগ্রত এবং স্থিতিশীলকরণের চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছেন বলেই মনে হয়। বস্তুত তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, যাপিত জীবনে তত্ত্বের ক্রিয়াশীলতা যতো না কার্যকর তার চেয়ে বেশি ফলপ্রসূ এর প্রয়োগধর্মী এবং প্রয়োজনধর্মী কর্মবিন্যাসে। আর তাই আমরা দেখতে পাই, দেব এ প্রয়োজনের তাগিদেই ভাববাদী আসনে উপবিষ্ট থেকেই সাধারণ মানুষের অতি নিকটে চলে এসেছিলেন। দেবের *Aspirations of the Common Man* গ্রন্থটি এসবেরই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদান করে। নিপীড়িত, শোষিত-বঞ্চিত, অবহেলিত মানবসম্প্রদায়ই ছিলো তার কল্যাণধর্মী ধ্যান- ধারণার দ্যুতিময় দিশারী।

দেবের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যখন তিনি দেখতে পান ভাববাদের প্রচারকগণ ভাববাদকে পারলৌকিকতার আঙ্গিকে গড়ে তোলে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে সহজ-সরল সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে চলেছে। এ প্রেক্ষিতেই তিনি সমন্বয়ী ভাববাদের অবতারণা করেন এবং তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, একমাত্র সমন্বয়ী ভাববাদই শুদ্ধসত্তা ও বাস্তব জগতের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করতে সমর্থ। দেবের সমন্বয়ী ধারার মৌলিকত্ব ও বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় আলোচ্য অভিসন্দর্ভে সন্নিবেশিত চতুর্থ অধ্যায়ের নব্য-নৈতিকতা শিরোনামে। নব্য-নৈতিকতার আলোচনা এই অভিসন্দর্ভের মূল আলোচ্য বিষয় হিসেবে এর তাৎপর্য এবং গুরুত্ব অধিক। বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার অস্থির-অনির্ধারিত পরিবেশের প্রেক্ষিতে দেব নব্য-নৈতিকতাকে চিত্রায়িত করছেন স্থির, নিরপেক্ষ, মৌলিক ধর্মীয় অনুভূতি উপলব্ধিতে ভরপুর বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সফল সদ্ব্যবহার সম্বলিত মানবিক চরিত্র মাধুর্যে উৎকর্ষিত নতুন এক সামগ্রিক বৈশ্বিক আবহ। তিনি মনে করেন, সভ্যতার অগ্রগতি এবং প্রগতিকে সংরক্ষিত এবং সুরক্ষিত করতে হলে অনুরূপ জীবনব্যবস্থাই এক আদর্শ জীবনব্যবস্থা। চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত দেবের শিক্ষাদর্শনের আলোচনার সাথে নব্য-নৈতিকতার যথেষ্ট সাদৃশ্য

Dhaka University Institutional Repository

পরিলক্ষিত হয়। এবং দেব মনে করেন, আদর্শ সমাজগঠনে তার শিক্ষাদর্শনের চর্চা এবং অনুশীলন অত্যন্ত ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখবে। দেবের দর্শনে নিরঙ্কুশ কোনো ধর্মাবলম্বী অথবা সমাজব্যবস্থার প্রেরণা নেই। তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে এ বিশ্বের সকল মানুষের জন্য কল্যাণময় এবং মঙ্গলময় এক বিশ্বব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সমন্বয়ের চিরন্তন আদর্শকে ধারণ করে তিনি নব্য-নৈতিকতার আলোচনায় প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন। দেবের নব্য নৈতিকতা পূর্ণতা পেয়েছে সমন্বয়ের শুদ্ধতায় এবং জ্ঞানের পবিত্রতায়। বিভক্তির অন্তর্জালে তিনি কখনো জড়িয়ে পড়েন নি। ক্ষুদ্র-স্বার্থ, দ্বন্দ্ব, অহংকার উচ্চাভিলাষের অতিরঞ্জনকে তিনি ঘৃনা করতেন, সমাজের অত্যুচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত থেকেও দেব ছিলেন দেবতুল্য এক 'স্বর্গীয় ব্যক্তিত্ব'। অবাধ বিচরণ ছিল সর্বমহলে। আর এ সুবাদেই সমাজের শ্রেণীগত, গোষ্ঠীগত বিভক্তিকে অত্যন্ত কাছে থেকে উপলব্ধি করার সুযোগ ঘটেছে তাঁর। এজন্য ব্যক্তিজীবন এবং সমাজজীবনে মানুষের প্রয়োজনের মাত্রাকে ভিন্ন আঙ্গিক থেকে বিচার না করে গণমানুষের প্রয়োজনের সাধারণ দিকটিকেই অতি আগ্রহের সাথে চর্চা করেছেন তিনি। এ কারণেই দেবের দর্শন হয়ে উঠেছিলো বাস্তবিকই এক জীবনদর্শন। তাঁর কাছে দর্শন ছাড়া জীবন এবং জীবন ছাড়া দর্শন উভয়ই অর্থহীন, শুন্যগর্ভ। বাল্য-কৈশোরের দুই বিপরীতমুখী অভিজ্ঞতা দেবকে পরিপূর্ণ জীবনবোধের উপলব্ধি এনে দিয়েছিলো। এজন্য জড়বাদকে যেমন তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেন নি তেমনি মিশনারীদের প্রভাবে যে ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত হয়েছিলো এ দিকটিকেও ঝেড়ে ফেলে দিতে সমর্থ হন নি। তবে, তাত্ত্বিক-প্রায়োগিক দিকের সফল সমন্বয় সাধনের উপরই তাঁর পুরোদর্শনের ভিত গড়ে উঠেছে, তাত্ত্বিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতেই প্রয়োগের বাতাবরণে কল্যাণধর্মী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাধারণ মানুষের কল্যাণে আজীবন নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন।

মানবিক-আদর্শিক উভয়গুণেরই অপূর্ব সমাহার লক্ষ্য করা যায় তাঁর সমগ্র জীবনসাধনায় এবং জীরনাচরণে। জীবনবোধের গভীরতায় একক তত্ত্বের অনুভব যেমন তার ব্যক্তিজীবনে প্রতিফলিত হয়েছে ঠিক তেমনভাবেই এর প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছেন বিশ্ববৈচিত্র্যের মাঝে সমগ্র মানবকুলের। দেব মনে করেন, ঐক্যের ধারণাই মানুষকে সমস্ত সংকীর্ণতা, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার মুক্ত করে, ধর্মীয় মৌলিক নীতিগুলির আন্তরিক অনুশীলনই এ বিশ্বে সাম্য-মৈত্রী তথা বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত করে মানুষকে নির্ভেজাল মুক্তির আস্বাদন এনে দেবে। ধর্মকে সংস্কারপন্থী করে তুলে দেব বিজ্ঞান প্রভাবিত

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার সাথে অভিযোজনে সক্ষম করে তুলতে আগ্রহী। তিনি মনে করেন, বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিক ঐক্যের সংযোগসাধনেই এই মাটির পৃথিবী পূর্ণাবয়বে বিকশিত হবে। যে ধ্যান-ধারণা, অনড়-অচল মূল্যবোধ মানবসমাজকে স্থবিরতার অন্ধ কুঠুরির দিকে নিয়ে যায় তা প্রগতির অন্তরায়। এমন অবস্থার উত্তরণ ঘটানোই দেবের নব্য-নৈতিকতার লক্ষ্য-আদর্শ। সত্যের এবং মানবতার একনিষ্ঠ সাধক দেব সত্যকে সত্যের মতো করেই উচ্চারণ করেছেন। মানুষের চেয়ে বড়ো সত্য, আর কিছুই ছিলো না তাঁর কাছে। মানবতাই ছিলো তার জীবনাদর্শের অন্যতম অলংকার। আলোচ্য অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে 'দেবের দর্শনে নব্য-নৈতিকতার প্রভাব' শিরোনামে দেবের নব্য-নৈতিকতার উন্মেষ এবং বিকাশ কীভাবে কোথায় ঘটেছে সে বিষয়ে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দেবের পুরো দর্শনালোচনাতেই রয়েছে তার নব্য-নৈতিকতার প্রভাব। এর বিস্তারে এবং বিন্যাসে রয়েছে শিক্ষাদর্শনেরই মূলতত্ত্ব। সময় এবং সৃষ্টির বিকাশমান ধারায় দেবের দর্শন স্থানিক-কালিক গণ্ডি অতিক্রম করে এক মহাসত্যের পথকে উন্মোচন করে। এক্ষত্রেও দেবের হাতিয়ার হলো ঐশী প্রেম এবং জ্ঞানের মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের প্রচেষ্টা। প্রেম মানুষকে শুধু ভালোবাসা নয়, এ প্রেমের অবগাহন হবে উচুঁ-নিচু, ধনী-গরিব, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, পাপী-তাপী, সর্বোপরি উদার মানবতাবাদী আদর্শে। আদর্শ এবং প্রেমের দিক থেকে এ বিশ্বের সব মানুষ একই ঐশীগুণের অধিকারী। তবে মনুষ্যত্ব অর্জন করাই হলো দেবের শিক্ষা তথা নৈতিক তত্ত্বের অর্ন্তনিহিত বিষয়। হৃদয়ানুভূতি উৎসারিত প্রেমের সাধনা যেমন মনুষ্যত্ব অর্জনে সহায়ক তেমনি যথার্থ জ্ঞানের চর্চাও মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষরূপে আত্মবিকাশে সহায়তা করে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জয়সূচক ধারাকে মানবকল্যাণে কাজে লাগাতে হলে প্রয়োজন জ্ঞান এবং প্রেমের সমন্বয় সাধন। বিজ্ঞানের দেয়া কর্মচাঞ্চল্য, কর্মমূখরতা এবং বিষয়নিষ্ঠতার দান অকার্যকর হয়ে পড়বে যদি শুদ্ধ মানুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষের বিকাশ না ঘটে। জীবন্ত মানুষই যথার্থ শিক্ষালাভের মাধ্যমে চিত্তের শুদ্ধতা অর্জন করে মানবীয় গুণাবলীসমৃদ্ধ স্বর্গীয় মানুষরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। দেব মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার চ্যালেঞ্জগুলিকে যথাসম্ভব গুরুত্ব এবং তাৎপর্যের সঙ্গে তাঁর চিন্তা-চেতনায় অর্ন্তভুক্ত করেছেন।

বৈষ্ণব কবি চন্ডীদাসের কবিতা এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য:

'শুনহ মানুষ ভাই

Dhaka University Institutional Repository

সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই' ।

সবশেষে একথা বলা যায় যে, জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত নানান সমস্যার আর্বতে পড়ে উদ্ভব হয় নতুন নতুন দর্শন তথা দার্শনিক গোষ্ঠীর। বিংশ শতাব্দীর দর্শনে মানব অস্তিত্ব রক্ষা এবং কল্যাণধর্মী প্রেক্ষাপটে দেব দর্শনের গুরুত্বকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখার উপায় নেই। দেবের চিন্তা-চেতনা তথা দার্শনিক ভাবনা বর্তমান সময়ের অস্থির পৃথিবীতে নিঃসন্দেহে আলোর পথ দেখাবে। উপকৃত হবে বিশ্বমানবতা। যদিও দেবের লালিত স্বপ্ন এবং বর্তমান সময়ের বিজ্ঞান-প্রভাবিত সভ্যসমাজের প্রেক্ষাপটের চিত্র এক নয়। তদুপরি দেব বিশ্বাস করেন, রক্তে-মাংসে গড়া প্রতিটি মানব অস্তিত্বই নিজেকে নিয়ন্ত্রণের সামর্থ্য রাখে। যেহেতু মানবহৃদয় সদা-জাগ্রত, সদাচেতন; সেহেতু মানুষ বর্হিজগতের বিভিন্ন স্বার্থ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ এবং পঙ্কিলতার ক্রমাগত অনুশীলনের ফলে শুদ্ধ হৃদয়ের সে চেতনাকে স্তিমিত করে ফেলে। কৃত্রিমতার আচ্ছাদনে মেঘের আড়ালে সূর্যের লুকোচুরির মতোই সে সত্তা ঢাকা পড়ে যায়। ফলে সে চেতনা প্রাণবন্ত হয়ে কল্যাণধর্মী কর্মে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো তাগিদ অনুভব করে না। দেব অত্যন্ত সন্তর্পণে মানব হৃদয়ের সে চেতনাশক্তিকে নাড়া দিয়েছেন। এবং এর সাথে সমন্বয় করেছেন জ্ঞানের পবিত্র আলোকে। দেবের দৃঢ় বিশ্বাস এভাবেই গড়ে উঠবে স্বর্গীয় গুণাবলী সমৃদ্ধ এক আলোকিত মানুষ। জাগ্রত চেতনার স্পর্শমণির প্রভাবে দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ুক এ বিশ্বের সকল হৃদয়ে, সকল প্রাণে। পুণ্যে-মঙ্গলে-আনন্দে ভরে উঠুক এ নিখিল ভুবন। দেবের এহেন প্রত্যাশার বাস্তবায়ন নিঃসন্দেহে এ পৃথিবী আনন্দময় হয়ে উঠবে। কল্যাণকামী মানবহৃদয়ে এ বারতা ধ্বনিত হবে যুগ যুগ ধরে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূচি

১. হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত, *আমার জীবন-দর্শন, গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলী*, (তৃতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ১১৫

২. রায় দীনেশ চন্দ্র সেন বাহাদুর, *পদাবলী-মাধুর্য্য*, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা. ১৯৩৭, পৃ. ১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক উৎস

ক. গ্রন্থ

১. G.C. Dev, *Idealism and Progress*, Calcutta, 1952.

২. G.C. Dev, *Idealism : A New Defence and a New Application*, Dacca, 1958

৩. G.C. Dev, *Aspirations of the Common Man*, Dacca, 1963

৪. G.C. Dev, *The philosophy of Vivekananda and the Future of Man*, Dacca, 1963

৫. G.C. Dev, *Buddha: The Humanist*, Dacca, 1969.

৬. G.C. Dev, *Parables of the East*, Dacca, 1984 (Posthumous Publication, Edited by Aminul Islam).

৭. G.C. Dev, *My American Experience*, Dacca, 1963 (Posthumous Publication, Edited by Aminul Islam)

৮. গোবিন্দচন্দ্র দেব, *তত্ত্ববিদ্যা সার*, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৬৬

৯. গোবিন্দচন্দ্র দেব, *আমার জীবন দর্শন*, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৩৬৭

১০. Hasan Azizul Huq (edited), *Works of Govinda Chandra Dev*, vol.1. Dacca,1978.

১১. Hasan Azizul Huq (edited), *Works of Govinda Chandra Dev*, vol.2. Dacca,1980.

১২. হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত, *গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলী* (তৃতীয় খণ্ড), ঢাকা, ১৯৭৯

১৩. ড. প্রদীপ রায় সম্পাদিত ও সংগৃহীত, *"গোবিন্দ চন্দ্র দেব, অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা"*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

খ. প্রবন্ধঃ ইংরেজি

1. G.C. Dev, "Neo-Vedantism of Ramakrsna and Vivekananda and Its Historical Background", ড. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস সম্পাদিত, *"জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ গোবিন্দচন্দ্র দেবঃ জীবন ও দর্শন"*, অবসর প্রকাশনা, জুলাই ২০০৮

2. G.C. Dev, "Ethics: Ancient and Modern", ড. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস সম্পাদিত *"জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ গোবিন্দচন্দ্র দেবঃ জীবন ও দর্শন"*, অবসর প্রকাশনা, জুলাই ২০০৮

3. G.C. Dev, "Psychology and Ethics", ড. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস সম্পাদিত *"জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ গোবিন্দচন্দ্র দেবঃ জীবন ও দর্শন"*, অবসর প্রকাশনা, জুলাই ২০০৮

4. G.C. Dev, "The Teaching of Philosophy in Our Universities", ড. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস সম্পাদিত *"জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলিঃ গোবিন্দচন্দ্র দেবঃ জীবন ও দর্শন"*, অবসর প্রকাশনা, জুলাই ২০০৮

5. G.C. Dev, "Consciousness of Identity in Collective Life", *Prabuddha Bharata*, Calcutta, vol. 48. December 1943

6. G.C. Dev, "A Glimpse of the Philosophy of the Future", The *Pakistan Observer*, May 20&27, 1965

7. G.C. Dev, "Buddha from Our Perspective", The *Pakistan Observer*, July 15, 1956

8. G.C. Dev, "Religion without Theological affiliation", *World Buddhism, Sri Lanka*, vol. 5. No. 3, October 1956

9. G.C. Dev, "Synthetic Idealism and the Future of Man", *Prabuddha Bharata*, Calcutta, vol. LX1. No. 10. October 1956

10. G.C. Dev, "Knowledge of Other Minds", *The Proceedings of Pakistan Philosophical Congress*, sixth session, Lahore, 1959.

11. G.C. Dev, "Basic Human Values", *The Proceedings of Pakistan Philosophical Congress*, Seventh session, Dacca, 1960

12. G.C. Dev, "New Morality", *The Pakistan Observer*, October 27, 1960

Dhaka University Institutional Repository

13. G.C. Dev, "Religion of the Future", *The Pakistan Observer*, March 23, 1961

14. G.C. Dev, "The Philosophy of the Common Man", *The proceedings of Pakistan Philosophical Congress*, Eighth session, Karachi, 1961

15. G.C. Dev, "Humanism and Rationalism", *The Pakistan Observer*, August 14, 1962

16. G.C. Dev, "ABC of a New Philosophy", *The Dacca University Studies*, vol, X1, part-1, June 1963

17. G.C. Dev, "The Philosophy We Need", *The Pakistan Observer*, August 14, 1963.

18. G.C. Dev, "Outbursts of a Humanist", *The Pakistan Observer*, October 27, 1964

19. G.C. Dev, "My Philosophical Synthesis": Factors that Moulded it, *The World of Philosophy*, Edited by C.A. Quadir, Sharif Presentation Volume Committee, Lahore, Pakistan, 1965.

20. G.C. Dev, "Role of Language in Religion", *The Pakistan Observer*, February 21, 1965

21. G.C. Dev, "ON My Philosophy of Life", Record, *A Weekly Journal*. Dacca, 209th Issue, August 14, 1965.

22. G.C. Dev, "Science and Religion", *The Pakistan Observer*, January 22, 1966.

23. G.C. Dev, "Better World Promised Through Work of UN", *The Evening News*, Wilkes-Barre, U.S.A. October 25, 1966.

24. G.C. Dev, "Koran Puts Emphasis on Secular Learning", *The Sunday Times*, U.S.A, February 19, 1967.

25. G.C. Dev, "Half of the Chicken : A Parable of Unity", *The Pakistan Observer*, March 23, 1968

Dhaka University Institutional Repository

26. G.C. Dev, Philosophy and the Future of Man", *The Dacca University Studies*, Vol. XVI, part A, June 1968

27. G.C. Dev, "New Morality", Hasan Azizul Huq (ed), *Works of Govinda Chandra Dev,* Chapter Four, vol-1. Bangla Academy, Dacca, May 1980

28. G.C. Dev, "In Search of a New Philosophy of Education", ড. প্রদীপ রায় সম্পাদিত ও সংগৃহীত, "*গোবিন্দ চন্দ্র দেব, অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা*", বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০২,

Dhaka University Institutional Repository

গ. প্রবন্ধ : বাংলা

১. গোবিন্দচন্দ্র দেব, "দর্শন ও একজগৎ", *শতদল*, ঢাকা হল বার্ষিকী, সপ্তবিংশতিতম বর্ষ, ১৩৬১

২. গোবিন্দচন্দ্র দেব, "সভ্যতার ভাঙন", *বাসন্তিকা*; জগন্নাথ হল বার্ষিকী, ১৩৬৬

৩. গোবিন্দচন্দ্র দেব, "যীশুখৃষ্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণ", *উদ্বোধন*, ১১শ সংখ্যা, কলিকাতা, ১৩৩৩

৪. গোবিন্দচন্দ্র দেব, "আলু দর্শনের ভূত ও ভবিষ্যৎ", *বাসন্তিকা*, জগন্নাথ হল বার্ষিকী, ১৩৬৬

৫. গোবিন্দচন্দ্র দেব, "বিপর্যস্ত বুদ্ধি", *উত্তরণ*, দ্বিতীয় বর্ষ, শেষ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৬৭

৬. গোবিন্দচন্দ্র দেব, "বিশ্বসভ্যতায় মুসলিম দার্শনিকদের দান", *ইসলামী একাডেমী পত্রিকা*, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৬১

৭. গোবিন্দচন্দ্র দেব, "মুসলিম দার্শনিকদের স্বকীয়তা", *ইসলামী একাডেমী পত্রিকা*, ১ম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৬১ ।

৮. গোবিন্দচন্দ্র দেব, "রবীন্দ্র-দর্শনের গোড়ার কথা", *ঢাকা হল বার্ষিকী*, ৩৯শ বর্ষ, ১৯৬১-৬২ ।

৯. গোবিন্দচন্দ্র দেব, "সমবায়-দর্শন", সমবায়, চতুর্থ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, *জাতীয় সমবায় দিবস সংখ্যা*, ১৯৬৩

১০. গোবিন্দচন্দ্র দেব, "সমবায়ের সার্থকতা", সমবায়, পঞ্চম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, *জাতীয় সমবায় দিবস সংখ্যা*, ১৯৬৪

১১. গোবিন্দচন্দ্র দেব, "সমন্বয় দর্শন ও মানুষের ভবিষ্যৎ", *মাহে নাও*, মার্চ ১৯৬৫

১২. গোবিন্দচন্দ্র দেব, "সাম্প্রতিক দৃষ্টিতে মুতাযিলা দর্শন", *মাহে নাও*, মার্চ ১৯৬৬

১৩. গোবিন্দচন্দ্র দেব, "বার্দ্ধক্যের আশাবাদ", *বাসন্তিকা*, জগন্নাথ হল বার্ষিকী, ১৩৭৪

১৪. গোবিন্দচন্দ্র দেব, "অজাতশত্রু অধ্যাপক", *শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ* (মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ সম্পাদিত), মার্চ ১৯৬৭

১৫. গোবিন্দচন্দ্র দেব, "আগামী দিনের শিক্ষা দর্শন", *জগন্নাথ হল বার্ষিকী*, ১৩৫৭, বাংলা ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বৈতয়িক উৎস :

ঘ. গ্রন্থ : বাংলা

১. অর্জুন বিকাশ চৌধুরী, *ভারতীয় দর্শন*, কলকাতা, ২০০২-২০০৩

২. আমিনুল ইসলাম, *ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম দর্শন*, উত্তরণ প্রকাশ, ঢাকা, জুন ২০০৪

৩. আমিনুল ইসলাম, *গোবিন্দচন্দ্র দেব: জীবন ও দর্শন*, সূচীপত্র প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮

৪. আমিনুল ইসলাম, *দার্শনিক সমস্যা ও সমকাল*, ঢাকা, জুন ২০০৪

৫. আমিনুল ইসলাম, *নীতিবিজ্ঞান ও মানবজীবন*, ঢাকা, মওলা ব্রাদার্স, ২০০২

৬. আমিনুল ইসলাম, *প্রাচীন ও মধ্যযুগের দর্শন*, ঢাকা, ২০০২

৭. এ.এস.এম আবদুল খালেক, *প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৩

৮. এম. আবদুল হামিদ, *সমকালীন নীতিবিদ্যার রূপরেখা*, ঢাকা, এপ্রিল ২০০

৯. এম. মতিউর রহমান, *ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি*, ঢাকা, আগষ্ট ২০০৮

১০. কল্যাণচন্দ্রগুপ্ত ও অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, *ধর্মদর্শন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্বদ, জুলাই ১৯৯০/ই

১১. কাজী নূরুল ইসলাম ও প্রদীপ রায় (সম্পাদিত), *দেব স্মারক বক্তৃতামালা* : ১৯৮১-১৯৯৯, ঢাকা, ২০০০

১২. জগদীশ্বর সন্যাল, *ভারতীয় দর্শন*, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, মার্চ ২০০০

১৩. প্রদীপ কুমার রায় (সম্পাদিত), *গোবিন্দ চন্দ্র দেব: জীবন ও দর্শন*, মির্নাভা প্রেস, ঢাকা, ১৯৯১

১৪. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস (সম্পাদিত), *জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি: গোবিন্দচন্দ্র দেব : জীবন ও দর্শন*, ঢাকা, ২০০৮

১৫. প্রদীপ রায় অনুবাদিত, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, *পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, ঢাকা, এপ্রিল ২০০০

১৬. মুহম্মদ আবদুল বারী, *মুসলিম দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃতি*, ঢাকা, জুন ২০০১

১৭. মুহাম্মদ আবদুল হাই ঢালী, *নীতিবিদ্যা, আদর্শনিষ্ঠ ও পরানীতিবিদ্যা*, ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৭

Dhaka University Institutional Repository

১৮. মোঃ আবদুল হামিদ ও ড. মুহম্মদ আবদুল হাই ঢালী, *মুসলিম দর্শন পরিচিতি*, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০২।

১৯. মোঃ বদিউর রহমান, *মুসলিম দর্শনের ইতিহাস*, ঢাকা, জুলাই ২০০৫

২০. মোঃ মাহবুবুর রহমান, *ভারতীয় দর্শন পরিচিতি*, ঢাকা, ১৪১৭

২১. মোহাম্মদ নূরনবী অনুবাদিত, মূলঃ ড. জি.সি.দেব, *সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা*, গ্রীন বুক হাউস লিঃ, ১৯৮৩

২২. রমেন্দ্রনাথ ঘোষ, *ভারতীয় দর্শন*, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২০০৪

২৩. রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, বগুড়া, মে ২০০৪

২৪. রাশিদা আখতার খানম, *নীতিবিদ্যা: তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, ২০০২

২৫. সর্বোপল্লী রাধাকৃষ্ণন সম্পাদিত, *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৬৫

২৬. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *উপনিষদ (১ম ভাগ)*, কলকাতা-৯ জুন, ২০০০

২৭. হুমায়ুন কবীর (সম্পাদিত), *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস*, কলিকাতা, ১৯৫৯

২৮. হাসনা বেগম ও কাজী নূরুল ইসলাম (সম্পাদিত), *তোমার মৃত্যু নেই: শহীদদের স্মরণে*, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৭২

২৯. হাসান আজিজুল হক (সম্পাদিত), *সক্রেটিস*, ঢাকা, এপ্রিল ২০০২

৩০. হোসনে আরা আলম অনুবাদিত, *ভাববাদ ও প্রগতি*, মূলঃ ড. জি.সি.দেব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮

গ্রন্থ : ইংরেজি

১. Bertrand Russell, *The Conquest of Happiness*, London. 1976

২. Bertrand Russell, *History of Western Philosophy*, George Allen and Unwin Ltd, London, 1942.

৩. Brightman, A Philosophy of Religion, Printice Hall, New York, 1954.

৪. H.D. Bhattacharyya, *The Foundation of Living Faiths*, Calcutta University, Calcutta, 1938

Dhaka University Institutional Repository

৫. Paul Edwards, *Encyclopedia of Philosophy,* Macmillan Publishing Co. New York, 1972

৬. Pringle Pattison, *The Idea of God in the Light of Recent Philosophy*, Oxford University Press, New York

৭. Syed Ali Ashraf, *Muslim Education Quarterly*, Volume, 21, 2004

৮. Saidur Rahman, *An Introduction to Islamic Culture and Philosophy*, Dhaka, 1951

প্রবন্ধ : ইংরেজী :

1. Abdul Jalil Mia, "Dev's View on Religion and Morality", *Philosophy and Progress*, 1984

2. Dev's Defence of Idealism: Some Interpretative and Critical Comments, *Philosophy and Progress*, 1990.

3. Dewan Md. Azraf, "The Philosophy of Dr. G.C. Dev" *Philosophy and Progress*, Inaugural volume, 1981

4. G.C. Dev, "Better World Promised through Work on UN", ড. প্রদীপ রায় সংগৃহীত ও সম্পাদিত, *গোবিন্দচন্দ্র দেব, অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০০২

5. G.C. Dev, "In Search of a New Philosophy of Education", ড. প্রদীপ রায় সংগৃহীত ও সম্পাদিত, *গোবিন্দচন্দ্র দেব, অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০০২

6. G.C. Dev, "On My Philosophy of Life", ড. প্রদীপ রায় সংগৃহীত ও সম্পাদিত, *গোবিন্দচন্দ্র দেব, অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০০২

7. G.C. Dev, "Role of Language in Religion", ড. প্রদীপ রায় সংগৃহীত ও সম্পাদিত, *গোবিন্দচন্দ্র দেব, অগ্রন্থিত প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ২০০২

8. Hasna Begum, "Dev's New Morality and Progress", *Philosophy and Progress*, Inaugural volume, 1981

Dhaka University Institutional Repository

9. Latifa Begum, "DR. G.C. Dev: The Humanist", *Philosophy and Progress*, 1984

10. Md. Tahasuddin, "An Analysis of Dev's Humanism", *Philosophy and Progress*, 1988

11. Sayed Quamruddin Hossain, "Dev : A Lover of Philosophy" *Bangladesh Observer*, 1973

প্রবন্ধ : বাংলা

১. অজয় রায়, "ডক্টর দেব-যেমনটি দেখেছি", হাসনা বেগম ও কাজী নূরুল ইসলাম (সম্পাদিত), *তোমার মৃত্যু নেই: শহীদদের স্মরণে*, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৭২

২. অরবিন্দ বসু, "গোবিন্দ দেবের জীবনদর্শন", কাজী নূরুল ইসলাম ও প্রদীপ কুমার রায় (সম্পাদিত), *দেব স্মারক বর্ক্তৃতামালা* ১৯৮১-১৯৯৯ গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

৩. আখতার ইমাম, "ড. গোবিন্দচন্দ্র দেবের জীবন দর্শন", *দর্শন ও প্রগতি*, ২য়-৩য় সংখ্যা, ১৯৮৫

৪. আনিসুজ্জামান, "গোবিন্দ দেবের সংস্কৃতি ভাবনা", *দর্শন ও প্রগতি*, ৬ষ্ঠ বর্ষ: ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৮৯

৫. আনিসুজ্জামান, "গোবিন্দ দেবের রাষ্ট্রচিন্তা", ড. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস (সম্পাদিত), *জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি: গোবিন্দচন্দ্র দেব: জীবন ও দর্শন*, অবসর, ঢাকা, ২০০৯

৬. আবদুল জলিল মিয়া, "ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব: জীবন, কর্ম ও চিন্তাধারা", *দর্শন ও প্রগতি*, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৮৭

৭. আবদুল জলিল মিয়া, গোবিন্দদেবের ধর্ম ও নৈতিকদর্শন, ড. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস (সম্পাদিত), *জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি: গোবিন্দচন্দ্র দেব: জীবন ও দর্শন*, অবসর, ঢাকা, ২০০৯

৮. আবদুল জলিল মিয়া, "জি.সি.দেব স্মরণে", *দর্শন*, ১ম বর্ষ: ১ম সংখ্যা, ১৯৭৩।

৯. আবদুল জলিল মিয়া (সম্পাদিত), "ড. জি.সি. দেবের একাদশ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী", *দেব সেন্টার ফর ফিলসফিক্যাল স্টাডিজ*, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৭২

Dhaka University Institutional Repository

১০. আবদুল জলিল মিয়া, "রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দ: ধর্মমত এবং দর্শন", *দর্শন ও প্রগতি*, ১৪শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, ১৯৯৭

১১. আবদুল মতীন, "ড. গোবিন্দচন্দ্র দেবের জীবন দর্শন", *উচ্চারণ*, শরীফ হারুন সম্পাদিত, ৫ম সংকলন, ঢাকা, ১৯৭৯

১২. আবদুল মতীন, "ড. দেবকে যেমন দেখেছি", *বাসন্তিকা*, হীরকজয়ন্তী সংখ্যা, ১৯২১-৮১, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮০

১৩. আবদুল মতীন, "লেখক প্রসঙ্গে", *গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলী*, হাসান আজিজুল হক (সম্পাদিত), ঢাকা, ১৩৮৬

১৪. আবদুল মতীন, "ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব স্মরণে", হাসনা বেগম ও কাজী নূরুল ইসলাম (সম্পাদিত), *তোমার মৃত্যু নেই: শহীদদের স্মরণে*, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৭২

১৫. আবদুল মতীন,"দর্শন ও জীবন দর্শন", ড. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস (সম্পাদিত), *জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি: গোবিন্দচন্দ্র দেব: জীবন ও দর্শন*, অবসর, ঢাকা, ২০০৯

১৬. আমিনুল ইসলাম, "গোবিন্দদেবের জীবন দর্শন", *দর্শন প্রগতি*, ১৪শ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, ১৯৯৬

১৭. আমিনুল ইসলাম, 'গোবিন্দদেবের জীবন দর্শন ও সমকালীন মানুষ', *দেব স্মারক বক্তৃতা*, দেব সেন্টার ফর ফিলসফিক্যাল স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৮

১৮. আলাউদ্দিন আল-আজাদ, "মানবতার রূপ-কল্পনা", জ্যৈষ্ঠ-১৩৫৪, ২৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

১৯. আহমদ শরীফ, "মানবতা ও গণমুক্তি", কাজী নূরুল ইসলাম ও প্রদীপ কুমার রায় সম্পাদিত; *দেব স্মারক বক্তৃতামালা*, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়, ঢাকা

২০. আয়েশা সুলতানা, "দেব ও রাসেলের দর্শনের কয়েকটি দিক", *দর্শন ও প্রগতি*, ১ম সংখ্যা, ১৯৮৪

২১. ইজাজ হোসেন, "সংগীত সরোবরে বিভাসিত পদ্ম", *ভারত বিচিত্রা*, বর্ষ বত্রিশ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, মে ২০০৫

২২. কল্যাণনাথ দত্ত, "রবীন্দ্রনাটকে মানবতা", *ভারতবর্ষ*, ৪৩শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৩৬২-৬৩

Dhaka University Institutional Repository

২৩. কাজী নূরুল ইসলাম, "ডক্টর জি সি দেব এবং আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি", *প্রাণপ্রবাহ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই *এসোসিয়েশন*, ৪ জুলাই, ২০০৮ ।

২৪. গোলাম সরোয়ার সম্পাদিত, *সমকাল পত্রিকা*, "পরমাণু নিয়ে পাগলামি", নরম্যান সলোমন, ইনস্টিটিউট অব পাবলিক অ্যাকুরেসির প্রেসিডেন্ট এবং রুট্স অ্যাকশনের ফেলো গোয়ার্নিকা থেকে ভাষান্তর বিভূতিভূষণ মিত্র, ১৭ মার্চ, ২০১১

২৫. জ্যোতি প্রকাশ দত্ত, 'আমার অভিভাবক [পিতা]", রশীদ হায়দার সম্পাদিত, *স্মৃতি; ১৯৭১*, বাংলা একাডেমী, ১ম খণ্ড, ২য় মুদ্রণ, ১৯৯০

২৬. দেওয়ান মো: আজরফ, "দেবের তাত্ত্বিক মতবাদ". ড. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস (সম্পাদিত), *জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি; গোবিন্দচন্দ্র দেব: জীবন ও দর্শন*, অবসর, ঢাকা, ২০০৯

২৭. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, "ভারতে মানবতাবাদ উৎপত্তি ও বিকাশ", *ভারত বিচিত্রা*, অষ্টম বর্ষ,দশম সংখ্যা, ১৯৮০-৮১

২৮. পূরবী বসু,"তোমার প্রসন্ন হাসি পড়ুক আসি আমার জীবন পরে", *নামে কী আসে যায়*, *ঘাস ফুল নদী প্রকাশনা*, ঢাকা, ১৯৯৩ ।

২৯. প্রদীপ রায়, "গোবিন্দচন্দ্র দেব, জীবন ও কর্ম", ড. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস সম্পাদিত, *জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি*, অবসর, ঢাকা, ২০০৮

৩০. প্রদীপ রায়, "গোবিন্দদেবের দৃষ্টিতে দূর্গাপূজা", *অঞ্জলি*, শারদীয় স্মরণিকা, মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি, ১৯৯৭ ।

৩১. প্রদীপ কুমার রায়, "গোবিন্দ দেবের বাংলা প্রবন্ধ: একটি মূল্যায়ন", *দর্শন ও প্রগতি*, ১৪শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, ১৯৯৭

৩২. প্রদীপ রায়,"গোবিন্দ দেব: প্রাচ্যের সক্রেটিস," *বাসন্তিকা*, জগন্নাথ হল বার্ষিকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০০

৩৩. প্রদীপ রায়, "বাঙ্গালী দার্শনিকদের [গোবিন্দ দেবের] দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ" *উদ্দীপন*, স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে অংশগ্রহণের শতবর্ষপূর্তি স্মারকগ্রন্থ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা, ১৯৯৫

৩৪. "মহাজীবন, স্বামী বিবেকানন্দ: ভারতের মানবতাবাদী দার্শনিক ও অধ্যাত্মিক নেতা", *ভারত বিচিত্রা*, বর্ষ তেত্রিশ, পৌষ-মাঘ, ১৪১২, জানুয়ারী ২০০৬

৩৫. "মানবতাবাদী দার্শনিক গোবিন্দচন্দ্র দেব", *সংবাদ*, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস সংখ্যা, ১৯৯০

Dhaka University Institutional Repository

৩৬. মালবিকা বিশ্বাস, "গোবিন্দ দেবের দৃষ্টিতে গৌতমবুদ্ধ ও তাঁর দর্শন", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, সংখ্যা ৮৮, জুন ২০০৭

৩৭. মালবিকা বিশ্বাস,"গোবিন্দচন্দ্র দেবের সংস্কৃত চর্চ্চা ও তার প্রাসঙ্গিকতা," *দর্শন ও প্রগতি পত্রিকা*, ২৪শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা; জুন-ডিসেম্বর, ২০০৭

৩৮. মোঃ আবদুল হামিদ, "গোবিন্দ দেব স্মরণে", *মনন*, ১ম বর্ষ: ১ম সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৭২

৩৯. মো: তাহাসউদ্দিন, "গোবিন্দদেবের মানবতাবাদী দর্শন", ড. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস (সম্পাদিত), *জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি: গোবিন্দচন্দ্র দেব: জীবন ও দর্শন*, অবসর, ঢাকা, ২০০৯

৪০. মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, "গোবিন্দচন্দ্র দেবের *দর্শন*",*দর্শন ও প্রগতি*, ৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৭

৪১. যতীন সরকার, বিজ্ঞানমনস্ক মোজাফফর হোসেন, *দৈনিক প্রথম আলো*, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা, ১০ জানুয়ারী, ২০১১

৪২. রুমা রায়, "গোবিন্দ দেবের দর্শনে মানবতাবাদ", *দর্শন ও প্রগতি*, ১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০

৪৩. রোকেয়া সুলতানা,"পরিচয়" থেকে "পরিচয়" ড. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস (সম্পাদিত), *জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি: গোবিন্দচন্দ্র দেব: জীবন ও দর্শন*, অবসর, ঢাকা, ২০০৯

৪৪. রংগলাল সেন, "জগন্নাথ হলের ইতিহাস ও প্রয়াত প্রাধ্যক্ষ প্রসঙ্গ",*বাসন্তিকা*, হীরকজয়ন্তী সংখ্যা, ১৯২১-৮১, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮০

৪৫. রংগলাল সেন, "একটি অবিনশ্বর আত্মা", হাসনা বেগম ও কাজী নূরুল ইসলাম (সম্পাদিত), *তোমার মৃত্যু নেই: শহীদদর স্মরণে*, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৭২

৪৬. রমা প্রসাদ চন্দ, "গৌড়ার কথা" ও "শেষের কবিতা", *সচিত্র মাসিক বসুমতী*, ১১শ বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৩৯

৪৭. শরীফ হারুন,"ড. দেবের নব্য নৈতিকতা এবং প্রাসঙ্গিক চিন্তন", Proceedings of the Second General Conference, Bangladesh Darshan Samiti, Rajshahi, 1975.

Dhaka University Institutional Repository

৪৮. সরদার ফজলুল করিম, "গোবিন্দচন্দ্র দেবের জীবন-দর্শন", কাজী নূরুল ইসলাম ও প্রদীপ রায় সম্পাদিত, *দেব স্মারক বর্ত্তৃতামালা*: ১৯৮১-১৯৯৯, গোবিন্দদেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

৪৯. সালমা ইসলাম সম্পাদিত, *দৈনিক যুগান্তর*, "জ্ঞান মানুষকে বিনয় দান করে", আবদুর রাজ্জাক চিশ্‌তী নিজামী, ঢাকা, ২৫ মার্চ, ২০১১

৫০. সালাহউদ্দীন আহমদ, "আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমন্বয়ধর্মী ও মানবতাবাদী ধারা", *দেব স্মারক বর্ত্তৃতা*, দেব সেন্টার ফর ফিলসফিক্যাল স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৮

৫১. সৈয়দ কমরুদ্দীন হোসেইন, "ডক্টর দেবের জীবন জিজ্ঞাসা", হাসনা বেগম ও কাজী নূরুল ইসলাম (সম্পাদিত), *তোমার মৃত্যু নেই: শহীদদের স্মরণে*, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৭২

৫২. হাসনা বেগম, "গোবিন্দদেবের নব্য নৈতিকতা ও প্রগতি", ড. প্রদীপ রায় ও মালবিকা বিশ্বাস (সম্পাদিত), *জন্মশতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি: গোবিন্দচন্দ্র দেব: জীবন ও দর্শন*, অবসর, ঢাকা, ২০০৯

৫৩. হাসনা বেগম, "গোবিন্দচন্দ্র দেবের শিক্ষাভাবনা", *শিক্ষাবার্তা*,[৬] জুন-২০১১, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪১৮

৫৪. হায়াৎ মামুদ, "ব্যক্তিগত স্যার", *অবহেলিত ধ্রুবপদ ও কিন্নর দল*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১

৫৫. হোসনে আরা আলম,"গোবিন্দচন্দ্র দেবের সমন্বয়ী দর্শন", *দর্শন ও প্রগতি*, ৫ম বর্ষ: ৫ম সংখ্যা, ১৯৮৮

৫৬. হোসেনুর রহমান, "গান্ধী জিজ্ঞাসা", *ভারত বিচিত্রা*, বর্ষ একত্রিশ, পৌষ-মাঘ, ১৪১১ জানুয়ারী ২০০৫